কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই



বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
ভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৮/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

এই শহরের পদাতিকদের

সিরাজ্

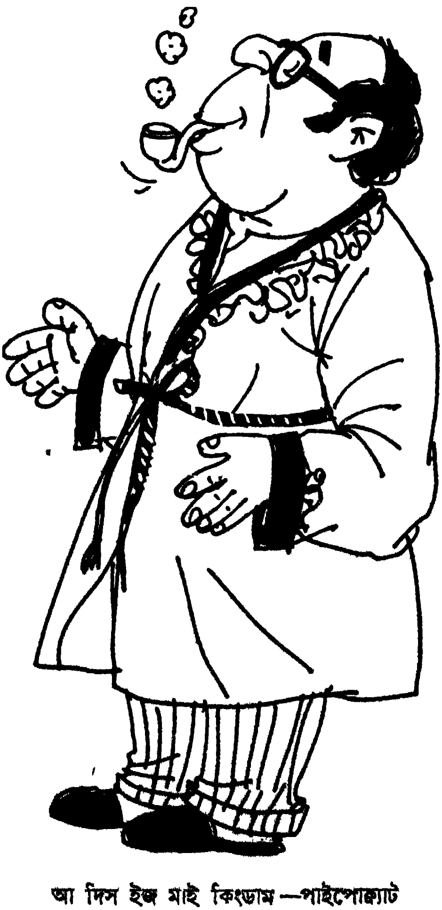
কলকাতা ক্রমশই ঠেলে ওপর দিকে উঠছে। পেটফাঁপা রুগীর পেটের মত। সাততলার ফ্ল্যাটের এক চিলতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শান্তনু লহেড়ি দুদিকে দুটো হাত প্রসারিত করে বললেন, 'আ দিস ইজ মাই কিংডাম'। পদতলে ডার্টি ভালগার শহর, ঊর্ধ্বে ফার্নিশড ফ্ল্যাট। হাজারী মনসবদারদের পালিশ করা খোপ। কবুতরী কায়দা। কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে। এ জিনিস কেনাও যায়, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে সংগ্রহের জন্যে প্রচুর ডানা ঝাপটাঝাপটির প্রয়োজন হয়।

শহর ধুঁকছে নিচে। ওপরে প্রেসার-কুকারে নরম হচ্ছে পালক ছাড়ানো পোলট্রি। পালিশ করা মেঝের ওপর দিয়ে চিকুম চিকুম করে ছুটছে ছোট্ট লোম-ওলা কুকুর। যে কুকুরের মুখ নেই, চোখ নেই, পা নেই, বেগবান ছটফটে লোম। যে কুকুর কোলে বসে গাড়ি চেপে, ন্যাপি পরে লিণ্ডসের বাদামী সায়েবী সেলুনে ক্ষৌরী হতে যায় কোয়াটারলি ট্যাকসের মত। দুটি দশ যার দক্ষিণা। এ জিনিস অতি মিহি কিমা খায়, ভিটামিনের ফোঁটা খায়, মেমসায়েবের গালে হাম খায়, সোফার ওপর হিসি করে সায়েবের সাদা পায়ের লাথি খায়। সায়েব-মেমে ঝগড়া হয়। সায়েব কুকুরের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চায়। সায়েব মেমে ভাব হয়। নিচের নোংরা শহর ভেঙে কোনো ভ্যাগাবন্ড আত্মীয় সায়েবের খোপে উঠে এলে কুকুর মেমসায়েবের গলায় মি হি মিহি ধমক ছাড়ে, ভ্যাক ভ্যাক।

লাহেড়ি সায়েবের এই খোপে সব আছে। রুমাল মাপের কার্পেট আছে। পারস্যের নয়, দার্জিলিঙের। ওয়েলেসলির কার্পেন্টারের তৈরি ঝাড়া হাত-পা অষ্টাবক্র মুনির মত দেখতে বসার আসন আছে। শাটিনের খাপে পোরা লজেনসের মত দেখতে পিঠে ঠেকনো দেবার গোল-গোল বালিস আছে। সেন্টার টেবিলে দু' রকমের অ্যাশট্রে আছে। পোড়ামাটির মালসা। এয়ারলাইনসের উপঢৌকন চকচকে ধাতুর। টেবিলের দ্বিতীয় তাকে, লাথি লাগার জায়গায় ম্যাগাজিন আছে, স্পোর্টস, সিনেমা, সাহিত্য, সংবাদ। বাঁ-দিকের দেয়াল ঘেঁষে লম্বাটে বুককেস, সেখানে রবিনস আছেন, চেজ আছেন, সরকারী রবীন্দ্রনাথ আছেন, বিবেকানন্দ আছেন, গড ফাদার আছে, একটা এলিয়ট আছে, একসার কমপ্যাকট এনসাইক্লো-পিডিয়া, একটি যোগশিক্ষা, একটি হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা। বুককেসের মাথার ওপর ফুলদানীতে ক্যানিং স্ট্রীটের গন্ধহীন বর্ণময় মোলায়েম ফুল। গর্ভকোষে পরাগের বদলে মিহি ধুলো মাকড়সার লালা। সে ফুলে অক্ষি ভ্রমর বসলেও, মক্ষী ভ্রমর বসে না। বড়দিনের কেকের মত কারুকাজ করা কিংবা পেটিকোটের ফ্রিল বসানো চিত্রাধারে ফিনকি গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল স্বাস্থ্যবান যুবকের পাশে কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিশিয়ে স্বল্প-রক্ত স্নায়বিক যুবতী। প্রবাসী পুত্র, পুত্রবধূ। পেডিগ্রি মিলিয়ে সংগ্রহ করা। বংশলতিকার শীর্ষ শাখায় ঝুলছেন রায়বাহাদুর, কোনো জজসাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট, এস পি কিম্বা এফ আর

সি এস। কোনো ডাল আরো নামী কোনো পূর্বপুরুষের পাঁচিল টপকে গেছে। বিবহ সূত্রে জোড় কলম। ফলে বীজ হবে কম, স্বাদ হবে ভাল, বর্ণ হবে সুন্দর, গন্ধ হবে কম। মানুষ মানুষ গন্ধ কমে ফানুসের মত হবে। সাততলার খোপ ছেড়ে সিরাজু আরো উঁচুতে উঠে দুনিয়াদারির ওপর লাট খাবে। ব্যোম-বাসী বংশদুলাল ছায়ায় বেড়ে ওঠা গাছের মত সূর্যের খোঁজে আরো আরো ওপরে ঠেলে উঠবে। মিনে করা মাংস রঙের দেয়ালে লাহেড়ি ঝুলছেন সোনালী প্ল্যাস্টিক ফ্রেমে। পাশে ঝুলছেন স্ত্রী। আর ঝুলছে যামিনী রায়ের প্রিন্ট, নির্বাচিত হয়েছে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা আর খচমচ রং ও রেখায় কোনো শিল্পীর নিজস্ব চিত্রভাবনা। যিনি সরতে সরতে লাহেড়ির চেয়েও ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন রং আর তুলি হাতে। এয়ারলাইনসের পাঞ্জাবি ঝুলের ক্যালেণ্ডারে পাখার বাতাসে কন্টিনেন্ট কাঁপছে।

মিনি শো-কেসে অহঙ্কার ভরা আছে। আমি বিশ্ব ভ্রমণ করেছি। প্রমাণ চাও, এই দেখ জার্মানীর ফুলদানী, ইতালির প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের নগ্ন যুবতী, ফ্রানসের আইফেল টাওয়ারের বাচ্চা, জাপানের গেইসা। ওই দেখ আমার



আ দিস ইজ মাই কিংডাম—পাইপোক্র্যাট

দেয়ালে মজাদার ঘড়ি, যার তলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কাঠবেড়ালীর ল্যাজ, পিড়িক পিড়িক করে সময়ের তালে তালে দুলছে। আমি ফোক আর্টও বুঝি। পোড়ামাটির কাজ, কান উঁচু, গোল গলা, গোল ঠ্যাং ঘোড়া, কিড়ি কিচি ঢোকরা। সাতে থাকলেও দূর গ্রামে আমার মন চলে যায় হাইওয়ে ধরে মটোরে। সার্কিট হাউসে মুরগী সাঁটাতে সাঁটাতে আমি ফিল করি, অহো, বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দ্যাশ। গ্রামীণ শিল্পের আমি পিঠ চাপড়াই। বারে বারে বলি, টাগোর, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন। কলকাতায় আমার মানোয়ারি ভাসছে, নোঙরটি ফেলে রেখেছি গ্রামীণ সংস্কৃতির পলিতে। একটু কেবল তফাতে থাকি এক সঙ্গে অনেকটা দেখবো বলে। ভিস্টাভিসান প্যানোরামা। গ্রামে অ্যাটাচড বাথ নেই, শাওয়ার নেই, গিজার নেই, কুলার নেই, পাংখা নেই, ভাল রাস্তা নেই, মনোরমা নেই। ব্রাদার, তবে স্টেপ ব্রাদার। তোমাদের গায়ে বড় ঘামের গন্ধ। তোমাদের বসন বড় মলিন। তোমরা বিড়ি খাও, তাড়ি খাও। ইংলিশেতে বড়ই কাঁচা! তাই তো আমি এখানে, তাই তো তুমি ওখানে।

আমার ছেলে ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার, তোমার ছেলে ঘরামী। আমার বৌ উইকলি পড়ে, পার্টিতে পা মিলিয়ে নাচতে পারে। চাঁপার কলি আঙুলে মানুষ খেকো নখে মুক্তোর মত রং মাখে। লাল ঠোঁটে মালপো কাটে, শুকের ছেঁড়ে। স্ল্যাকস পরে অমরনাথে তুষারলিঙ্গ দেখতে যায়। তোমার বউ গোবর মাখে, চাষ করে, মূর্তি গড়ে। চুলে শ্যাম্পু দেয় না, শিফন পরে না, দাঁতে ঘষে না পেস্ট। সবুজ চোখের পক্ষে ভাল, মাটির স্পর্শে বিদ্যুৎ খেলে যায়, শরীর চাঙ্গা হয়। সবুজ সবজিতে খাদ্যপ্রাণ। তাহলেও এখানটা এখান, ওখানটা ওখান।

আমি রোঁয়া ওঠা সবুজ কার্পেটে চটি খুলে আলতো পা রাখি। শিশিরের স্পর্শ পাই না, শব্দ শুনি জীবনানন্দের কবিতায়। সবুজ পর্দায় আমি ধানক্ষেতের ঢেউ দেখি। ফ্রিজের দরজা খুলে গায়ে মাখি কার্তিকের হিম। আইস ট্রের হিমেল ধোঁয়ায় খুঁজি ভোরের নদীর ওপর ঝুঁকে থাকা উষার দিগন্ত। আমি টেপরেকর্ডে কোয়েলের ডাক শুনি, দোয়েলের শিস। অ্যাকোয়ারিয়ামে বাহারী মাছের ঘুরপাক দেখে অনুমান করে নি, জাল আছে, জল আছে, জেলে আছে, শীতের ভোরের উষ্ণ জলে রুপালি মাছ আছে। তোমরা নিচে থেকে দিতেই থাকো, আমি ওপর থেকে নিতেই থাকি। আমার দেবার মধ্যে আছে, ইনকাম ট্যাকস, ফ্যান, ফোন, ফ্রিজের বিল, ইনসিওরেনসের প্রিমিয়াম আর ধারের কিস্তি। সময়টা দিয়েছি আমার অফিসকে, প্রেম দিয়েছি কেরিয়ারকে, দেশকে দেবার মত আমার সঞ্চয়ে আর কি আছে!

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শান্তনু শহর দেখছেন। পেছনে বর্গ সেন্টিমিটারে মাপা তাঁর সুখের সাম্রাজ্য। সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্তই তো তিনি বাইরে। স্ত্রীরও তো খোঁপা দেখা যায় না। তবে কি ছিয়ানব্বুই হাজার টাকা খরচ করলেন পাচক, গৃহভৃত্য আর একটা কুকুরের জন্যে! মানুষ যত ওপরে ওঠে ততই কি সে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়! ফ্রিজের দিকে তাকালে তাঁর মর্গের কথা মনে পড়ে যায়। সিটিয়ে থাকা মুর্গি, ছিন্ন পেশীর মত হিম-শক্ত মাংস, স্ত্রীর হলুদ ত্বকের মত সবুজ, সবজি, ব্লাডব্যাংকে রাখা রক্তের বোতলের মত লাল পানীয়। ভীষণ হাই অলটিচ্যুড সিকনেসে ভুগছেন শান্তনু। ওপর থেকে সমস্ত মানুষকে বড় ছোটো মনে হয়। জনপদ যেন সাজানো, ছড়ানো দেশলাই আর সিগারেটের বাক্স। সমতলে নেমে এলে ওই বোধটাই থেকে যায়। অচল খুপরি থেকে নেমে এসেই দরজা খুলে সচল খুপরিতে ঢুকে পড়েন। পেছনের আসনে



বেগবান ছটফটে লোম

বসে থাকেন উদাস। মাছের মত জল কেটে কেটে, পিছলে পিছলে এগিয়ে চলেন। সামনে লোক পড়লে গাড়ি যখন হর্ন দেয় তাঁর মনও যেন হর্ন দিয়ে ওঠে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।

কে বলেছে শান্তনুর হৃদয় নেই। সে হৃদয় আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বড়ই, তলার দিকে লোব দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। হলই বা রোগ তবু সে বৃহৎ হৃদয়ের মালিক। তার রক্তে উচ্চচাপ। এও তো এক ধরনের আবেগ। শরীরে শর্করা! সে তো মিষ্টতারই লক্ষণ। দৃষ্টি রক্তাভ। ক্রোধ নয় ভালবাসা। নিজের স্বার্থকে ভালবাসা। বৃহৎ দর্শনে আমি আর তুমিতে তো কোনো পার্থক্য নেই। সোহম্ বেদান্তের শেষ কথা।

ইদানীং শান্তনুর বড় ভাবনা মৃত্যুর পর তার মৃতদেহটা কি লিফটে করে নিচে নামবে! চার কোণায় চারটে কাঁধ কে দেবে! সে তো কোনো ব্যাপারে কখন কাঁধ ঠেকায়নি। এই সপ্তম তলের খুপরিতে কার্পেটের ওপর দিয়ে চিকুম চিকুম করে মৃত্যু যখন এগিয়ে আসবে তখন কি হবে! ডেকরেটার যেমন ম্যারাপের বাঁশ নামায় সেই ভাবেই কি তার দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে দূরে ফিতের মত ওই রাস্তায়, খাটালের পাশের নরম মখমলের মত জায়গাটায়! শান্তনু তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। কলকাতা এদিকে ক্রমশই ঠেলে উঠছে ওপরের দিকে বিষাক্ত পুঁজে ভরা ফোঁড়ার মত। নিচে তবু সঙ্ঘ আছে, সংগঠন আছে। ওপর দিকটা সাবানের ফেনার মত, ফ্যাঁসা তুলোর মত। ধরতে গেলে শুধুই বায়ু।

৫

মাদার টিংচার

গগনচুম্বিতা থেকে পৌরাণিক ছায়াচিত্রে যেভাবে লক্ষ্মী জনার্দন কিম্বা হরপার্বতী স্বর্গ থেকে মেঘলোকের মধ্যে দিয়ে সাঁ করে সপরিবারে মর্ত্যে নেমে আসেন, সেইভাবে নেমে এলেন লাহেড়ি দম্পতি। লিফ্‌টে চালক ছাড়া আরো চারজন ওঠা নামা করতে পারেন। শ্রী ও শ্রীমতী লাহেড়ি আয়তনে ফোর ইজ টু টু। লিফটম্যান নেপালী। ফোলা ফোলা গাল, গুলি গুলি চোখ তার ছ' সাত বছরের শিশুটি নিচের তলায় একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে যন্ত্রের ওঠা নামা দেখে। অন্ধকার মত জায়গায় লিফটের মাথার উপর একফালি জায়গায় আলোর সংকেত জ্বলে আর নেবে, বারো, এগারো, দশ।

লিফটটা যতক্ষণ নামতে থাকে ততক্ষণ বোঝার উপায় নেই—কি নামছে, হাতি নামছে কি ঘোড়া নামছে। ফুস করে যেই দরজা খুলে যাবে তখনই দারুণ মজা। কত রকমের জিনিস যে বেরোতে থাকে যাদুকরের টুপি থেকে যেমন বেরোয়। কোনো প্রাণী বেঁটে মোটা, কোনো প্রাণী লম্বা রোগা। কোনো প্রাণী থলথলে ঢলঢলে। কোনো প্রাণী দরকচা। কেউ বুলেটের মত। ক্রিকেট বলের মত ছিটকে বেরিয়ে আসেন। কেউ আসেন ধীরে ধীরে হেলে দুলে। কেউ আসেন খড়খড় করে কাঁকড়াবিছের মত লাফাতে লাফাতে। কেউ এত উদাস, এত তন্ময় একপাশে পিঠ লাগিযে দাঁড়িয়েই থাকেন তারপর এক সময় দূরনিয়ন্ত্রিত পুতুলের মত গুটি গুটি বেরিয়ে চলে যান। কেউ ভোলেবাবা, কেউ হালুম বাঘা। কারুর মুখ কালিম্‌পঙের মুখোসের মত, কারুর মুখ পাথরের মত। গগনচুম্বিতার মনুষ্যশালায় এইসব বড় মানুষ, বড়িয়া মানুষরা থাকেন। বীরবাহাদুর সকাল থেকে সন্ধ্যে যতক্ষণ সে জেগে থাকে, স্বর্গ থেকে মাঝে মাঝেই নেমে আসা এই সব দেবদেবীদের দেখে। আর একটু বেশি রাতে যা ঘটে তার সাক্ষী পাহাড়ী লিফ্‌টম্যান। লিফটের রবার টাইলস বসানো মেঝেতে শ্রীমতী ভরদ্বাজ যখন হাঁটু মুড়ে দোয়ানি খোঁজেন, শ্রীভরদ্বাজ তখন জড়ানো গলায় বলতে থাকেন, বি স্টেডি মাই ডার্লিং অর আই উইল কিক ইউ কিকি। মিঃ সেনগুপ্তকে যখন চ্যাংদোলা করে এককোণে মালের মত জড়ো করে দিয়ে যায়, সিকসথ ফ্লোরে রাত বারোটার সময় চালান সই করে সেই মূল্যবান মালটিকে ডেলিভারি নেবার কেউ থাকে না।

দরজা খুলে যেতেই মিঃ লাহেড়ি ভস্‌ করে আগে বেরোতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মনে হল উঁহু সায়েবী রীতিতে বলে লেডিজ ফার্স্ট, গিন্নী ফার্স্ট। পেছিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর এই হঠাৎ পেছোনোর জন্যে শ্রীমতী লাহেড়ি প্রস্তুত ছিলেন না। একটু মাকো মাকো ধাক্‌কা হল দুতাল পুডিং-এ। শ্রীমতী একটু সকরুণ আর্তনাদ করে কয়েকটি নেটিভ শব্দ ব্যবহার করে ফেললেন। বাতের ব্যথায় লাহেড়ির পদক্ষেপ। লাহেড়ি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ক্যাবলা চণ্ডী। বলেই খুব লজ্জা পেলেন। উত্তর কলকাতার সাবেকী অভ্যাস। সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বললেন, ও সরি মাই ডিয়ার। অতঃপর ডিয়ারের বগলের তলা দিয়ে একটা হাত চালিয়ে দুজন পাশাপাশি বেরোবার চেষ্টা করলেন। মুখপোড়া লিফট কোম্পানী পাশাপাশি স্বামী স্ত্রীর মাপ জানে না। ফাঁদের তুলনায় চাঁদ বড়।

অতএব কর্তা আগে, হাতে ঝোলা গিন্নী পিছে বেরিয়ে গেলেন। টুলে বসে বাহাদুর তামাশা দেখে বেজায় খুশী।

শ্রীমতী লাহেড়িকে বিদেশী কায়দায় বগলদাবা করে বেরোতে বেরোতে লাহেড়ি কেবলি শকুন্তলা সেনের কথা ভাবছিলেন। আহা যেন লউডগা। আহা যেন টাট্টু ঘোড়া। এই বেতো তোলা উনুনটিকে নিয়ে জীবনের শেষ মাইল পোস্ট অবদি যেতে হবে। ও গড। দোতলা জুতো পরে হাঁটছে দেখো। এই বুঝি মুখ থুবড়ে পড়ে। তখনি বারণ করেছিলুম ওসব জিনিস যৌবন থেকে অভ্যাস করতে হয় বাছা। টুলো পণ্ডিতের মেয়ে ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছো অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড়। এই যেমন আমার পাইপ।

পাইপের কথা মনে পড়তেই লাহেড়ি বাঁ হাতটা স্ত্রীর হাতের তলা থেকে মুক্ত করে নিলেন। উঃ ঘেমেছে দেখো। কতদিন বলেছি সিনথেটিক ছেড়ে তাঁত ধরো। যা ধাতে সয় তাই করো। দেহাতী ভুঁড়ি বের করে এই বয়েসে কার মনে আর বসন্তের কোকিল জাগাবে। একমাত্র ঘৃতব্যবসায়ীদের নজর পড়তে পারে। মেদের তিনটি সুস্পষ্ট ভাঁজ হ্যামের মত কেটে নিলে একটিন ভাল মটকির ঘি হতে পারে। আর কি তোমার সে শরীর আছে ভদ্রে যে শরীর পাবলিকের সামনে কালোয়াতের মত খেলানো যায়।

পাইপ ধরাতে গিয়ে লাহেড়ির সেই সমস্যা। নিজের ওপরেই রাগ ধরে যায়। নিচে থেকে ওপরে উঠলে এই রকমই হয়। যখন ক্লার্ক ছিলে সিগারেট টেনেছো। জুনিয়ার অফিসার হয়ে চুরুট। এই অবধি বেশ ছিল। ম্যানেজমেণ্ট র‍্যাঙ্কে গিয়েই হয়েছে জ্বালা। জাত সাহেবদের ধরনই আলাদা। মুখে ত্যারছা করে ধরা পাইপ। ভস ভস ধোঁয়া। একটু আড় হয়ে মটোরের স্টিয়ারিং হুইল ধরেছে। ক্লাচ আর ব্রেকের ওপর পা খেলছে না তো, বেগম আখতারের আঙুল খেলছে হারমোনিয়ামের রিডের ওপর। ধ্যুৎ তেরিকা। থামের আড়ালে সরে গেলেন লাহেড়ি। আধ বাকসো দেশলাই শেষ। ভিজে বারুদের মত পাইপের তামাক আর ধরতেই চায় না। আশ্চর্য ব্যাপার। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। গাছের একটা পাতাও হাওয়ায় কাঁপছে না। পাইপ ধরাতে যাও সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লোন। পাইপোক্র্যাসি বড় শক্ত জিনিস।

শ্রীমতী লাহেড়ি পর্বতের মত হাওয়া আড়াল করে স্বামীকে পাইপ ধরাতে সাহায্য করলেন। ফোলা ফোলা মুখে আদুরে গলায় বললেন, একেবারে ল্যাদাড়ুস। দেখোনি নোভালজিন সাহেব কিরকম একটা কাঠিতে পাইপ ধরাতো। যেমন চেহারা তেমনি ফুসফুসের জোর। একটানেই ব্লপ। তোমার এই এতখানি ভুঁড়ি আর চাকাপানা মুখটাই আছে, কাজের বেলায় ঢ্যাঁড়স।

ঠোঁটের ডগায় পাইপের মসৃণ স্পর্শ পড়তেই লাহেড়ি পাইপোক্র্যাট। তখন দুনিয়াটা তাঁর অফিস। সকলেই তাঁর অধনস্ত। রবিবারের সকালে মেজাজ এমনিই সপ্তমে চড়ে থাকে। মার্কেটিং ডে। লাহেড়ি বলেন মর্কটের দিন কাজের চেয়ে অকাজের জিনিস কেনা হবে বেশি। স্ত্রী কখনো কলা দেখে দৌড়োবেন, মুলো দেখে হামড়ে পড়বেন। শাড়ি দেখে ভিরমি খাবেন। লাহেড়ি তখন অবাধ্য ঘোড়ার সওয়ার। কেবলই লাগাম টানছেন। ঘোড়া সামনের দুটো পা তুলে চিঁহি চিঁহি করছে আর ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে। স্ত্রীর কথা শুনে লাহেড়ির ইচ্ছে করছিল এখুনি চার্জশিট দিয়ে ডিসচার্জ করে দিতে। হাটাও। তাজা ঘোড়ার চাঁট সহ্য হয়। বেতো ঘোড়া বেআদবি করলে সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াই। রাখো তোমার ইংলিশ এটিকেট। রাখো তোমার ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি।



শ্রীমতী লাহেড়ি পর্বতের মত

গার্গী, মৈত্রেয়ী নিশ্চয় নিউমার্কেটে মর্কেটিং করতে যাবার মত মর্কট ছিলেন না। জনসমক্ষে ভুঁড়ি তুলে অপমান। অডাসিটি। তুমি জানো আমার কত রূপ। আমি বিশ্বরূপ। পাইপ খুলে নিয়ে লাহেড়ি দাঁতাল হলেন।

বেতো রুগী তুমি আর মুখ নেড়ো না। পায়ের জয়েন্ট মোড়ে না ডবলডেকার জুতো পরে হাঁটছে যেন বক। সাজপোশাক দেখলে মেয়েছেলেও লজ্জা পাবে। হতে দিলে সাত ছেলের মা হতে গাল বেয়ে কলারড ঘাম নামছে। সাজতেও শেখোনি, কথা বলতেও শেখোনি। কালচার শিখতে হলে শকুন্তলার কাছে যেও। লাহেড়ি এক ঝলক ঝেড়ে পাইপ গুঁজে মুখ বন্ধ করলেন।

শকুন্তলা তোমার মত শকুনিকে বাঁ পায়ে কিক করে। সে হল সানিপার্কের মেয়ে। তার যেমন লিকার তেমনি ফ্লেভার। ওসব মেয়ে রুদ্রাক্ষ সেনের মটোর বাইকের পেছনেই মানায়। নিজে তো জীবনে ভয়ে সাইকেলেই উঠতে পারলে না। ওই তো বেঁটে বেঁটে ধনুকের মত পা। তিনি আবার ঘোড়ায় চড়ার স্বপ্ন দেখেন। শ্রীমতী লাহেড়ি বেশ মনের মত করে কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পেরে

পেট খোলসা করার আনন্দ পেলেন।

দাঁতে পাইপ চেপে লাহেড়ি বললেন, মুখ সামলে হৈম। ঐকারটাই কাল হল। দাঁতে পাইপ চেপে ইংরেজী বলা যায়; বাংলার একার, ঐকার, ওকার, ঔকার ঠোঁট ফাঁক করে দেয়। যেমন বিড়ি ফোঁকা জাত তার তেমনি ল্যাঙ্গোয়েজ। পাইপটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ধরে ফেললেন।

হৈম বললেন, তোমার ওই হলদে হলদে জনডিসের চোখ তোমার জুনিয়ারদের দেখিও। সান্যালের মেয়ে লাহেড়ির পায়ের স্যান্ডেল হয়ে থাকবে না। চলে যাবো জামাইয়ের কাছে, জামাই-আদরে রাখবে। সোনার চাঁদ ছেলে। সুইডেনে সি এ। দুটো গাড়ি। তোমার মত শ্বশুরকে একহাতে কিনে আর একহাতে বেচতে পাবে। জীবনে সুইডেন দেখেছো! না দেখবে!

তুমহারা সাথ মার্কেটিংমে নেহি যায়েগা।

নেহি যায়েগা তো হামারা কচু পোড়া। স্ত্রী ফড়কে চলে গেলেন লিফটের দিকে। একে উঁচু জুতো, তায় পায়ে বাত, তার ওপর ফসফসে শাড়ি। লাহেড়ি মনে মনে বললেন, টাল খেয়ে একবার পড়ে মুটকি। তেজ বেরিয়ে যাবে। আমার ধমমো পত্নীরে।

নিচেটা গ্যারেজ। গাড়ি আসাযাওয়ার জায়গা। একপাশে লম্বাফালি ফুল-গাছের কেয়ারি। বিশাল বিশাল থাম। কোথাও থৈ থৈ নীল আলো, কোথাও নীল কালো অন্ধকার। অনেকটা দূরে হোস পাইপে জল দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে। নেভা পাইপ ঠোঁটে চেপে লাহেড়ি লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন। লিফট উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। এক পাশে বীর বাহাদুর টুলে বসে আছে। অন্য সময় হলে লাহেড়ি গ্রাহ্য করতেন না। এখন তিনি স্ত্রী পরিত্যক্ত। মনটা ভীষণ চিড়বিড় করছে। হাসি হাসি মুখে ছেলেটির দিকে তাকালেন। হাত বাড়িয়ে বীর বাহাদুরের মাথার সোনালী চুল ঘেঁটে দিলেন। ছেলেটি ভয়ে টুল থেকে নেমে চোঁ করে দৌড়োলো।

অফিস, বাড়ি, উন্নতি, পরিবার ছাড়া দীর্ঘকাল অন্য কিছু ভাবা হয়নি। এক সময় আমারও শৈশব ছিল, ওই ভাবেই খরগোসের মত দৌড়োতে পারতুম, জলে ঝাঁপাতুম, গাছে চড়তুম, আর আজ! শৈশবটাকে কোনো অলৌকিক কায়দায় যদি শৈশবেই ধরে রাখা যেত চির বসন্তের মত। লিফট নামছে। সাত, ছয়, পাঁচ। বয়েসটাকেও যদি এইভাবে নামানো যেত, পঞ্চাশ, উনপঞ্চাশ, আটচল্লিশ। জীবনটাকে আবার শুরু থেকে শুরু করতুম। অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন হেঁকে উঠলো, লাহেড়ি সাব। পাইপ ফিরে গেল দাঁতে, মুখের ভাঁজ মিলিয়ে গেল নিমেষে। ঘুরে দাঁড়ালেন। কে ডাকছে! অবাঙালীর গলা। কে? আমাকে তুমি দেখতে পাবে না, আমি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণকালো জায়গাটায় মিশে আছি আর একবার রিপিট করছি শোনো।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ লাহেড়ি নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ বোকাপাঁঠা॥

প্রাতে প্রৌঢ় সন্ধ্যায় যুবতী

॥ দৃশ্য এক॥

প্যাঁচানো প্যাঁচানো ছড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে, এদিকে-ওদিকে আস্ফালন করতে করতে হরিরাম দ্রুত পায়ে সরোবরের ধার ঘেঁষে প্রাতঃভ্রমণ করছেন। ফাইন মার্সিরইজড ধুতি প্রায় হাঁটুর ওপর তোলা। গায়ে সূক্ষ্ম পাঞ্জাবির ওপর তসরের জ্যাকেট। পায়ে সাদা মোজা আর কেডস। কলকাতায় কয়েকটি সরোবর এখনো আগলে রাখা হয়েছে হরিণের জল পান বা বকের এক ঠ্যাং মৎস্য সাধনার জন্যে নয়। বিউটির জন্যে। বিউটিফুল ক্যালকাটার জন্যে। বাত আর বদহজম আর হৃদরোগীদের জন্যে। সন্ধ্যেবেলা যুগলমিলনের জন্যে। আর্ট স্কুলের প্রথম শিক্ষার্থীদের আউটডোর স্কেচের জন্যে। রাতের দিকে কারুর কারুর



প্রভুকা নাম গাও
আরে হরিকা গুণ গাও

রোজগারের জন্যে, জীবিকার জন্যে আর স্বেচ্ছায় যারা জীবনে ফুলস্টপ মারতে চান তাদের জন্যে।

হরিরাম দ্রুত পায়ে একশোবার প্রদক্ষিণ করবেন। তিনি করবেন। তাঁর ভুঁড়ি করবে। পেটের খোলে পোরা পাঁচপো ঘোলের সরবত করবে। বেচারের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে এই এক ঘণ্টাই যা তাঁর মাখামাখি। এই ঘণ্টা খানেকেই যা পদযুগলের ব্যবহার। এরপর হরিরামের সারাদিন শরীর 'ইউক্লিড'। কখন তিনি গোল, কখন ত্রিভুজ, কখন দ, কখন পেন্টাগন, হেকসাগন। বড়বাজারের সাদা চাদরের ঢালাও গদি, দুটি পুরুষ্টু তাকিয়া, একটি গোলাপী ফোন হরিরামের দৈর্ঘ ও প্রস্থকে জ্যামিতিক কায়দায় রাত নটা অবধি ধরে রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি একটি দুরূহ একস্ট্রা। হরিরামের জীবন-ঐশ্বর্যের রহস্য সমাধানেব বাইরে। মাঝে মাঝে ফোন বেজে ওঠে। ঢোলা পাঞ্জাবি পরা হাত বাড়িয়ে একটি হাতের কনুই তাকিয়ায় ঠেসিয়ে, রিসিভারটি আয়েস করে কানে লাগান। কানের পাতার কয়েক গাছা চুল শিল্পীর তুলির মত রিসিভারে সুরসুড়ি দিতে থাকে। হরিরাম কথা বলতে বলতে কাপড় কখন হাঁটুর কাছে তোলেন, কখন আরো ওপরে। সাইকেল পিওনের মত টেলিফোন বেলবাজিয়ে হরিরামের লকারে, হীরে আনে, মুক্তো আনে আণ্ডিল বাণ্ডিল নোট আনে।

ছড়ির প্রয়োজন নেই, তবু রিদমের জন্যে হরিরামের হাতে ছড়ি। হরিরাম প্রায় ছুটছেন, পেছনে ছুটছে ছেঁড়া প্যাণ্টপরা খালি গা একটি শিশু। পাঁচটা পয়সার আশায়, সকালে কিছু খাবে। সকালে হরিরামের চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে, শিশুটির ওঠে খিদের হিককা। কলকাতার জল কলকাতার ফল, কলকাতার গ্যাঁড়াকল এখনো তাকে বদ হজমের রোগী করতে পারেনি। হরিরাম ছুটতে ছুটতে আরো মোটা হতে থকেন। ছেলেটি পাঁচটা পয়সার আশায় ছুটতে ছুটতে আরো রোগা হতে থাকে। হরিরাম মাঝে মাঝে পেছন ফিরে ছেলেটিকে বলেন, প্রভুকে নাম গাও, হরিকো গুণ গাও আরে হরিকো গুণ গাও আরে প্রভুকো নাম গাও।

॥ দৃশ্য দুই ॥

শেষ পাক মেরে হরিরাম জলের ধার ঘেঁষে একটি বেনচিতে বসলেন। একটু রেস্ট। জলের ধারে ধারে ছোটো ছোটো আগাছা। ল্যাজওলা ব্যাঙাচি। লম্বা ঠ্যাং মাকড়সা। সকালেরই ঘুম ভেঙেচে, আহার্যের জন্যে ছোটাছুটি। দু' পায়ের ফাঁকে হরিরামের ছড়ি আর একটা ঠ্যাঙের মত বেরিয়ে আছে সামনে। পাশে এসে বসেছেন গণেশরাম। হাতে সকালের ইংরেজী কাগজ। দু' জনের মুখই প্রভাতের আকাশের মতই উদ্ভাসিত। দেখা হরিরামজী কেয়া কিয়া। কেয়া কিয়া ভাই। ভাসওয়া দিয়া। শিউজী শিউশঙ্কর ভগবান, তেরা নাম, তেরা নাম। গণ্ডেশজীর চোখে ভক্তির অশ্রু। দূর থেকে দেখলে মনে হবে দুই ভক্ত সরোবরে প্রভাত রবির অরুণ বরণ দেখে বিশ্বলীলার মাধুর্যে ভাবে গদগদ'। আসলে তা নয়। ওরে ব্যাটা বঙ্গবাসী, মৎস্যসেবী, তৈলপায়ি অামি গণ্ডেশরাম কাশীর বিশ্বনাথজিউর মাথায় পরশু দিন চার্টার্ড প্লেনে গিয়ে চালিশ মণ খাঁটি ভঁইসা দুধ ঢেলে এসেছি। হুমন করেছি। রেপসিড তেল বোঝাই জাহাজ দেখো ইয়ার ক্যালকাটা পোর্ট ছেড়ে ভাগলবা। কোনো বন্দরেই ভিড়ছে না সে তরি। এখন মাঝ দরিয়ায় তেল ডোলভারি দাও। খুব তো ভেবেছিলে, পরিষ্কার

বাঙলায় গংড়েশজী গেয়ে উঠলেন, তেলের ওই ঝরনাধারায় ডুবিয়ে দাও ডুবিয়ে দাও। হরিরামজী উঠে দাঁড়িয়ে ছড়িটাকে কাঁধে ফেলে কোমর দ্‌লিয়ে দ্‌লিয়ে বার কতক বললেন, চলবে না, চলবে না, দিতে হোবে, দিতে হোবে। দ্‌জনেই তারপর হো হো করে খানিক হাসলেন। গাছের ডালে একটা পাখি ডেকে উঠল। শ্‌না কেয়া বোলা, পিউ কাঁহা, তেল কাঁহা, তেল কাঁহা।

॥ দৃশ্য তিন ॥

যদ্‌নন্দনবাব্‌ পিকআপ নিচ্ছেন। লো প্রেসার। অ্যানিমিক। সকালে বিছানা ছাড়তে পারেন না। তাঁর স্ত্রী স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছেন। গাড়ি একবার স্টার্ট নিলেই সারা দিন ঠিক চলবে। দ্‌জনেরই সাইলেনসার ব্‌জে গেছে। চললেই মাঝে মাঝে ভটাস ভটাস করে শব্দ হয়। ওঠো যদ্‌নন্দন, ছাড়ো ক্যাঁতাবন্ধন। স্ত্রীর হাতে এক কাপ গরম ডিজেল মোবিল মেশানো। যদ্‌নন্দনের বনেট খ্‌লে ঢেলে দিতে হবে। সতেরো টাকার জনতা চা। যেমন লিকার, তেমনি ফ্লেভার। শ্‌ধ্‌ ডিজেলে হবে না মাঝে মাঝে স্পার্ক দিতে হবে ইঞ্জিনে। ওঠো যদ্‌নন্দন, আল্‌ আজ দ্‌' টাকা, খোলো চোখ নন্দন, ছেলের স্কুলের তিন মাসের মাইনে, নাম কেটে দেবে। কাল ম্‌দি মেরেছে তাগাদা, ইলেকট্রিকের বিল, চাল নেই তেল বাড়ন্ত ওহে যদ্‌নন্দন। দ্‌টো র্‌টের বাস বন্ধ, এ মাসে আপিসে সাতদিন লেট, যদ্‌নন্দন ছাড়ো বন্ধন। বাসে যদ্‌বাব্‌ স্টার্ট নিয়ে নিয়েছেন। স্টার্ট নিলেই তাঁর সাইলেনসার থেকে একটা শব্দ বেরোয়--তেরি নোলে খেলি স্যাংচ্‌ মারি খ্যাং খেলি, এ মাসে তোরা ক কেজি তেল খেলি, ক টন চাল খেলি, ক একর আল্‌ খেলি, এটা কি চা না স্নানযাত্রার পাঁচন। বলাই আছে ঠিক এই ম্‌হ্‌র্তের সঙ্গে সিনক্রোনাইজ করে দ্‌টো জিনিস ছাড়া হবে কয়লার উন্‌নের ভলকে ভলকে ধোঁয়া আর রেডিও—প্রভাতে য'ারে বন্দে পাখি কিম্বা তুমি গাও, তুমি গাও কিম্বা ভোলে বাবা পার লগাও ত্রিশ্‌লধারী শক্তি যোগাও। বোম বোম তারক বোম।

॥ দৃশ্য চার ॥

ধোঁয়া দিয়ে যদ্‌নন্দনকে হাতে বাজারের থলি আর রোজকার বরাদ্দ চার টাকা হাতে গংজে দিয়ে মধ্‌-নন্দিনী রাস্তায় বের করে দিলেন। যদ্‌র শ্বশ্‌রের নাম মধ্‌। এক পোয়া পথ হাঁটলেই বাজার। যদ্‌র মাথায় জটিল অঙ্ক। আল্‌ পাঁচশো না সাতশো না এক কিলো। মাছ, পঞ্চাশ না একশো না দেড়শো। তারপর। কাগজটা একবার দেখ তো সতীকান্ত আমাদের ডি এ-টার কি হল! নো হোপ! সরকার চাকরেদের কথা এখন ভাবছেন না। শহর নয় গ্রামের ওপর বেশি স্ট্রেস। বেকারদের চাকরি? সাকাররা ক্রমশই নিরাকার। কি বললে, তেলের জাহাজ ক্‌লে ভিড়ছে না। মরেছে, ভেড়ী ল্‌ঠে। এক কাপ চা ছাড়া বাঙ্গাদা। না থাক। চার টাকা থেকে কুড়ি পয়সা গেলে তিন আশি থাকে। কাঁচা লঙ্কা বাদ পড়ে যাবে। বাবা শ্‌ভঙ্কর বিয়োগটা এখনো মনে আছে ভাগ্যিস! যোগটা তো প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছো।

॥ দৃশ্য পাঁচ ॥

যদুবাবু বাজারে। কি হাঁকিচিস তুই! হাঁকিচিস নয়—হাঁকচেন। তুই নয়—স্যার। কি হাঁকচেন স্যার। নিতে হয় না নিতে হয় ফোট। লিতে হয় লিন না লিতে হয় না লিন। লেনেওলা মাল চিনি। দূর থেকেই জেললা দেখি। অলাবু অথবা কুষ্মাণ্ড। পিয়া, পাপিয়া থলিয়া থেকে ঝাড়ো দুটি তেলাপিয়া। মারে পোস্ত, ঢালো ছটাক খানেক রেপসীড। আসলের পাশে রাখো পরিপাটি ন্যাপকিন। বাঁ হাতে নাকটি চেপে ধরে বনেটে ঠুসে দাও স্টার্ট ভিটামিন এ. বি. সি. ডি. জেড। তারপর এক ড্রপ ওডিকোলন খেয়ে তৃপ্তির উদ্গার। বাকিটা কেয়ার অফ পেট।



লিতে হয় লিন না লিতে হয় না লিন

॥ দৃশ্য ছয় ॥

সেই সরোবর। সেই জলের কিনারায় বেনচি। সময় উত্তীর্ণ সন্ধ্যা। জল থেকে উঠে আসছে শহর কলকাতার আলোর ঝাঁক। পাশাপাশি, কাছাকাছি দুটি মাথা। হরিরাম, গঁড়েশরামজী নয়। সকালের বেঙাচিরা এতক্ষণে ব্যাং হয়ে স্থলচর হয়ে গেছে। কথোপকথন। আর কতকাল থাকবো বসে পরান খুলে লরেল আমার? ততদিন যতদিন না হরিরাম তিনশো টাকার চাকরি দিচ্ছে হাওড়ার ফ্যাকটরিতে। তিনশো টাকা মাত্র! ও বাবা তাই তো অনেক। আমার শাড়িরই দাম দেড়শো! আমার ট্রাউজারও দেড়শো! তাহলে হিসেব তো মিলেই গেল। হরিরাম প্রাণারাম অন্তত উলঙ্গ করে রাখবে না। ফুচকাওয়ালা দেড় হাজার কামায়, তুমিও ব্যবসা করো না! করছি তো, সেলিং। লাস্ট ড্রয়িং বোর্ড আর টি সেট বেচে সেদিন ট্যাক্সি চড়ে দুজনে গঙ্গার ধারে জাহাজ দেখেছি।

॥ দৃশ্য সাত ॥

গভীর রাতে সরোবরে জল নিতে এসেছেন যুধিষ্ঠির। অন্ধকার থেকে আদেশ ভেসে এল—দাঁড়াও! কে? আমি বকরূপী ধর্ম। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তবে জলে হাত দিতে পারবে। তোমার ফচকেমি রাখো তো, ও আমার শোনাও আছে, জানাও আছে। গাছের আড়ালে ছেনতাইয়ের তালে আছো। না আমি ধর্ম। সরোবরের মায়া ছাড়তে পারিনি। তাহলে অসল যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষায় থাকো। আমি ফুটপাথের যুধিষ্ঠির, সাত ছেলের বাপ। এইমাত্র আমার বৌ অষ্টম সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কলকাতার আর একটি নাগরিক। জল চাই। তবু শুনি প্রশ্নটা কি? কলকাতার মানুষ বেঁচে আছে কি করে? প্রশ্ন শুনে যুধিষ্ঠির হে হে করে হাসল খানিক। শুনবে উত্তর—
তোমার পাছায় লাথি মেরে॥

বরাহতন্ত্র

কি বললেন?

আজ্ঞে 'এখন নয়, তিনের বেশি কখনও নয়', হলদের ওপর লালে লেখা।

লেখা তো আপনারই বা কি আর আমারই বা কি! সরকারের পয়সা আছে লিখছে। লিখেছে বলেই মানতে হবে? সে তো প্রথম ভাগেও লেখা ছিল—সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ কাহাকেও কুবাক্য বলিবে না। শুনেছেন সে কথা! বুড়ো হয়ে তো মরতে চললেন!

এ বাক্যটা যে না মেনে উপায় নেই! একটি শিশু প্রতিপালনের খরচ জানেন! একটি শিশুর আগমনের হ্যাপা জানেন!

হ্যাপাটা কি জিনিস! এ আবার কোথাকার ভাষা!

এ যুগের ভাষা স্যার। ছেলের মুখ থেকে শিখেছি।

এই পি-এ, কাগজ লাও। ফিনানস তো খুব বাজেট দেখায়! দেখি এই মধ্যবিত্ত মানুষটির মুখ থেকে মানুষের খরচের একটা বাস্তব হিসেব নাও। নিন বলুন।

আজ্ঞে, কনসেপসান। মানে যেদিন তিনি সেই দুঃসংবাদটি দিলেন—ওহে মনে হচ্ছে থার্ড পার্সন ইজ কামিং সেই দিনই জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাঁক পাড়লুম—রিকশা। চলাও ডাক্তারখানা। আস্তে চালিও ভাই। ভাড়া এক টাকা প্লাস এক টাকা।

লেখো। প্রথমদিন ভাড়া বাবদ দু-টাকা। উঁহু আলাদা কলাম কর, আলাদা হেড। এতকাল বজেট দেখছ, কিভাবে একসপেনডিচার হেড অনুসারে সাজাতে হয় জানো না? হ্যাঁ—দু-টাকা। বলুন তারপর।

ডাক্তারের ফী চার টাকা। এটা স্রেফ ফালতু। গম্ভীর মুখে বললেন—আমি হলুম গে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ডাক্তার। জন্ম দেবার ডাক্তার আলাদা, চলে যান সেখানে। রেশনকার্ডের মত একটি কার্ড করিয়ে রাখুন সময় থাকতে থাকতেই, তা না হলে শেষ মুহূর্তে বেগ যখন প্রবল হবে বউ ঘাড়ে করে



আজ্ঞে কনসেপসান

মহাদেবের মত ঘুরে মরতে হবে। কেউ স্থান দেবে না। হাঁসের মত পুকুর পাড়ে ডিম পাড়তে হবে। তখন...দাঁড়ান। লেখো চার টাকা—আলাদা হেডে লেখো। হেডিং দাও—ডাক্তার খরচ। হ্যাঁ কনটিনিউ।

তারপর একটা ট্যাকসি করে গেলুম গাইনাকোলজিস্টের কাছে। ট্যাকসি যাওয়া আসা সাত টাকা প্লাস সত টাকা ইজকলটু চোদ্দ।

লেখো চোদ্দ।

ডাক্তারের ফী বত্রিশ টাকা।

লেখো বত্রিশ।

ওষুধ হল গে, আয়রন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটীন গুঁড়ো, সব মিলিয়ে প্রথম চোটেই অটচল্লিশ টাকা।

লেখো ওষুধ—আটচল্লিশ।

এইবার হল গে পথ্য। হে হে বাবা যে কলে মানুষ আসে তার গ্যাঁড়াকল অনেক। নিজে যখন জন্মেছিলুম তখন কি আর বুঝেছিলুম কত ধানে কত চাল!

বলুন পথ্য—ডেলি হিসেব দিন।

সকালে মুরগীর ডিম, মাখন রুটি, দুধ। দুপুরে সরু চালের ভাত, আপনার রেশানের চালের ভাত জন্মেও চলে না, শ্রাদ্ধেও চলে না। বেশ বড় এক দাগা মাছ। প্লেইনটি অফ ভেজিটেবলস। ফের এগেন দুধ।

ফের এগেনটা কি।

ডবল বিশেষণ স্যার। ফের আবার দুধ? বিকেলে ছানা, বেশ বড় একটি তাল, চিনি দিয়ে মাখো মাখো।

একটি পালিশ করা আপেল। রাতে বেশ খসখসে গরম গরম ফুলকো আটার রুটি, পাতলা করে মংসের স্ট্যু। বিশ্বাস করুন মাঝে মাঝে নিজেরই মা হতে ইচ্ছে করে!

একদম অসভ্যতা করবে না। একটি মিথ্যে কথাও বলবে না। সাপ্রেশান আর একজাজারেশন অফ ফ্যাক্টের দায়ে পড়বে। মাইন্ড ইট। কোনও মধ্যবিত্ত অত সব করে না। এসব বড়লোকের ব্যাপার। আমরা করতে পারি, ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররা করতে পারে, ওয়াগন ব্রেকাররা করতে পারে। সাধারণ মানুষ, যাদের নিয়ে এই ডেমোক্রেসি, তারা এসব করে না। একে বলে আদিখ্যেতা।

করে স্যার। প্রথম প্রথম নববধূর জন্যে একটা আদিখ্যেতা সব স্বামীরই থাকে। নতুন নতুন সাইকেল চালানো, সিগারেট কি মদ খাওয়া, নতুন বাবা হওয়ার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি থাকেই। একটা নেশা। আট পাউন্ড মিনিমাম ওজন হওয়া চাই, ওই দুধের টিনের গায়ে আঁকা শিশুর মত। বলা যায় না কে এসে পড়ে। স্যার সুরেন বাঁড়ুজ্যে এ নেশান ইন দি মেকিং-এ লিখেছিলেন না—কে বলতে পারে সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে হয়তো হঠাৎ আবার দ্বিতীয় চৈতন্য দুম করে কোথাও জন্মে যাবেন। ওই প্রথমটার ব্যাপারেই একটু মেনেটেনে চলা। স্বপ্ন-টপ্ন দ্যাখা। তারপরই ওই ট্যাঁ আর ভ্যাঁ শুনতে শুনতে, গ্যাঁটের কড়ি গুণতে গুণতে স্ত্রী হয় বউ, বউ হয় গিন্নী, ছেলেমেয়েরা হয়ে যায় পেটের শত্তুর, তখন আর ওসব নেই—যো আয়েগা আউক, যো যায়েগা যাউক।

কী হয়?

যো যায়েগা যাউক। যো আয়েগা আউক। হ্যাঁ স্যার—যো যায়েগা যাউক... খরচের চুল চেরা হিসেব থাক স্যার। মিথ্যে বলব না—বেশ খরচ। মানে চাকরির

পয়সায় ছেলে হয় না, ঘুসটুস চাই স্যার। কলকাতার রাস্তায় হুল্লাগাড়ি না বের করলে বাপ হওয়ার খরচ ওঠে না। মেয়েদের কাছে প্রথম মা হবার অভিজ্ঞতা বড় আনন্দের। ছেলেদের কাছে আতঙ্কের। কত আতঙ্কে যে ছেলেরা বাপ হয়। আর বাপ হয়ে যে কত আতঙ্কে থাকে।

পি-এ। মার্ক ইট। এই হল মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য। সামলে থাকতেও পারে না, বেসামাল হয়েও সুখ পায় না। কই ফুটপথের মানুষরা তো অত ভয়ে মরে না। মানুষ আর শুয়োরে, আই মিন ভারতবর্ষের মানুষে ও শুয়োরে তফাত থাকবে কেন! আমাদের সরি তেমাদেব পুরাণে বলছে বরাহ হল অবতার। অবতারের কায়দায় বাঁচতে শেখো। আমি একটু ছোট্ট মত বক্তৃতা দিয়ে দেখি—ভীষণ ভাব এসে গেছেঃ

এই ভারতবর্ষে সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা, রাজনীতি, সমাজনীতির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বেচে থাকবে কারা। রাবিশ মধ্যবিত্তরা নয়, চোরিশড বড়লোক কী ব্যবসাদাররা নয়। বার্ডস অফ প্যারাডাইসরা কেন লোপাট হয়ে যেতে বসেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে শৌখিন প্রাণীরা কেন আজ ধীর অবলুপ্তির পথে! তার কারণ রুচি নিয়ে, আভিজাত্য নিয়ে মধ্যযুগে বাঁচা সম্ভব হলেও, আধুনিক যুগে বাঁচা যায় না। এ যুগে বাঁচার টেকনিক আলাদা। এ হল শোরের যুগ। জেনুইন শুয়োরের বাচ্চা না হলেই মরতে হবে। শুয়োরের—'এখন নয়, তিনের বেশি কখনই নয়'-তে কান দেয়নি, তারা এক একবারে সাতটা অটটার কম নামায় না। পাঁকের মধ্যে পরমানন্দে থাকে। জঞ্জাল দেখলে কাগজে প্রবন্ধ লেখে না, করপোরেশনের সামনে গিয়ে হল্লা করে না। মধ্যবিত্ত ভাই সব তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো শুকর হয়ে যাও। আমরা বিদ্যুৎ সাপ্লাই করতে পারিনি, আমরা ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে পারিনি, কিন্তু আমরা পরিবেশ সাপ্লাই করতে পেরেছি। নর্দমার পাঁক কত চাই! ম্যান-হোল থেকে তুলে তুলে আমরা রাস্তার পাশেপাশে ভড়ভড়ে করে রেখেছি। সব রাস্তা আর ফুটপাত খুঁড়ে খুঁড়ে থেয়ো কাদা তৈরি করে রেখেছি। অফুরন্ত জঞ্জালের ঢিবি চারদিকে। খুঁটে খেতে চাও খাও। শুকর হলে আমদের পরিবেশ তৈরির এই প্রয়াস দেখে চটাপট, পটাপট হাততালি দিত। এই মধ্যবিত্ত, তৈল-চিক্কন বাবুটি ভয়ে ভয়েই আধমরা। এই ভদ্রসন্তান জানেন না শূকরের জন্ম নার্সিং হোমে হয় না, হয় নর্দমায়। শূকর শাবক বেবীফুড খায় না। শূকর-জনক প্রি-ন্যাটাল কেয়ার, পোস্ট-ন্যাটাল কেয়ার কেতাব পড়ে না। পড়ে না বলেই তারা নির্ভীক ফ্যামিলি ম্যান। নিরাশ হবার কিছু নেই। আমি বিশ্বাস করি চেষ্টায় মানুষ সব পারে। ঘুমিয়ে আছে শূকরতনয় সব মানুষের অন্তরে। তাকে জাগাও, জাগিয়ে তোলো। আমরা এই বরাহতন্ত্রকে সর্বতোভাবে মদত দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, আরও হবে। অর্থের কৃপণতা আমরা করব না। সারা দেশটাকে আমরা শূকর বসের উপযোগী করে তুলবই। আমাদের দাবি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র নয়। ওসব একটা বড় রকমের ধাপ্পা। আমাদের দাবি বরাহতন্ত্র। লেড়কা লোক এক দফে তালি বাজাও। উঃ অনেকদিন এরকম বক্তৃতা দিইনি। মেডন স্পিচ। যেমন ভাষা, তেমন বাচনভঙ্গী, তেমন বিষয়বস্তু! কি বল পি-এ সাহেব?

আমরা থ মেরে গেছি স্যার। কী ওয়াণ্ডারফুল অ্যাপ্রোচ!

তারপর বাঁকেলাল ভয়ে ভয়ে তোমার এখনটাই হল। হয়েই যখন গেল তখন আর ভয়টা কিসের।

না স্যার, সবটা তো শুনলেন না। লেগে তো গেল তারপর! শুরু হল ভাবনা—ছেলে হবে না মেয়ে! যদি মেয়ে হয়!

মেয়ে হয় তো কি হয়! মেয়েও তো মনুষ রে বাবা। মেয়েমানুষ।

না, মানুষ তো বটেই তবে কিনা লোকসানের কারবার! খাইয়ে দাইয়ে বড়টি করে, গলায় কম করে তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টকা বেঁধে তুলে দিয়ে এস পরের ঘরে। মেয়ের বপ হল ট্রাস্টী। পরের সম্পত্তি আগলে বসে থাকো। শুধু তাই নয়—মেয়ে না হয় হল, এখন কার মত দেখতে হবে! বাপের মত না মায়ের মত! মায়ের মুখ আর বাপের রঙ নিয়ে যদি আসে—চক্ষু চড়ক গাছ। আবার যদি পুরোটাই বাপের মত হয় তাহলে আরো পাঁচ হাজার টাকা বেশী ধরে দিতে হবে—ময়লা রঙের খেসারত।

নিজে যখন বিয়ে করেছিলেন, দেখে করেননি?

আমাদের সময় অত দেখাদেখি ছিল কী। দেখা হল সেই পিঁড়েতে বসে, চাদরের তলায়। ড্যাবরা ড্যাবরা, বেকা বোকা, মাছের মত চোখ। নাকটা দেখে মনে হল আহা পকেটে যদি একটা সাঁড়াশি থাকত। ঠোঁট দুটো দেখে মনে হল, পান-দোক্তা যা জমবে না! বুলি যা ছুটবে না!

তাহলে দোষটা কার। ম্যাচ মেকার্সদের, না আপনার নিষ্ক্রিয়তার?

দোষ কারো নয় গো মা. আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

যাগে, দুঃখু করে আর কি হবে। রঙটা ফর্সা তো!

তেমন ফরসা আর কই। খুব ফরসা হলে আমার কালোর সঙ্গে মিশে ছেলে মেয়েদের রঙ মোটামুটি একটা ব্লু ব্ল্যাক মত দাঁড়াত! যাক সে যা হয় হবে বলে আর এক ভাবনা নিয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ করে বসলুম।

কখন বসলেন? না রোজই বসেন!

আমি অতীতের কথা বলছি স্যার। স্ত্রীর যখন ছ-মাস—শুয়ে আছেন খাটে ডিমঅলা ট্যাংরা মাছের মত। মাথার কাছে টেবিলে ওষুধ-বিষুধ। আমার হাতে 'ফেয়ারী চাইলডে'র অ্যাডমিসান টেস্টের প্রশ্নোত্তর।

'ফেয়াবী চাইলড'টা কী?

বিখ্যাত স্কুল স্যার। ছেলে, মেয়ে জন্মাবার আগেই যেখানে অ্যাডমিশনের জন্যে নাম লেখাতে হয় তারপর তিন দিন ধরে পরীক্ষা। সেই জন্যে সময় নষ্ট না করে, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, গর্ভস্থ সন্তনকে শেখাতে থাকি—বলো বলো বাচ্চে, ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্টের নাম, প্রাইম মিনিস্টারের নাম। দেশ স্বাধীন হয়েছিল কবে? প্রজাতন্ত্র কাকে বলে? ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কোন সালে হয়েছিল!

এটা আপনাদের বাড়াবাড়ি মশাই। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ!

মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। এটা মহাভারতের শিক্ষা। অভিমন্যু ব্যূহভেদের কৌশল গর্ভে বসেই শিখেছিল। মা ঘুমিয়ে না পড়লে বেরিয়ে আসার কৌশলটাও শিখে ফেলত। ছেলে তো স্যার দুম করে জন্মেই ট্যাঁ করে জানিয়ে দিলে—ট্রাবল ইজ বর্ন। একে ধর ওকে ধর। এর পায়ে তেল ওর পায়ে তেল। ছেলে ভর্তি করার যে জ্বালা স্যার। আপনার সন্তান না হলে বুঝবেন না।

কোনও ধারণা নেই আপনার! দেশের ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন হল মন্ত্রীরা। ছেলেবেলায় রূপকথার গল্পে পড়েননি—মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র। আর কোনো পুত্রের উল্লেখ ছিল কি! ছিল না। সেই এক সিসটেম চলে আসছে। চলছে, চলবে। চলবে, চলছে।

স্প্রিংটা কম জোর স্যার। এখুনি চিৎপাত হয়ে পড়বেন।

ডাকো ডাকো সদাগরপুত্রদের ডেকে বল মন্ত্রীর চেয়ার মেরামত করে দিয়ে যাও। কত সুখ আমাদের। স্কুল আমাদের ছেলেদের জন্যে, কলেজ আমাদের ছেলেদের জন্যে, হাসপাতালের ভাল কেবিন আমাদের জন্যে, রাস্তা আমাদের জন্যে। দেশ হামারা হিন্দু স্তাঁ—আ—আঁ। আমি কি তুমি হে যে ছেলেমেয়ে নিয়ে ভেবে মরব?

আমাদের বড় চিন্তা স্যার। যখন সব এটুকু এটুকু ছিল আধ গজে জামা হত। প্যান্ট হত। এখন সব এত বড় বড় হয়ে গেছে। ফুল তিন মিটার লাগছে একটা ফ্রকে। এর পর যখন শাড়িতে প্রোমোশন পাবে উরে বাবারে! তিন প্যাকেট সিগারেট, দেড় প্যাকেটে নেমেছে। বউ বলছে আর একটা এলেই আধ প্যাকেটে নামতে হবে। তিন কাপ চা'র এক কাপ কেটে দিয়েছে। দুধ এক সের থেকে এক পো করেছে। ডাইং ক্লিনিং বন্ধ করে দিয়েছে। রোববার রোববার কাপড় কাচিয়ে নিচ্ছে। কতদিন যে স্যার রাবড়ি দিয়ে ফুলকো ফুলকো লুচি খাইনি! বেশ জম্পেস করে সরু চালের ভাত আর মাংস।

আরে এর দেখি বেশ পেটের জোর আছে হে! অম্বল নেই! অ্যামিবায়োসিস জিয়ার্ডিয়াসিস নেই? কোলাইটিস নেই?

আছে আছে সব আছে! রাতে নো মিল। সকালে জলের মত ঝোল ভাত। পকেটে সেই থামা দেবার বড়ি। রোজ একটি করে না খেলেই মনে হয় এই পাচ্ছে, এই পাচ্ছে। সেও এক মারাত্মক ভয়। সব ভয়ের সেরা ভয়।

আ, এইটাই তো আমরা চাই। এই নার্ভাস ডায়েরিয়া দিয়েই তো আমরা সবরকম অভ্যুত্থান ঠেকিয়ে রাখতে চাই। তা না হলে এ দেশটা কবে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা হয়ে যেতো। হই হই মিছিল করে এগিয়ে আসছে মধ্যবিত্তের দল—শিক্ষা চাই, সংস্কৃতি চাই, দুর্নীতি চাই, মাথা তুলতে চাই, নিচু করতে চাই, নীতি চাই, তেল দিতে চাই, নিতে চাই, লাথি খেতে চাই, মারতে চাই, সব এসে দাঁড়িয়েছে এই ক্ষমতার দুর্গের বাইরে। কি হচ্ছে ভাই? বিপ্লব, বিপ্লব। আমরা সব বিপ্লব করেছি।

আমরা তখন এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুলিশ বাহিনীকে বলব—ওহে কিস্যু করতে হবে না, শুধু তোমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েকবার বুটের শব্দ কর। ওইলে আসছে! বাস বাকি কাজটা জিয়ার্ডিয়াসিস, লাম্বিয়াসিস করে দেবে। ওরে ভাই বিপ্লব এখন থাক, আগে বড় বাইরেটা করে আসি।

বকরাক্ষস

খোকন-দা-আ-আ, খোকোনদা খোকোনদা রক্ত রক্ত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। দোতলার বারান্দা থেকে শরীরের আধখানা গাছের ডালের মত আধ-ঝোলা করে অবিনাশবাবু বললেন, ভয় নেই সোজা ওপরে চলে এসো, আসল রক্ত নয়, নাটকের রক্ত। সাহস পেয়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলুম। নিচের কোনো একটা ঘর থেকে আবার সেই চিৎকার, কিশোরকণ্ঠের আতঙ্ক-আশ্রিত আর্তনাদ,

রক্ত, রক্ত। পঁচিশ পাওয়ারের ফ্যাকাসে আলো পানাপুকুরের জলের মত সিঁড়ি বেয়ে পাতলা স্রোতে নেমে এসেছে। চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা। ভিটামিনের ঘাটতিতে প্রায় রাতকানা। নিচে রক্তের ধারা বইছে, পা ঘষে ঘষে ওপরে উঠছি। অসুস্থ অবিনাশের খবর নিতে। কেমন আছো অবিনাশ ভাই! গোটা কতক ক্যানভাস ব্যাগ, মরচে ধরা বিবর্ণ শিশু দুধের টিন আর তেলচিটে এক সেট রেশান কার্ড হাতে গেরুয়া-পাঞ্জাবি গায়ে তোমাকে সাপ্তাহিক রেশানের লাইনে দেখছি না বেশ কয়েক সপ্তাহ। বাসের কিউতে তোমার টোল-খাওয়া মুখ একই সঙ্গে ধোঁয়া আর জ্ঞান উদ্‌গিরণ করছে না কত দিন। বাজারে তোমাকে মাছের পোস্টমর্টেম আর বাটখারার তলা এগজামিন করতে দেখছি না ইদানীং! তুমি কি ভাই সরে পড়ার তালে আছো!

ঘুঙুরের শব্দ পাচ্ছি যেন! নিচে রক্ত, ওপরে ঘুঙুর। তার মানে তুমি মরবে না, মরো মারো। গেঞ্জি গায়ে বারান্দায় রেলিঙে পা তুলে বেতের গো চেয়ারে মাথাটা পেছনদিকে ঝুলিয়ে অবিনাশ পেছনের আকাশের তারা গুণছে, একতারা, দু-তারা তারা তিন-চার। তা ধিন, ধিন তা, তা ধিন ধিন তা, না তিন তিন তা, তেটে ধিন ধিন তা ঝুম। হল না, হল না, একমাত্রা শর্ট হয়ে গেল, পা মিলছে না পা মিলছে না, আবার, এক দুই তিন চার, এক দুই, তিন, স্টার্ট, ঝুম ঝুম। অবিনাশের বড় বড় কাঁচা-পাকা চুল, ঝুলঝাড়ুর মত পেছনে ঝুলছে।

এটা তোমার কি পোজ বাবা! কত কায়দাই জানো!

অবিনাশের ঝোলা মাথা উল্টোদিকের মোড়ায় বসতে না বসতেই প্রশ্ন করল, কটা বাজে? সাতটা বাজতে মিনিটখানেক বাকি আছে। ধরো সাতটাই। অবিনাশ বললে, আমাদের কৈশোরে সন্ধ্যে সাতটার সময় বাড়িতে বাড়িতে কি দেখতে? একটা থমথমে আবহাওয়া দেখতুম। এখনকার কালের কারফিউ জারি হলে শহরের যেমন অবস্থা হয়। আর কি দেখতে? চোখের সামনে দেখতুম পিতা কিংবা প্রবীণ গৃহশিক্ষকের প্রস্তরকঠিন মুখ। কি শুনতে? পলাশীর আমবাগানে ক্লাইভ, অ্যাঁ অ্যাঁ ক্লাইভ, পলাশীর আমবাগানে সিরাজউদ্দৌলা অ্যাঁ, অ্যাঁ। এখন কি শুনছো? রক্ত রক্ত। ঘুঙুর কি বোল। আর একটু কান খাড়া করে আরো কিছু শোনার চেষ্টা কর, কি শুনছো! ম্যায় চুপ রহুঙ্গি, ম্যায় চুপ রহুঙ্গি, হি হি হি হি, হো হো হো হো। ঠিক শুনেছো। পাশের বাড়িতে টি ভি চলেছে। তারকার স্ত্রীলিঙ্গ কি হে? তারকার কোনো লিঙ্গ আছে কি? যে লিঙ্গে লাগবে তাতেই ফিট করে যাবে। যাক তাহলে ভালই। ওই টি ভি-র কাঁচে এখন চিত্রতারকা নৃত্য করছেন। হোল-পাড়া ঝেঁটিয়ে এসেছে। আমার বাড়িরও একটি আছেন ওখানে।

অবিনাশের ঘাড় সোজা হয়েছে এতক্ষণে। ঘাড় সোজা করেই বললে, ওই শুরু হল। জ্বালিয়ে মারলে দেখছি। আবার কি হোলো? আরে ওইটা তো আমার রোগ। ধরতেই পারছে না কেউ! সিমপটমটা তোমার কি হচ্ছে বল না! দাওয়াই কি সব সময় চিকিৎসকদের হাতেই থাকে! ভেটারেন রোগীদের হাতে অনেক মোক্ষম জিনিস থাকে। ওই জন্যে বাসে-ট্রামে-ট্রেনে-হাটে-বাজারে অসুখের কথা বলতে হয়। দেখলে না সেই থ্রি-সি বাসে যেই আমার দুরারোগ্য ব্রঙ্কাইটিসের কথা বললুম সঙ্গে সঙ্গে সেই নীল জামাপরা ভদ্রলোকের প্রেসক্রিপসানে আর আমার হয়েছে! হয়নি। সাহস চাই অবিনেশ, সাহস চাই। তুমি তো বললে, ডাবের জলে ঘোল করে, সেই ঘোল ফুটিয়ে খেলে কি সব কেমিকেল রি-অ্যাকসন মি-অ্যাকসন হয়ে মরেই যাবো. মরেছি? কি হয়েছে বল।

তুমি কখনো দিনের বেলায় জঙ্গলের পাশ দিয়ে পথ হেঁটেচো! হেঁটেচি। অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক শুনেচো! শুনেচি। মাথা সোজা করলেই আমার কানে সেই ঝিঁ ঝিঁ শুনচি। শুনচি মানে, আর কিছু শুনতেই পাচ্ছি না। এই ব্যাপার! এটা অসুখই না, দুর্বলতা। ভাল খাওয়া-দাওয়া কর, একটা টনিক খাও, দিন কতক রেস্ট নাও, ঠিক হয়ে যাবে। আর একাল-সেকাল নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। কারুর বাপের ক্ষমতা নেই কালকে থামায়! শোনো নি, কালস্য কুটিল গতি। দেখে যাও, সাক্ষীপুরুষের মত স্রেফ দেখে যাও, আর মনে মনে প্রার্থনা করে যাও, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। কি বললে? অবিনাশ চিৎকার করে উঠলো। ভুলেই গিয়েছিলুম, অবিনাশ অনবরত ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাক শুনছে। একটু জোরে কথা বলতে হবে। তাছাড়া নাচের তেহাই আছে। অবশ্য জোরে কথাটা আবার বলার আগেই অবিনাশ বেতের চেয়ারটা আর একটু কাছাকাছি এনে বললে, দাঁড়াও তোমার সব কথা শুনতে পাবো আগে নিজের ঘাড়টাকে আবার মটকে দি। যে রোগের যে দাওয়াই, ঘাড় মটকালেই ঝিঁ ঝিঁ স্টপ। অবিনাশ মাথাটা আগের মত পজিশানে নিয়ে এল। বলছিলুম সব ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামিও না, একটু অ্যালুফ হয়ে কর্তব্য করে যাও আর মনে মনে মঙ্গল চিন্তা করে যাও।

কার মঙ্গল? তোমার, তোমার পরিবারের, সমাজের, সংসারের, জগতের।

ও, চিন্তা করে যাবো, তাতেই কাজ হবে, বলবো না কিছু তাই তো!



আমাদের কৈশোরে সন্ধ্যা সাতটায়

ঈশ্বরের ভূমিকা। তাহলে ঈশ্বর হয়ে যেতেই বা আপত্তি কি! ঈশ্বর অবিনাশ-চন্দ্র। আজ কত তারিখ! মাঝামাঝি হল। নভেম্বরের চোদ্দ কি পনেরো। রানিং এগারোশো পঞ্চাশ বুঝেছো। বুঝলে কিছু! এগারোশো পঞ্চাশ টাকা শেষ। এগারোশো পঞ্চাশকে চোদ্দ দিয়ে ভাগ কর, ভাগফলকে পনেরো কি ষোল দিয়ে গুণ কর। পকেটে নেই বুঝলে, কলকাতার হাওয়ায় উড়ছে, ধরে আনতে হবে। আমাদের সময় এটাকে কি কাল বলতো! শীতকাল। সে না, সে না, এটা হল পরীক্ষার কাল। আর বারো দিন, চোদ্দ দিন পরে সব ফাইনাল পরীক্ষা হবে। তাই তো! একজনকে হাবুদা ধরেছে, একজনকে হেমামালিনী ধরেছে, আর একজনকে হেলেনে ধরেছে, আমাকে ঝিং ঝিং-তে ধরেছে আর একজনকে যোগে ধরেছে, শেষ যে ছিল তাকে ধরেছে ভবসাগর তারণে।

এনে দে রেশমী চুড়ি নইলে যাবো বাপের বাড়ি স্টপ। বিশাল বিপুল যাত্রা অনুষ্ঠান। পাঁচ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান। ওই শোনো। পাঁচ দিন ব্যাপী এই উৎসবে পরিবেশিত হচ্ছে আধুনিক যুগের বেদব্যাস, যুগল হালদারের চক্ষু দিওনা গেলে। খুন আছে, জখম আছে, প্রেম আছে, পুণ্য আছে, রহস্য আছে, রোমাঞ্চ আছে, ভোগ আছে ত্যাগ আছে, দগদগে সামাজিক এই পালায় আর যিনি আছেন তিনি হলেন নৃত্য জগতের বেপথু হুতাশন, সাড়া জাগানো হৃদয় মোচড়ানো, হাড়ে দুব্য গজানো মিস, মিস পামেলাআ, এরপর পতির মুখে আগুন, পালাসম্রাট পাঁচুগোপাল কর্মকার, এরপর পর পর সতীর মুখে ছাই, রেভলিউশান, চিমনির ধোঁয়া। সিজন টিকিট পঁচিশ, ডেলি দশ, পাঁচ, দুই। এনে দে রেশমী চুড়ি নইলে যাবো... ।

কি বলছিলে ধরেচে, ধরেচে। ক্লাশ নাইনকে ধরেচে হাবুদা। নিচে রক্ত বক্ত কর.চ। এ-পাড়ার সংস্কৃতির পীর পয়গম্বর। সারা দুপুর, ওই দেখো আমি অঙ্ক কষে কষে মরচি। তিনি কখন এদিকে একটু দয়া করবেন হাবুদাই জানেন। হু ইজ অবিনাশ। সোস্যাল ক্যালকাটায় অবিনাশরা হল মিডফাদার। ওয়াইফের পুংলিঙ্গ তো ফাদার। ওর এডুকেশানে মাসে দুশো টাকা, ভরণপোষণে আরো একশো, তিনশো ইনটু বারো মা-গঙ্গার জলে। মঙ্গল চিন্তার খরচটা একবার হিসেব কর মানিক। দুবার লাট খেয়ে বড় মেয়ের ধারণা তাঁর আসল প্রতিভা হল স্ক্রীনে। তিনি হেমা হচ্ছেন। আমি এদিকে হে মা! হে মা! করে ছেলে ধরার ডিপোজিট বাড়াচ্ছি নিজের ভিটামিন নিজেই গ্যাঁড়া করে। ধরবে হয় তো সেই আমাকে কাঞ্চনমূল্যে আমার সান-ইন-লকে তুলতে হবে। বস্তুটাকে বাজিয়ে নেবার আর অবকাশ রাখলে না। পাশের ঘরে আর এক মিস পামেলা তৈরি হচ্ছে। সাতদিন পরেই তার স্কুলের পরীক্ষা, গানের পরীক্ষা, নাচের পরীক্ষা, যোগ-প্রদর্শনী নৃত্য-প্রদর্শনী। ভালই তো হে! সব কটা লাইন একসঙ্গে খুলে যাচ্ছে। একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতী, রম্ভা, তিলোত্তমা! অবিনাশ হি হি করে হেসে বললে, ফলে পরিচিয়তে। সেই বেতসপত্রীকে একটু পরেই কোরামিন দিয়ে দেড়শো টাকার শিক্ষকের কাছে পড়তে বসাতে হবে। নস্যির ডিবে হাতে গৃহিণী থাকবেন পাহারায়। প্রেম চলবে না, ঘুম চলবে না, চলবে শুধু পড়া।

মেজভাই, তিনি শীর্ষাসন করতে গিয়ে গলায় স্ট্রাস বেঁধে পড়ে আছেন সাতদিন। ঘাড়ের খিল খুলে গেছে। সামনের মাঘে বিয়ের দিন ঠিক। ঘাড় ভাঙা জামাই আর কি কেউ নেবে! দাদা! লিভার, পিলে, কিডনী, হার্ট মাঝে মাঝে উল্টে দিয়ে দেখো সব রোগ সেরে গিয়ে তুমি একটা বিউটিফুল বাটারফ্লাই হয়ে গেছো। হোল ওয়েস্ট ইস্ট সাধে যোগ যোগ করে খেপে উঠেছে। মডার্ন ইন্ডাস্ট্রি-

য়াল সিটির একমাত্র প্যানেসিয়া যোগ। সেই যোগে তার মুণ্ডু বিয়োগ হয়ে গেছে। সোনার এখন কত করে ভরি হে! ছশো-টশো হবে। অবিনাশ অনামিকাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, কতটা আছে বলে মনে হয়, ভরিটাক হবে! হতে পারে। সামনের স্টেশেনারি দোকানটা দেখছো। আসলে বন্ধকীর কারবার। আর একটু পরে একশো গ্রাম চানাচুর কেনার ছুতো করে যাবো। তারপর আঙুলে দাগটাই থাকবে কিছুকাল বিয়ের স্মৃতি হয়ে। নভেম্বর বড় সাংঘাতিক মাস হে, হিম, গরম-ঠাণ্ডা চাঁদা ভাইফোঁট, টিউশান ফী স্কুল ফী, পরীক্ষার ফী আরো কত কি!

অবিনাশের স্ত্রী এসে পিচিক, পিচিক করে গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন ছোট্ট একটা তামার ঘটি থেকে। একটা শিশি থেকে ড্রপারে করে কানে দু' ফোঁটা তেল দিয়ে চলে গেলেন। জলপড়া, তেলপড়া। গুরুদেব বলেছেন—ওই ঝিঁ ঝিঁ হল অন্তরাত্মার ক্রন্দন—দাও ফিরে সে অরণ্য, দাও ফিরে সে অরণ্য।

অবিনাশ অপ্রকট হলেন। শহর তাঁর হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিয়েছে। যাবার আগে ছেলের অংকর খাতায় লিখে গেছেন, ভব সিন্ধুর ওপারে চলিলাম। যাইবার পূর্বে সূক্ষ্ম শরীরে এই শহরের বিভিন্ন পরিবারে একটি স্যাম্পল সার্ভে করিয়া বুঝিলাম, শহর বকরাক্ষসে ভরিয়া গিয়াছে। প্রতিটি পরিবার প্রতিদিন তাজা তাজা প্রাণ, সংস্কৃতির বক, রাজনীতির বক, সমাজসেবার বক, ধর্মের বক, ব্যবসায়ের বক শাসক, শোষক বকেদের উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। যে লোকে চলিলাম সেখনে গিয়া যদি সম্ভব হয় কয়েকটি ভীম পাঠাইবার চেষ্টা করিব, যাঁহারা দুখিনী ব্রাহ্মণীকে বলিবেন—মা কেঁদো না, তোমাদের সন্তান তোমাদের ঘরেই থাক। আমি ভীমসেন চলিলাম বকরাক্ষসকে তাহার অহার্য পরিবেশনে। বেশ বুঝিয়াছি একটি ভীমের কর্ম নয়, শত শত ভীম ওপার হইতে ডেসপ্যাচ করিতে হইবে।

ছাগলের বোধোদয়

(হঠাৎ মনে হল আমি একটা ছাগল। শুধু ছাগল নই, পাঁঠা ছাগল। শেয়ালদা স্টেশন থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছি। গায়ে গায়ে, ঘাড়ে ঘাড়ে, কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে, ঠেলা খেতে খেতে, ঠেলতে ঠেলতে। সব মিলে যাচ্ছে। মিলছে না কেবল ব্যা ব্যা ডাকটা। পেছন থেকে দৃশ্যত কেউ ছড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে না তবে অদৃশ্য একটা তাড়া আছে, যেমন করেই হোক দশটার অফিস দশটাতেই পেঁাছোতে হবে।)

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে ঠিক ওই সময়েই শ' দিনেক ছাগল চলেছে। জলস্রোতের মত এগিয়ে আসছে ফুটপাত ধরে। জুতো পালিসঅলা ছেলেটা ভেসে গেল। তিনজন মহিলা ছাগল স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে গিয়ে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। মৃত্যুভয়ে ভীত শিশু ছাগল উচ্চবর্ণের মহিলাদের দামী শাড়ির আঁচলে আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে প্রথমে শুনল ইংরেজী গালাগাল, পায়ে ধরতে গিয়ে খেল চাঁট, কচি কচি শিং-এতে শাড়িতে জীবন্ত চোরকাঁটার অবস্থা। অবশেষে পাটনাই যমদূত থুতু ছিটোতে ছিটোতে এসে ছপাটি দিয়ে ছাগলা

ছাড়িয়ে উত্তর দিকে চলে গেল—প্রোটীনের পাল নিয়ে। আমার মধ্যে দিয়েই গেল। পাশ দিয়ে গেল, পায়ের ফাঁক দিয়ে গেল, চোখ উল্টে ভ্যা ভ্যা করতে করতে বলে গেল—জন্মিলে মরিতে হবে, প্রোটীন হয়ে ঝুলতে হবে, কোর্মা হবে, কবাব হবে, হাল্কা মত ঝোল হবে, ভুগতে হবে, ভাগতে হবে, পরের সেবায় জবাই হবে।

ছুটন্ত আমির তখনই মনে হল—এই এক ছাগল। পেটে পালং শাকের ঘণ্ট, তাহার উপর আলুলায়িত মসুর ডাল, একপাশে সুইসাইড করে পড়ে আছে একটি নিরীহ মাছের পোনা। একটি ভিটামিন ক্যাপসুলের বহিরাবরণ দু' খণ্ড হয়ে কর্পোরেশনের বিশুদ্ধ জলে নৌকোব মত ভাসছে। কণ্ঠনালী দিয়ে নেমেছে পানের রক্তিম রস। ব্যা করছে না বটে কিন্তু পাকা শিং নেড়ে নেড়ে ছাগল ছুটছে অফিসে। পশ্চাদ্দেশে পাটনাই 'সাপ্লায়ারে'র ছপটির আস্ফালন নেই বটে, জীবন আছে। জন্মেই মরেছ তুমি এখন দেহের দাসত্ব কর। লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসাব/দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।

ছাগল, কিন্তু বুদ্ধিমান ছাগল। রিয়েল ছাগলের বোঝার ক্ষমতা নেই যে সে ব্যাটা ছাগল। আমি কিন্তু আমার ছাগলে স্বভাবটা বেশ বুঝতে পারি। সংসারের জাবনায় যা ঘাসপাতা থাকে তাই পরমানন্দে চিবোই। কিছুক্ষণ মৌজ করে চোখ বুজিয়ে জাবব কাটি। ভাবি, আহা কি সুখের জীবন। তারপরই ঘড়ি দেখে 'ব্যা' করে লাফিয়ে উঠি। আমার দুধ নেই, আমার গোবর নেই, সামান্য একটু ব্রেন আছে, অখাদ্য, কিন্তু দাসত্বের পক্ষে যথেষ্ট। সেটিকে ব্রহ্ম-তালুর তলায় রেখে আমি এক 'ব্ল্যাক বেঙ্গল', তীর বেগে ছুটতে থাকি।

'ব্ল্যাক বেঙ্গলটা' কি? আমিও জানতুম না, সম্প্রতি ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে শিখেছি। সেখানে ব্যাঙ্কের টাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাষ হচ্ছে। দিশী ছাগল। আকারে ছোট। বংশবৃদ্ধিতে ওস্তাদ। খায় কম, আবার চরে খায়। প্রতিপালনের তেমন ল্যাঠা নেই। বেশ আয় দেয়। সুস্বাদু। শেষ গুণটি ছাড়া বাকি সব কোয়ালিটিজই আমার মধ্যে আছে। ভেবে দেখেছি, যে কোন ছাগলকে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি।

না পারেন না। ডক্টর সোম পেটে খোঁচা মারতে মারতে বললেন—কিছুতেই পারেন না কারণ মৃত্যুর পর আপনার কোন মূল্য নেই। জীবৎকালে গোলামি করে হয়তো কিছু রোজগার করেছেন তাও সবই উড়ে-পুড়ে যাবে, মৃত্যুর পর আপনি এক মুঠো ছাই। কারুর কারুর কাছে ওই বস্তুর সামান্য 'সেণ্টিমেণ্টাল ভ্যালু' থাকলেও পৃথিবীর বিচারে আপনি মহাশূন্য হইতে উদ্ভূত একটি মহাশূন্য। আগেও নেই পরেও নেই মাঝখানে সামান্য ব্যাব্যাক্কার। ব্যয় করতে করতে, খরচ করতে করতে হাওয়া হয়ে যাওয়া।

যেমন ধরুন, আপনার ওজন মাত্র বাহান্ন কেজি। সুখে প্রতিপালিত যে কোন বিলিতি শুকরের ওজন আপনার চেয়ে বেশি। অবশ্য দিশী অভুক্ত ছাগলের চেয়ে আপনার ওজন কিছু বেশিই। নাড়িভুঁড়ি বাদ দিলে 'নেট ওয়েট' হবে চল্লিশ কেজি। এইবার চল্লিশ কেজি একটা ছাগল কেটে ঝোলালে কত দাম হয় হিসেব করুন। চল্লিশ ইনটু ষোল। ছশো চল্লিশ টাকা। পাল্লাটাকে একটু এদিক ওদিক করতে পারলে আরও বেশি। তারপর ধরুন এই যে লিভারটি বানিয়েছেন প্রস্থে পিঠের দিকে গেছে, দৈর্ঘ্যে ঝুলঅলা জামার মত হাঁটু ছুঁতে চলেছে, এটি আপনার একটি শরীরে 'লায়াবিলিটি', ছাগলের শরীরে 'অ্যাসেট', বাইশ থেকে চব্বিশ টাকা কেজি। এখুনি আপনাকে একটি লিভারের

প্রেসক্রিপসান ছাড়ব, ঝপাত করে তিরিশ-বত্রিশ টাকা বেরিয়ে যাবে এবং এইভাবে বেরোতেই থাকবে। ছাগল হওয়া অত সহজ নয় মশাই। ছাগলের ছাল 'গ্লেজ কিড'। 'এক্সপোর্ট মার্কেটে' 'গ্লেজ কিড' জুতোর দাম জানেন! আপনি 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' নন 'ব্ল্যাক বেঙ্গলী'।

তাহলে আমি কে? কৈশোরে ভাবতুম আমি সব কিছু। কল্পনায় কখন কলম্বাস, কখন শেক্সপীয়ার। শিক্ষকরা নির্দ্ধিধায় বলতেন এটি একটি নির্ভেজাল বোকা পাঁঠা। তিন মাসেও শেখাতে পারলুম নাঃ ত্রিভুজের দুই কোণের বহিঃসমদ্বিখণ্ডক এবং তৃতীয় কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক সমবিন্দু। এ গাধাটা এমনই গাধা যে লতা শব্দের প্রথমার একবচনে একটি বিসর্গ বসাবেই। আনম্যানেজেবল রাসকেল। চাটুজ্যেমশাই একে দিয়ে হাল চাষ করান। এ পাঁঠাকে মানুষ করে কার বাপের সাধ্য।

নিজের 'ক্রিয়েশান'কে কে পাঁঠা ভাবতে পারে! তোমার সেই গল্পটা মনে পড়ে কি? এক মূর্খ কিছুতেই তার কিছু হয় না। মনের দুঃখে নদীর ধারে বসে আছে। হঠাৎ চোখ পড়ল পাথরের ধাপে একটি মানানসই গর্ত। কি করে হল? এক মহিলা এলেন স্নানে। কোমরের কলসিতে জল ভরে রাখলেন, ওই ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাটিতে। ও আই সি। মূর্খ লাফিয়ে উঠল, ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয়, তবে? পালিশে পালিশে মোটা মাথা কেন ঝকঝকে হবে না? নিশ্চয় হবে। চেষ্টা কর। চেষ্টা কর। রবার্ট ব্রুস! মনে পড়ে? সেই মাকড়সার গল্প! এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার কি হবে? আজ্ঞে, এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস...। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে, থামলি কেন চালিয়ে যা, চালিয়ে যা, জেড পর্যন্ত সোজা রাস্তা খোলা, ওরে আমার 'ডান্স', গাধা, নিরেট নীরেন!

ফ্যামিলিতে কে কি হয়েছে! শিক্ষক হয়েছে, আইজীবী হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, একজন ডক্তার হলে মন্দ হয় না। 'অল কমপ্লিট ফ্যামিলি'। আর যেসব ছাগল আসবে প্রথমেই তারা শিক্ষকের জিম্মায় চলে যাবে। বাড়ি ভাঙলে ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিবেশীকে হুলো দেবে আইনজীবী, কেবল খাবি খেলে একজন দেখার লোকেরই বড় অভাব। ওহে চেষ্টা কর, চেষ্টা কর আমরা একটি ডাক্তার ছাগল চাই। ব্যাঙ্ক 'ইনভেস্ট' করবে না আমরাই ফ্যামিলি ফণ্ড থেকে ঢেলে যাই পরে সুদে আসলে মিটিয়ে দিও। খাও, খেয়ে যাও রোজ একপো দুধ, একটি ডিম্ব। পরলে ভাল হত কিন্তু পারব না, আশু মুকুজ্যে রোজ এক থালা সন্দেশ খেতে খেতে হাইকোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতেন, তাই না তিনি বেঙ্গল টাইগার হয়েছিলেন। ঠিক হ্যায় বেঙ্গল টাইগার হতে না পাব বেঙ্গল জ্যাকল হও।

আরে ডাক্তার করবে? এ কি তোমার ইচ্ছেয় হবে না আমার ইচ্ছেয় হবে। 'মিডিঅকার মেরিটের' ছেলে। কমপিটিটিভ পরীক্ষায় দাঁড়াতেই পারবে না, ধেড়িয়ে বসে থাকবে। তেমন পয়সার জোর থাকলে অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখা যেত। তা যখন নেই—মনে তাই তো ভাবি, কেউ কখন খুঁজে কি পায় স্বপ্ন-লোকের চাবি।

তাহলে এই ছাগলটিকে কেমন ছাগল করা যায়। বাঃ ছবি আঁকার হাতটি তো মন্দ নয়। কেমন গান্ধীজী এঁকেছে দেখ? দি একে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে। অরে না না অমন কাজটি কেরো না। ওসব বড়লোকের লাইন। বাপের 'ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স' থাকলে তবেই ও-লাইনে যাওয়া উচিত। খাবে কি? কলার সাধনায় কাঁচকলাই খেতে হবে। জেনারেল লাইনেই দাও। ঘষটাতে ঘষটাতে গ্র্যাজুয়েটটা

হলেই তদবির করে, দ'ও কোন অফিসে ঢুকিয়ে। সরকারী হলে তো কথাই নেই, পাকা 'পেনসানেবল সার্ভিস', ও কাজ করলেও মাস মাইনে, না করলেও মাস মাইনে।

আরে ছি ছি, এ কি করলে তুমি, কৈশোরের কিশলয় গোলামে পরিণত হয়। স্রেফ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর ছাতে উঠে ঘুড়িলাটাই নিয়ে ভোমমারা, ভোমমারা করে করে 'কেরিয়ারটা' উড়িয়ে দিলে। তোমার মধ্যে সব ছিল, ডাক্তার ছিল, ইঞ্জিনীয়ার ছিল, জজ ছিল, অ্যাডমির‍্যাল ছিল, ফুয়েরার ছিল। ড্যাংগুলির চোটে সব ধামা চাপা পড়ে গেল। শৈশবটিকে ঠিকমত পেটাতে পারলে যৌবনে কালোয়াত হওয়া যায়। নিদেন একটা কালোয়ারও যদি হতে পারতে 'হনি' তাহলে ছপ্পর ফুঁড়ে 'মানি'। 'প্যালেসিয়াল বিলডিং', গেটাকতক 'মটরকার'। গুলি খেলেই সব গুলিয়ে ফেললে চাঁদ। একবারও বুঝলে না, লতা শব্দের



যৌবন কার কেউ জানে না

প্রথমায় বিসর্গ হয় না। ব্যাকরণ কৌমুদীর ভেতর দস্যু মোহন।

আচ্ছা এটাকে ইনসিওরেনসের দালাল করে দিলে কেমন হয়। ওই তো গেলগাল, লাল টুকটুকে হরিচরণ কেমন কালো ব্যাগটি হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটেই তিনতলা তুলে ফেললে। আরে না না, দেখছ না, তোমাদের এ বস্তুটি একেবারেই ম্যাদা মারা। মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না। তো তো করে। চেহারা দেখলেই 'ক্লায়েন্ট' পালাবে। পহলে দর্শনধারী না হলে রিপ্রেজেন্টেটেটিভ হওয়া যায় না। বরং দ্যাখো দুলে দুলে, পড়ে পড়ে কোনরকমে যদি একটা কমপিটিটিভ পরীক্ষা পাশ করতে পারে, ডাব্লু বি সি এস জুনিয়ারটাতেও যদি বেরোতে পারে তাহলেও একটা হিল্লে হবে। তবে ও যে রকম 'অ্যাস', সন্দেহ আছে।

তাহলে সন্ন্যাসী হয়ে যাক। তবু বলা যাবে, না, 'ফ্যামিলি'র একটা ছেলে অন্তত বকরীয়ানন্দ হয়েছে। চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যবে। সামনে একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ি, মুখে স্মিত হাসি, চোখে বিশ্বসংসারের প্রতি কৌতুকের দৃষ্টি, পায়ের কাছে হামা দিচ্ছে ধেড়ে ধেড়ে ব্যবসাদার, জজ, ব্যারিস্টার। সমস্ত প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে বুড়ো আঙুলটি তুলে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা আমার।

কি যে বল তুমি, এ কি সন্ন্যাসী হবার মাল। চোখ দেখেছো? কুটিল, কুলসর্বস্ব। চুলের আলবোট দেখেছ, যেন রমণীমোহন। কান দেখেছো, যেন ইঁদুরের মত। হাত দেখেছো? যেন তবলা বাজায়। পা দেখেছো? ধাঙড়ের পা। সন্ন্যাসীর শরীর-লক্ষণ জান না! স্বামীজীর ছবিটা দেখ। শিবনেত্র, বহির্মুখী। আজানুলম্বিত বাহু। ডঙ্কামারা ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুক। ছ' ফুট লম্বা। সারা শরীরে জ্যোতি। এ বস্তু তো তমোগুণী। ঘুমোলে উঠতে চায় না। বসলে নড়তে চায় না। সাত হাত নোলা। লোভী, হিংসুটে, ঝগড়াকুটে, 'চিকেনহার্টেড'। ইনি হবেন সন্ন্যাসী! স্বামী মর্কটানন্দ। পৈতেটাই ফেলে দিয়েছে। গায়ত্রী জপতে বললে বারকতক ভুরভুর করে ঢোঁক গেলে। মানে তো দূরের কথা। ওঁ নমো বিবস্বতে বলতে বিবস্ত্র হয়ে যায়। বেদান্তের পথে যাবার মালই নয়। বড় জোর তন্ত্রের দিকে ঠেলতে পার, তারপর পঞ্চ 'ম'কারে লাট্ খেতে খেতে হয় যক্ষ্মা হবে না হয় পাগল হবে। তোমার বংশধর তখন বড় রাস্তায় উদোম হয়ে ঘুরবে।

বরং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগটা শিখেছে, 'এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন' অবধি বিদ্যে পেঁছেছে, সাড়ে সাত টাকার পোস্টাল অর্ডার জুড়ে পি এস সি-তে একটি জয় মা বলে দরখাস্ত ঠুকে দাও। তারপর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ঠিকই তো। যে পাঁঠাব যেমন ভাগ্য। সেই দৃশ্যটা বারে বারে মনে পড়ে। মানতের একটি কচিপাঁঠা, বেশ চানটান করেছে। লোটা লোটা ভিজে কান দুটো দুপাশে ঝুলছে। শীতের সকাল। মানতকারীর হাতে গলায় বাঁধা দড়িটি ধরা। জিভ বের করে মা জগদম্বা সামনে দাঁড়িয়ে। দুজনেই বসে। পাঁঠাটি মায়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। ঠান্ডা বাতাসে শরীরটা থির থির করে কাঁপছে। ওদিকে মন্দিরের পুরোহিত পবম উৎসাহে হাঁড়িকাঠে সিঁদুর মাখাচ্ছেন। আর একজন বেশ প্রমাণ সাইজের একটি খাঁড়া একমনে পালিশ করে চলেছে।

নিজেই নিজের জীবনের দড়িটি হাতে ধরে সংসারের চাতালে বসে আছি স্থির হয়ে। দুটো জিনিসই দেখতে পাচ্ছি হাঁড়িকাঠও পাচ্ছি, খাঁড়াটিও পাচ্ছি। সবাই এসে ঘাড়ে একটু করে তেল মাখিয়ে যাচ্ছে। ওরে কত্তার গলাটি নরম রাখ, তা না হলে কোপ বেঁধে যাবে।

জ্ঞানী সলোমানরা বলেছিলেন—ওহে পাঁঠা, পাঁঠী জুটিয়ে জীবনটাকে বরবাদ করার আগে 'থিঙ্ক টোয়াইস'। জ্ঞানের কথা শুনবে কে? যৌবনে খৈয়ম ঃ

Oh, come with old Khayyam and
leave the wise
To talk ; one thing is certain.
That life flies ;
One thing is certain and the Rest is lies ;
The flower that once has blown for
ever dies.

তোলিয়ে তোলিয়ে বেঁচে থাকা। ভবিষ্যৎ তব অনিশ্চয়তার খাঁড়ায় শান



বার্ধক্যে পুত্রবধূর

দিচ্ছে। পরিস্থিতির হাত ঘাড়টিকে বেশ মোলায়েম করে দিচ্ছে। জগৎ সংসারে আমার বহুবিধ ভূমিকা। কখনও চাটুকার, কখন উমেদার, কখন চালাক, কখন বোকা, কখন ভক্ষক, কখন রক্ষক, কখন পালক, কখন পালিত। যার কাছে যেমনটি হলে আখেরে সুবিধে হয় তার কাছে আমি তেমন। অফিসের বড়কত্তা ফাইলটা নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—মাথায় কিছু আছে? সঙ্গে সঙ্গে বিনীত জবাব—আজ্ঞে না। পিতৃদেবও ওই কথা বলতেন। সারা অফিসটা ছাগলে ভরে গেছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমিও এক ছাগল। ভাগ্যিস হ্যাঁ বলে ফেলিনি। 'ইয়েস' আর 'নো'র ব্যবহারটি ঠিক মত রপ্ত করতে না পারলে প্রতিবেশীর বাগানে চরে খেতে হবে। তাড়া খেয়ে বেড়ায় পা আটকে ব্যা ব্যা। আপনি কেন ছাগল হবেন স্যর? আপনি 'ম্যান', 'সুপারম্যান', ছাগলদের প্রতিপালক। তবে সঙ্গ-দোষেই ভুজঙ্গ।

শিশুর দাঁত উঠলে কামড়াতে চায়। ছাগলের কচি শিং উঠলে গুঁতোতে চায়। শিং যত পাকা হয়, বুদ্ধি যত ঝানু হয় তখনই সে বুঝতে পারে—যতই শিং সুরসুর করুক সব জায়গায় ঢুঁ মেরো না। ঢুঁ-এর 'কাউণ্টার' ঢুঁ সামলাতে পারবে কিনা বিচার কোরো। স্ত্রী পুত্রকে মাঝে সাঝে গুঁতিয়ে দেখতে পার। তবে যুগ পাল্টেছে। সেখানেও কি সুবিধে হবে। মাঝে সাঝে হুঙ্কার দিয়ে, আমি, আমি, হামি হামি করে দেখতে দোষ নেই। এ তো কর্মস্থল নয় যে তোমার আমিটাকে 'পাংচার' করে দেবে। এ তো রাস্তা বা যানবাহন নয় যে আর একটা তাগড়া-আমি থাবড়া মেরে বলবে প্রমাণ কর ব্যাটা তোর আমির জোর।

বরং এই ভাল। রবিবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম—গোলগাল গেঞ্জি আর আপ-টু-ডেট একটি লুঙ্গি পরে বাইরের ঘরে বসে আছেন কত্তা। চোখের সামনে কাগজ। (চশমার চটাওঠা খাপটি সামনের টেবিলে।) একপাশে একটি শুকনো চায়ের কাপ। নীল মত একটা মাছি একবার করে কাপে বসছে তারপরই উড়ে এসে হাতের বড় বড় লোমে বসছে। কত্তার কর্মটি খালি হাত নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়ানো। (ইনি রেশান কার্ডে বাড়ির কত্তা। ইলেকট্রিক বিলে কত্তা। ছেলেমেয়ের শিক্ষালয়ের খাতায় কত্তা। বাকি সবেতেই কর্ম। বাজারের ব্যাগটি নামিয়ে কাগজ খুলেছেন। আরও বারকতক বাজার দোকান হবে। আড়-চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে মিউ মিউ করে বলবেন—এখন এই চলছে না কি রে? হ্যাঁ এইটাই তো লেটেস্ট। ঘাড় থেকে পা এখন এই কাট।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাববেন, গজ কতক ব্যাণ্ডেজের কাপড় কিনে কোমরের ওপর দিকটায় অন্তত জড়িয়ে দিতে পারলে হত। এতটা 'একসপোজার' ভাল কি? পুরোনো আমলের ক্যামেরায় নাকি বেশি একসপোজার দিতে হত, এখন বুঝি 'অবজেক্টে' বেশি দিতে হয়। তা দাও। তবে বিবাহের আগে অনেক চোখের ক্যামেরা সামলাতে হবে!

বিকেলের দিকে চওড়া পাড় শাড়ি পরে গিন্নি বলবেন, চল একটু 'অ্যামিউজ-মেণ্ট' করে আসি। বেশ দগদগে, রগরগে বোম্বাই ছবি। মুখে জোড়া পান, তার ওপর জর্দা। দেখি তুমি ডান পাশটায় এস, আমি বাঁ দিকে যাই পিচ ফেলতে ফেলতে। কি ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছ চার পাশ, পা চালিয়ে চল না।

আর তখনই মনে হয়, আমার গলায় একটা দড়ি বাঁধা, অসহায় ছাগল, টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। ইচ্ছে নেই। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। 'যাচ্ছি তো চল না'। ছাগলের ভাষায় অনুবাদ করলে—ভ্যা অ্যা।

স্কাউণ্ড্রেল

আমি একটা স্কাউণ্ড্রেল। নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে ভাল বিশেষণ আর কিছু খুঁজে পেলুম না। কোলের ওপর ইংরেজী ম্যাগাজিন। মলাটে প্রায় বিবস্ত্রা রমণী। তার ওপর কেকের মোড়ক। দু-হাঁটুর ফাঁকে স্কোয়াশের বোতল। পেটে টই-টম্বুর রসমালাই। মুখে চ্যাকর চ্যাকর মশলা। চোখ আটকে আছে সামনের আসনের নীলবসনা সুন্দরীর শালুক বাহুতে। নিজের সামাজিক স্থানটি বেশ সুরক্ষিত। বাঁধা মাসমাইনে। স্ত্রীপুত্রকন্যা ফ্ল্যাট প্রেমোশান ব্যাঙ্ক ব্যালানস ভবিষ্যৎ, এছাড়া কোন চিন্তা নেই।

কিন্তু আমি একটা স্কাউণ্ড্রেল। এই মাত্র একটি কিশোর কাঁধে সাইডব্যাগ হাতে একটা কাঁচের জার নিয়ে লজেন্স বেচতে উঠেছে। তার জারে আছে কাঁচা আম, লেবু, আনারস চাটনি। চোখ দুটো বড় বড়। উজ্জ্বল। নিষ্পাপ। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। জীবন এখনও ঝলসে যায়নি।

একজন যুবকও উঠেছে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। সাইডব্যাগে ধূপ। একটা জ্বলন্ত ধূপ হাতে ধরা। সে বলছে, এই কমপার্টমেন্টে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা ব্যাঙ্গালোরের তৈরি এই ধূপের গন্ধ শুঁকুন। জ্বলবে এক ঘণ্টা, গন্ধ থাকবে আরও এক ঘণ্টা।

আর একজন বৃদ্ধ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা গোল বাক্স। আর এক লজেন্স বিক্রেতা। ইনি ওঠার সুযোগ পেলেই বলবেন, দাদা পয়সা হবে না লস্ নেবেন একটা দশ। গাড়ি স্টার্ট নিল। ধূপ বিক্রেতা যুবক নেমে গেল। বৃদ্ধের ওঠা হল না। ছেলেটি নামার চেষ্টা করছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। কনডাকটার ছেলেটিকে সাবধান করছে, সামনে মুখ করে নাম, পড়ে মরিসনি।

আমার কোলে ম্যাগাজিন, তার ওপর কেক, দু হাঁটুর মাঝখানে স্কোয়াশের বোতল। আমার পাশে ভদ্রলোকের কোলে ব্রিফকেস, মুখে সিগারেট, ঘামে বিয়ারের গন্ধ। নীলবসনা সুন্দরীর খোঁপায় যুঁই ফুলের গোড়, পাশে প্রেমিক। অনামিকায় পাথর বসান আংটি।

ছেলেটি নেমে পড়েছে। উল্টো দিকে হাঁটছে। আমার ছেলের বয়সী। হঠাৎ মনে হল, আমি যদি মারা যাই, সংসার চালাবার জন্যে আমার ছেলে কি পারবে এইভাবে সাইডব্যাগ ঝুলিয়ে হাতে জার নিয়ে গাড়িতে গাড়িতে লজেন্স ফেরি করার দায়িত্ব নিতে! পারবে না। তাকে আদরে আদরে অতি যত্নে প্রায় মেরে ফেলা হয়েছে। সকালে তিনি বাটার-টোস্ট খাবেন। মল্টমেশান দুধ ফর একস্ট্রা বাউনস। স্কুলের গাড়ি এসে নীল পোশাকের হৃষ্টপুষ্ট মোড়কটিকে তুলে নিয়ে যাবে দিশী কেমব্রিজে। তার রুটি থেকে মাখন সরে গেলে মুখ ভার হবে। মাথার ওপর পাখার ঘূর্ণন বন্ধ হলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। দুপুর বেলা আড় হয়ে শুয়ে গ্রিম ভাইদের লেখা পরীদের গল্প পড়বে। ইংরেজি ছবি এলে দামী টিকিটে দেখতে ছুটবে। কাঠের চামচে দিয়ে আইসক্রিম তুলে তুলে খাবে। এইভাবে বড় হতে হতে একদিন না-বাঙালী না-অ্যাংলো একটি ইয়োলো জেন্ট, হয়ে বলবে, ওয়ানস আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ ফাদার, হি ওয়াজ মাই ফাইনান-সিয়ার। ওই যে দেয়ালে ঝুলছে, পুওর ক্রিচার। বুঝলে সুলতা ওল্ড ম্যান

শেষ বয়েসে কেমন যেন ইডিওসিনক্র্যাট হয়ে গিয়েছিল। হাওয়েভার আফটার অল মাই ফাদার, মাঝে মাঝে একটু ঝুল ঝেড়ে দিও।

—ও অফুল ঝুল। ডার্লিং আমার আবার ডাস্ট-অ্যালার্জি আছে। তুমি কি নিষ্ঠুর। ও শঙ্কর তুমি কেমন করে আমাকে কবওয়েবের দিকে অনায়াসে ঠেলে দিলে। আগলি স্পাইডারস।

—ও আই অ্যাম সরি সুলু। থাক থাক ঝুল থাক। পুরোন ছবি ঝুলেতেই খোলে ভাল, লুকস গ্লামারস।

ওই ছেলেটি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। অনায়াস আত্মবিশ্বাসে এত বড় একটা পৃথিবীর সঙ্গে একলা লড়ে যাচ্ছে হাসি মুখে। এই বয়েসের ছেলে তো মা'র আঁচলের তলায় থাকবে। কে আছে ওর। বাবা হয় তো অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে কিংবা পঙ্গু। অথবা পাগল। কিংবা মদ্যপ। এই যেমন পড়লুম সেদিনের কাগজে—মদ্যপ পিতার কিশোরী মেয়েকে লোভ দেখিয়ে শেয়ালদার ফুটপাথে



আমি সেই শিকারী

এনে তারপর একটা খালি বাড়িতে তুলে চারটে বাপের বয়সী লোক পরপর রেপ করল। এই কিশোরটি যদি কিশোরী হত! মনুষের সংসারে সে কতটা নিরাপদ থাকতে পারত। এই ছেলেটিই বা নিজেকে কতদিন আগলে রাখতে পারবে। পারুক না পারুক সাহস আছে। ছররা বন্দুক নিয়ে বাঘ শিকারের সাহসের মত, সামান্য চিনির গোলা নিয়ে আমাদের মত হৃদয়হীনদের রঙ্গভূমিতে দারিদ্র্য নামক রয়াল বেঙ্গলের হাত থেকে নিজের সংসারটিকে বাঁচাবার দুঃসাহসে পথে নেমে পড়েছে।

আমার এক শিকারী বন্ধুর মুখে শিকারের কৌশলের কথা শুনেছি। বেশ শক্ত করে মাচাটি বাঁধবে। সন্ধ্যেবেলা, চাঁদের আলোয়, খেয়েদেয়ে, দোনলাটি হাতে নিয়ে মাচার খোঁটার সঙ্গে নিজেকে বেশ করে বেঁধে জাঁকিয়ে বসবে। মাচার তলায় বাঁধা থাকবে 'কিল'। গুটিগুটি বাঘ যেই আসবে, গুড়ুম। তারপর একটা ঠ্যাং বাঘের পিঠে, একটা হাত কোমরে, আর এক হাতে বন্দুক, মুখে বিজয়ীর হাসি। ক্লিক্। ঝুলতে থাক দেয়ালে বীর শিকারী।

আমি সেই শিকারী। আগে ভাগে মাচাটি বেঁধে উঠে বসে আছি। মাচাসীন। হাতে একটি সুযোগ শিকারের অস্ত্র। মঝারি আকারের একটি জীবিকা শিকার করে দুলতে দুলতে, ঢুলতে ঢুলতে নিজের ডেরায় চলেছি। কিসের জোরে আমার এত রবরবা! কিছু আগে এসে একটি জায়গা দখল করে বসে আছি। হয়তো কোন মামা কিংবা মেসোর ধরপাকড় ছিল পেছনে। পিতার ইনভেস্টমেন্ট ছিল। ঘোড়াটিকে দৌড়ের ভাল ট্রেনিং দিতে পেরেছিলেন। চরিত্রে ল্যাং মাবার ক্ষমতাটি বেশ খেলেছিল ভাল। 'ওরে তোরা মানুষ হ, প্রেমিক হ', ভাগ্যিস হইনি, হয়েছি তুখোড় মুখফোঁড়। তাই কেমন বেঁচে আছি মহাসুখে এই মহাকালের মহামাসে। কার ছেলে লজেন্স বেচছে তাতে আমার ছেলের কি! মাসে তার এক কেজি করে ওজন বাড়ছে কিনা সেইটাই তো ভাববার কথা! আই কিউ ঠিক মত ডেভালাপ করছে তো! জয়েন্ট এনট্রেনস পরীক্ষা। তারপর হয় মেডিকেল না হয় ইনজিনিয়ারিং। তাবপর একটু ধরেটরে একটা মাচা। এই-ভাবেই চলবে বংশানুক্রমিক ধারা। আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসিয়ে যেতে থাকব। না, এ মাচা এমন মাচা, এখানে নীতি হল, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। হাত ধরে অচেনা কাউকে টেনে তুলব না। ন্যাচারাল এলি-মিনেসান। সবাই সুন্দবভাবে, সৎভাবে বেঁচে থাকলে আমি কেমন করে বুক ফুলিয়ে ঘুরব! একটা ইলিশ নিয়ে বাড়ি ঢোকার আগে থমকে দাঁড়াব, আড়চোখে তাকিয়ে দেখব প্রতিবেশীর জানালায় কোন উৎসুক চোখ তাকিয়ে দেখছে কিনা! ইলিশের স্বাদের চেয়েও সুখ তো ওইখানেই যখন কানে আসে—হবে না কেন ভাল রোজগার! মোটা মাইনে। বাকিটা শুনতে চাই না—বাঁ হাতের ইনকাম রে ভাই, ইলিশ হবে, বউ-এর চেকনাই হবে, ছেলেমেয়ের চাল বাড়বে। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামব, সশব্দে দরজা বন্ধ করব। ড্রাইভারকে হেঁকে বলব—কাল জাস্ট অ্যাট নাইন। মলিন বসন পথচারী, হয়তো আমার কোন কমজোর প্রতিবেশী সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়াবেন। ক্যাপিটেল লেটারের 'আমি' যে যাচ্ছি! হঠাৎ আমি চিনতে পারব। আমারই বাল্যবন্ধু। যে বয়েসে সামাজিক পদমর্যাদা বন্ধুত্বের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় না। আমি জিজ্ঞেস করব—কি কেমন? হল কিছু? আমার সেই বাল্যবন্ধু, ভৃত্য যেভাবে প্রভুর সঙ্গে কথা বলে, সেই-ভাবে বলবে, না ভাই! দেখ না, যদি আমার ছেলেটাকে কোথাও একটা ঢুকিয়ে দিতে পার, ছোটোখাটো যা হয় একটা, ফ্রাসট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটু চেষ্টা

করলেই হয়ে যায়! তোমার কত হাত! মেয়েটাও টাইপ শিখে বসে আছে। মেয়েটা! আমার কেমন একটু উসখুস ভাব হবে। ছেলেরা ফ্রাসট্রেটেড হোক, মরুক, হু কেয়ারস! তোমার মেয়েটি কেমন, মানে দেখতে শুনতে? ভালই? তুমি দেখনি! না, দেখব! দেখব কোন রিসেপসানিস্ট কি...। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই একটা দেখ। বুঝতেই তো পারছ বিয়ের বাজার। (তা পারছি না! ও বাজার যত খারাপ হবে, এ বাজার তত জমজমাট। আমাদের কত হাত! দশ হাত, বার হাত)।

ওই ছেলেটি, ওই যুবকটি, ওই বৃদ্ধটি আমার শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ওই তিনটি অনিবার্য অবস্থা তো আমারও হতে পারত! একটু আগে পৃথিবীতে এসে পড়েছিলুম বলেই না কোনরকমে বেঁচে গেছি! তা না হলে কি হত। কেন নিজেকে বোঝাতে পারছি না, অন্যের পকেট শূন্য না হলে নিজের পকেটের মর্যাদা বাড়ে না। কেন বোঝাতে পারছি না ঃ

The art of making yourself rich, in the ordinary mercantile economist's sense, is....equally and necessarily the art of keeping your neighbour poor.

আমি মনে মনে ওই ধূপ বিক্রেতা যুবকটিকে বলতে পারি—সাবাস বাঙালী! এই তো চাই, লড়ে যাও। যদিও আমি নিজে তোমার ওই লড়াইয়ের শরিক হতে পারব না। আমার বয়েস হয়েছে। আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। অনেক রকম ভাইস ঢুকে সেইভাবে বেঁচে থাকার জন্যে অনেক ডিভাইস বের করতে হয়েছে। আমার ছেলেকে তোমার জুতোয় দেখতে চাই না। জোরে বলব না। তাহলেই তুমি বলবে, একটা চাকরি দিন না মশাই। নিজে তো বেশ সুখে আছেন। বোনের বিয়ে দোব, মায়ের চিকিৎসা করাব, বিয়ে করব, সংসার করব, মাথা গোঁজার মত একটু আশ্রয় খুঁজে নেবো। জোরে বলব না। ভেতরে ভেতরে তোমার জন্যে একটু উদ্বেগ মাত্র। তুমি যদি রাসকিন থেকে হঠাৎ 'কোট' কর। বলা যায় না, করতেও পার। দেখলেই মনে হয় লেখাপড়া করেছ। তুমি যদি বল, আনটু দিস লাস্ট—সমষ্টির মঙ্গলেই ব্যষ্টির কল্যাণ। উকিল আর নাপিতের জীবিকা অর্জনের সমান অধিকার, তাদের পরিশ্রমিকও একই নীতিতে নির্ধারিত হবে। কৃষক, মজুর, যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের জীবনই আদর্শ জীবন। তুমি একটি প্যারাসাইট। বড় বিপদে পড়ে যাব ভাই।

সেই বহুতল বাড়িটার তলায় চলে যাও। সেখানে প্ল্যানিং হয়। অনেক ফাইল, অনেক কাগজ, মিটিং, টাস্ক ফোর্স ক্র্যাশ প্রোগ্রাম, কাপ কাপ চা, কাজু, এক্সপার্ট কমিটি। ঘাড় উঁচু করে দেখ, সারাদিন হাওয়ায় পতাকা ওড়ে পতপত করে। গাড়ি ঢুকছে বেরোচ্ছে। গম্ভীর মুখে পেছনের আসনে ত্যারছা হয়ে বসে আছেন চিন্তাক্লিষ্ট সেই সব মানুষ যাঁরা গত বত্রিশ বছর ধরে 'আনটু দিস লাস্ট' করে চলেছেন।

না, বিচলিত হবার কিছু নেই। প্রধান প্রবেশপথের সিঁড়ির শেষ ধাপে একটি ক্ষয়ে যাওয়া বৃদ্ধ ছেঁড়া গামছা পেতে তার ছেলেটিকে শুইয়ে রেখেছে। শীর্ণ কঙ্কাল। স্বাধীন ভারতের বাতাসে তেমন পুষ্টি নেই। শুধু জলে জীবন বাঁচে না। ভেতরের মিটিং-এ বাইরে খাদ্য ঝরে পড়ে না। একমাত্র খাদ্য 'খাবি'। ছেলেটি খাবিই খাচ্ছে। একটু দূরে চানাঅলার কড়াতে ভুট্টার খই ফুটছে। বৃদ্ধ পিতা দুটি ভুট্টার খই ভিক্ষে করে এনে ছেলেটির পাণ্ডুর ঠোঁটের ওপর রেখে বলছে—খা বাবা, খা'

জ্ঞানী ব্যক্তি পান চিবোতে চিবোতে সেরেস্তায় ঢোকার মুখে বলে গেলেন

—আরে এই বোকা বুড়ো, সামনেই গঙ্গা, শেষের সময় মুখে একটু জল দাও। বৃদ্ধ ফ্যাল ফ্যাল করে জনপথের দিকে তাকিয়ে রইল, ভুট্টা, না গঙ্গার জল? কোনটা!

গভীর নিস্তব্ধ রাতে এই পথে বিবেকানন্দ কি এখনও পায়চারি করতে করতে দৃপ্তকণ্ঠে বলতে থাকেন: সলিল বিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দন বিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মর প্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্ন মৃন্ময় প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ, দৃষ্ট-বংশ কঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্তত শীর্ণদেহ-ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশা-ব্যঞ্জিতবদন নরনারী বালক-বালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো মহিষ বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি এই আমাদের বর্তমান ভারত।

\ ত্রিংশকোটি মানবপ্রায়জীব (সংখ্যাটাই যা বেড়েছে)—বহু শতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিপীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশা-হীন অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, 'যেন তেন প্রকারেণ' বর্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন শৃগালবৎ নীচ চাতুরীপ্রতারণাসহায়, স্বার্থ-পরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন-আশাহীনের-সমুচিত কদর্য-ভীষণ কুসংস্কার পূর্ণ, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপী-কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত। /

Oh, how my heart ached to think of what we think of the poor, the low, in India. They have no chance, no escape, no way to climb up.

অন্ধকারে দূর থেকে আর একটি ছায়া মূর্তি কি এগিয়ে আসছে। চার-পাশের ইমারতে তার কণ্ঠ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুট হ্যায়। মেহের আলি! তুমি। দু জোড়া ট্রামলাইন শহরের ইস্পাত-কঠিন হৃদয়ের মত সমান্তরাল রেখায় দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সব ঝুট হ্যায়। একমাত্র সত্য ওই শূন্যের আকাশ।

....

বঙ্গেশ্বর

.. . .

দেরাদুনে গেলুম। যাবো মুসৌরী। বিকেলের দিকে ফুরফুরে হাওয়ায় বেড়াতে বেরিয়েছি। আমি দেখছি আমাকেও দেখছে। দেখ্ দেখ্ বাঙালী যাতা হ্যায়। বাঙালী যাচ্ছে তো তোমাদের কি বাপু। যাতা হ্যায় তো কেয়া হুয়া হ্যায়। আমি কি চিড়িয়াখানার জীব। রুখে দাঁড়াও, ভীত হোয়ো না বাঙালী। আরে তেঁড়দোনি বাঙালী। বিশাল সব চেহারা। তাড়াতাড়ি কাছাকোঁচা সামলে উল্টো দিকের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লুম। রাস্তা কেঁপে গেল হো হো হাসিতে।

এক গেলাস চা দিয়ে অপমানের ক্যাপসুল গিলে কিছুক্ষণ বসে রইলুম স্থির হয়ে। ঠিক হ্যায় পশুবলে তোমাদের সাঙ্গে পেরে উঠব না। স্পিরিচুয়াল

শক্তি দিয়ে তোমাদের কাত করে দেবো। পেশি নেই, মগজ আছে। হাইট নেই ইনটেলেকট আছে। পাগড়ি নেই টাক আছে। বুদ্ধিমানদেরই টাক হয়। কত রকম টাক আছে জান! উইজডাম বল্ডনেস। তিন দিন ধ্যানে বসে বীজ মন্ত্র জপ করব, মাথার চারপাশ দিয়ে জ্যোতি বেরোতে থাকবে। সেই হ্যালো দেখে সব ভয় পেয়ে যাবে। জ্যোতিষ্মান বাঙালী।

সন্ধ্যেবেলা রায়বাবু বললেন, সামান্য জিনিস নিয়ে মনের মধ্যে অত ঘোঁট পাকাচ্ছেন কেন? হাঁস দেখেছেন তো! পরমহংস হতে পারবেন কিনা জানি না, হংস তো হতে পারবেন। পালক ঝেড়ে জল ফেলে দিন। আর দু পিস মাছ নিন। বেশ করে ভাতে ঝোল মাখুন। এমন ফিশ কলকাতায় পাবেন না। মহাশোল। সাহারানপুর, লাকসার থেকে আসছে, ফাসক্লাস জিনিস।

মুসৌরীর বাসে জানালার ধারে আগে ভাগেই একটা সিট বুক করেছিলুম। দৃশ্য দেখতে দেখতে পাহাড়ে উঠব। জানালার ধারে বসা হল না বাঙালী হওয়ার অপরাধে। আরে এটা তো অমার সিট তুমি কে?

আরে উসমে কেয়া হ্যায়, আওর তো সিট হ্যায়, পিছে চলা যাও।

তার মানে?

তার মানে, মোসাই পিছুনে যো সিট আছে উখানে তুমি গিয়ে বুসো। উসমে ক্যা হর্যা হ্যায়!

পেছনের আসন থেকে একজন আমাকে ডাকলেন, আরে মুসাই আমার পাশে আসিয়ে বসুন।

আমার আসন যিনি দখল করে বসে আছেন তাঁর দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। কিছুই হল না। দুর্বাসা বোধ হয় বাঙালী ছিলেন না।

পেছনের আসনে গিয়ে বসতেই ভদ্রলোক ফিস ফিস করে বললেন, কেন গোলমাল করছেন, এখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না।

আমিও ফিস ফিস করে বললুম, 'কি আশ্চর্য! আপনি বাঙালী!'

'ইয়েস সেণ্ট পার্সেণ্ট বাঙালী।'

'তা হলে ওই রকম বাংলায় কথা বলছিলেন কেন?'

'ওকে বলে ঠেট বাঙলা। বাঙালীয়ানাকে অতি কষ্টে চেপে রেখেছি। প্রায় সাকসেসফুল। ধরা না দিলে ধরতে পারবে না। দেশ বুঝতে গেলে গোপাল ভাঁড়কে ডাকতে হবে। পৈতৃক নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্তকে করেছি বি এন ডুটা। ভাত ছেড়ে রুটি ধরেছি। খইনি অভ্যাস করেছি। বিশেষ কায়দায় পিচিক পিচিক করে থুতু ফেলা অভ্যাস করেছি। বিদেশ বিভুঁয়ে করে খেতে হলে বাঙালী হলে চলবে না মশাই। দোজ ডেজ আর গন।'

'নিনকমপুপ। আমি প্রতিবাদ করব। আমার ঠাকুর্দা লাটসাহেবের সঙ্গে খানা খেতেন। মজঃফরপুরে আমাদের লিচুবাগান ছিল। সাঁওতাল পরগনায় বাগানবাড়ি ছিল। আমার ঠাকুর্দার বাবা নেটিভ স্টেটের এক রাজার ছেলের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এলগিন রোডে ছিলেন নেতাজী সুভাষ, সিমুলিয়ায় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, আমহার্স্ট স্ট্রীটে রাজা রামমোহন, বীরসিংহ গ্রামে সিংহ-শিশু বিদ্যাসাগর জোড়াসাঁকোয় ট্যাগোর। আমি লড়ে যাবো।'

'উত্তেজিত হবেন না, বসুন বসুন। মনে মনে প্রতিবাদ করুন। যাঁদের নাম করলেন তাঁদের ভাঙিয়ে আর কতদিন চালাবেন। নিজের দেশের মানুষই এঁদের ভুলতে বসেছে, বিদেশে ক'জন আপনার এই অ্যানসেসটারদের

নামে আপনাকে মাথায় তুলে নাচবে? বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়। মানুষের বাচ্চা সবসময় মানুষ হয় না। বাঙালীর বাচ্চা কি যে হয় বলা শক্ত।'

'পড়ত আমাদের বিজু মস্তানের পাললায়। এক পেটোতে বাস উড়িয়ে খাদে ফেলে দিত।'

ভদ্রলোক হাসলেন। তাচ্ছিল্যের হাসি। ডিজেনারেটেড বাঙালীর হাসি।

'হাসছেন আপনি। ইউ আর লাফিং।'

'হাসব না তো কি ক্রাইং করব। স্বদেশে পূজ্যতে মস্তান বিদেশে লাথ খাইবা।'

'আমি লিখব। জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখব। পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড।'

'বাট নট মাইটিয়ার দ্যান মানি। থাকেন কোথায়?'

'কোলকাতায়।'

'করেন কি?'

'চাকরি।'

'নিজের বাড়ি?'

'এক সময় ছিল। পূর্বপুরুষরা বেচে দিয়েছেন। এখন ভাড়া বাড়ি।'

'খাস কোলকাতায় জমি কেনার ক্ষমতা আছে?'

'না।'

'চাকরি গেলে অন্য কিছু করার মুরোদ আছে?'

'না।'

'প্রেজেণ্ট জেনারেসানের ওপর আস্থা আছে?'

'তেমন নেই।'

'কলকাতার কতটা জমি আপনাদের দখলে?'

'ছটাক খানেক।'

'অর্থনীতির কতটা অংশ আপনারা কনট্রোল করেন?'

'সামান্যই।'

'আর একটা বিদ্যাসাগর, আর একজন রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সুভাষ ওই সয়েল থেকে উঠবে?'

'ডুপ্লিকেট হয় না কি! কোথায় হয়েছে! দুটো লিনকন, ওয়াশিংটন, শেকসপীয়র নিউটন হয় কি?'

'হয় না, তবে একটা জাত তৈরি হয়। তৈরি করা যায়। আমাদের সেটা হয়নি। যিনি উঠেছেন তিনি সোজা ওপর দিকে রকেটের মত উঠেছেন, আমরা তারাবাজি দেখে হাততালি দিয়ে গান গেয়েছি, আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে।'

'তা হলে?'

'স্পিকটি নট। পেছনের আসনে বসে নেচে নেচে পাহাড়ে চলুন। বেশী দাম দিয়ে একটি ছড়ি আর টুপি কিনুন।'

'ছড়ি আর টুপি কেন?'

'বাঙালীর সিম্বল, ছড়ি দিয়ে নিজের জাতভাইদের খোঁচাবেন, আর টুপি! এর টুপি ওর মাথায়, ওর টুপি এর মাথায় চাপিয়ে দিন চালাবেন।'

ভদ্রলোক হই হই করে হেসে উঠলেন। বেশ ফুসফুস ভরা হাসি। প্রশংসা না করে পারা যায় না।

'বেশ পুরুষোচিত হাসি আপনার।'

'এটাও রপ্ত করতে হয়েছে। বাঙালী-হাসি হল ফিচিক করে। নিজের ক্যারেকটার পালটাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসির ক্যারেকটারও পালটাতে হয়েছে।'

'আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ঘৃণা করছেন। লজ্জা করে না।'

'তেরি মেরি বাঙালী। কদু শাকের কাঙালী॥ শুনুন তাহলে, পশ্চিম বাংলায়, আপনাদের পাচ্ছিম বাংলায় অনেক ধান্দা করেও একটা ভাল চাকরি জুটল না। ভাল মানে, হাজার, দেড় হাজার নয়, বেঁচে থাকার মত রোজগারের একটা চাকরি। পশ্চিম বাংলায় তো সান অব দি সয়েল শ্লোগান চলবে না—হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন, শক, হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। অনেক চেষ্টায় ব্যবসাদারের গদিতে নাম কো ওয়াস্তে চাকরি মিলতে পারে, সকাল আটটা থেকে রাত দশটা, বড় জোর দুশ কি তিনশ টাকা। তাও মাইনে মিলবে তাগাদায়। কনস্টিপেটেড এমপ্লয়ার সারা মাস একটু একটু করে মাল উগরাবেন। দেশ বিভাগের ফলে মজা আরও চরমে উঠেছে, মেয়েরা নেমেছেন চাকরির বাজারে। ষাট টাকা, সত্তর টাকা, আশি টাকায় ভাল



হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে

ভাল মেয়ে। একজন কর্মদাতা, একজন অন্নদাতা হেসে হেসে বলেছিলেন— বাঙালী মেয়ে হামি খুব লাইক করে, যেমন খাটতে পারে তেমন হাসতে ভি পারে। ঝণ্ডা উড়ায় না, ইউনিয়ন ভি করে না। খেটে খেটে, অপুষ্টিতে, কুড়িতেই বুড়ি হয়ে সংসারের কর্নারে ঝুড়ি হয়ে পড়ে থাকে। আপনার সামনেই তো আর একটা প্রভিনস্ চলেছে, তাকিয়ে দেখুন, কমপেয়ার করুন। বাঙালী হবে সিকলি, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, মুখে পলিটিকস, সোস্যালিজম, কবিতা, ফিল্ম, পেটে গ্যাসট্রাইটিস, পায়ে আর্থ্রাইটিস। কামাইক। বাত মাৎ বোলো ভাই। লিটারেচারকা যিতনা মশুর হিরো থা, সব প্রেমে মরেছে। টিবিতে টেঁসেছে।'

'ধ্যাত্ মশাই, অনেকদিন বেংগলে যাননি তাই আবোলতাবোল বকছেন। আধুনিক বাঙালী অন্যরকম। এবার যখন আসব গোটাকতক স্যাম্পল আনব, দেখবেন ক্যায়সা সরেস মাল। আমরা তো সব ওল্ড ভ্যালুজ। নিউ ভ্যালুজ একেবারে অন্যরকম।'

'কি রকম! পশ্চিম বাংলায় চাকরি পাবে?'

'শক্ত।'

'বিহার, ইউ পি, ওড়িষা, মাদ্রাজ, দিল্লিতে চান্স পাবে?'

'বলা শক্ত।'

'আচ্ছা পুরীর সিবীচে বসতে পারবে, না লাথি খাবে?'

'শক্ত প্রশ্ন।'

'আচ্ছা, হরিদ্বার থেকে হাওড়ায় ফেরার রিজার্ভেশন পাবে, কিংবা জম্মু টু শেয়ালদা?'

'শক্ত।'

'আচ্ছা, নিজের প্রতিষ্ঠিত চাচার কাছে গেলে চাকরি পাবে যেমন পায় দক্ষিণীরা।'

'না, বাঙালী সাধারণত বাঙালীর জন্যে করে না।'

'এই তো, পথে আসুন। বাঙালী ব্যবসাদার আর এক বাঙালী ব্যবসাদারকে সাহায্য করে?'

'শুনিনি।'

'এই তো পথে আসুন।'

'তা হলে বাঙালী এইভাবেই মার খাবে?'

'কেন, মার খাবে কেন? নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, মামলা মকদ্দমা করবে, বাঁশাবাঁশি করবে। নানা দলে ভাগ হয়ে পেটোপেটি করবে। পরচর্চা করবে। বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে মারামারি করবে। ডান হাতে হাতল, একজনের পা আর একজনের পায়ের ওপর, বাঁ হাতে খামচাখামচি। দুইজন ইংরাজ একত্র হইলে ক্লাব হয়, দুইজন স্কচম্যান একত্র হইলে ব্যাংক হয়, দুইজন বাংগালী পাশাপাশি হইলেই, সদ্য শিং গজানো ছাগ শিশুর ন্যায় ঠুস্ঠাস, ঢিসঢাস হইতে থাকে। অতএব হে বঙ্গেশ্বর! চুপ করিয়া বসিয়া থাক, গৃহে গমন করিয়া আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্বটি অবলোকন করিয়া মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিয়া ওঠো—হেই বাঙালী, প্রুফ পড়ার ভুলে—হেই কাঙালী।'

সর্বেশ্বর

আমি সর্বেশ্বর রায়। আমার মত আরও অনেক সর্বেশ্বর হিদার অ্যান্ড দিদার ছড়িয়ে আছে।

আমার বাইরেটা ন্যাশন্যালিস্ট ভেতরটা ইম্পিরিয়্যালিস্ট। নিজের কেরিয়ার ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝি না, বুঝতেও চাই না। আমি সর্বেশ্বর। নিজেই নিজের ঈশ্বর।

আমার কাজই হল ডান্ডা ঘোরান। আমি জানি মীরজাফরের সঙ্গে জগৎ শেঠের হাত মিললে সব সিরাজকেই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে। আমার স্বরূপ সকলে ধরে ফেললেও আমাকে বা আমার জাতভাইদের ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে না কারণ আমরা হলুম গিয়ে বাই-প্রডাকট অফ ইন্ডিপেন্ডেনস। এদেশে প্রডাক-টের তেমন মূল্য নেই বাই-প্রডাকটই সর্বত্র জ্বলজ্বল করছে। মলের চেয়ে চুটকি ভারি। মালের চেয়ে পয়মালেরই কদর বেশী।

আমি এইভাবেই তৈরি। যে দেশে যেমন মালের প্রয়োজন। অহমিকা, পণ্ডিত মূর্খতা, স্বার্থপরতা, অন্ধতা, নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা, মধ্যবিত্তের নীচতা, অ্যামবিসান প্রভৃতি চোলাই করে যে নির্যাস, সেই বস্তুটিই হল 'আমি'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটা ছাপ আমি সংগ্রহ করেছি। বিদেশেও গেছি। কান্ট, হেগেল, হিউম, রাসকিন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শেলি, কিটস, বায়রন, হোমার পড়েছি, কপচেছি, এখনও কপচাই, কিন্তু যখন চেয়ারে বসি তখন আমি সর্বেশ্বর রায়। তখন আমার মনে হয়, আমি মধ্যযুগের দাস-ব্যবসায়ী। আমি নরমের যম, যমের নরম। আমি সিন্নি দেখে এগোই কোঁতকা দেখে পেছোই। আমি সামনাসামনি লড়ি না। আমার নীতি হল 'ডগবাইট'। পেছন দিক থেকে ঘ্যাঁক করে কামড়ে দাও। কামড়ে যেন সাফিসিয়েন্ট বিষ থাকে। ঢোঁড়া বা হেলের কামড় নয়। পাগলা কুকুরের মত সাংঘাতিক কামড়। যাকে কামড়াব, সেই আক্রান্ত ব্যক্তি জলাতঙ্কে না মরলেও আতঙ্কে যেন আধমরা হয়ে থাকে।

॥ **সর্বেশ্বরাতঙ্ক** ॥ আমার ভয়ে আঁৎকে উঠুক। একমাত্র আমার স্ত্রীর কাছে ছাড়া আমি সর্বত্রই ভীষণ গম্ভীর। আমি হাসলে আমার পার্সোন্যালিটি লিক করবে। ভালবাসা বড় দুরূহ অভ্যাস, ঘৃণা অনেক সহজ ব্যায়াম, সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়, অভ্যাস করা যায়। অর্থ আর ক্ষমতা ছাড়া আমার কাছে সব কিছুই ঘৃণার বস্তু। সোস্যালিজম, ডেমোক্রেসি এ সব আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি পৃথিবীতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস এইভাবে হয়েছে এবং হবে—ক্ষমতা-শালী, আরও ক্ষমতাশালী, আরও আরও ক্ষমতাশালী। আমি জানি তৈলেই সর্বসিদ্ধি। তৈল বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। আমার জনৈক পূর্বপুরুষ বড় খাঁটি কথা বলে গেছেনঃ তৈল এক প্রকার স্নেহজাতীয় পদার্থ। বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে। তুমি আমাকে স্নেহ কর আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমাকে যারা তেল মারে আমি তাদের জন্যে অল্পস্বল্প করে থাকি। অধিকাংশ সময়েই বলি, আচ্ছা, দেখব, দেখব, হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। আশার সরু

সুতোয় উমেদারদের ঝুলিয়ে রাখি। আমার চারপাশে তারা খলবল করতে থাকে। একে বলে জিইয়ে রাখা। আমি তো জানি, কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। যতদিন আশায় আশায় রাখব ততদিনই আমার লাভ। আশা চেয়ে থাকা ভাল হৈয়ে গেল তো হৈয়ে গেল। আমার চারপাশে সব সময় একদল স্তাবক থাকবে, কলাটা মুলোটা দেবে। সেই পরিচিত দৃশ্য, বসে বসে বিস্কুট খাচ্ছি, চারদিকে ঘিরে বসে আছে সারমেয়র দল। জিভ বের করে হ্যা হ্যা করছে। কখনও এর দিকে, কখনও ওর দিকে একটা দুটো টুকরো ছুঁড়ে দেবো। লোভে লোভে সব পটাক পটাক করে ন্যাজ নাড়বে, ন্যাজ নাড়ার দল। কিছু সর্বেশ্বর আর কিছু ন্যাজ নাড়া জীব, এই তো ভারত। ভোগা দিয়ে কাগা মারা।

আমার অস্ত্র হল আতঙ্ক। স্বাধীনতা আবার কি। জন্মেই তো অর্থনীতির দাস। টাকা যার মোকদ্দমা তার। প্রভু আর দাস, মানুষে মানুষে এই তো চিরকালের সম্পর্ক। মাঝখানে আমরা হলুম গিয়ে ফিলটার পেপার। আমাদের তেল দাও মাগ-ছেলে নিয়ে কিছুদিন টিঁকে থাকবে, আমাদের ন্যাজে পা দাও ধনে-প্রাণে মরবে। সব সংসারেই আমাদের ছায়া লুটিয়ে আছে।

নব্য যুবক বাড়ির খানা-টেবিলে বসে খুব হেসে হেসে মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছিল। হঠাৎ তার হাসি ফিউজ হয়ে গেল। ঠ্যাঙের আর দাঁতের দূরত্ব ক্রমশই বাড়ছে। কি হল তোমার ?

কিছু না, মনের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সর্বেশ্বর।

নতুন সংসার। ছোট ফ্ল্যাট। স্ত্রীর হাসি, চুল খোঁপা, দুল, হার, খানাপিনা, উন্নতি, আয় সব আমার হাতের মুঠোয়। স্যার, স্যার করবে, আগে স্যার পিছে স্যার, সর্বেশ্বর সারাৎসার, স্যার সর্বেশ্বর। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে, যেদিকে চালাব সেদিকে চলবে। আমার হাতে প্রোমোশান আমার হাতেই ডিমোশান, ট্র্যান্সফার, পোস্টিং।

কেমন যেন ভয় ভয় করছে, তাই তো। করবেই তো। শয়নে, স্বপনে সর্বেশ্বর।



আমার বাইরেটা ন্যাশন্যালিস্ট ভেতরটা ইমপিরিয়্যালিস্ট

তিনি খুশি তো! তিনি বিরূপ হলেই আমি গন। গন উইথ দি উইন্ড।

ফিজিক্যাল টর্চারের চেয়ে মেণ্টাল টর্চার অনেক কার্যকরী। মন বস্তুটিকে মেরে ফেল। আমরা হলুম মানুষের জায়গিরদার। আমাদের 'বেকারি'তে মানুষের সুখের পুডিং তৈরি হচ্ছে। তাল তাল সুখ দু হাতে চটকাচ্ছি। ভয় দেখাতে বেশ লাগে। সুটেড-বুটেড একটা জ্যান্ত বুদ্ধিঅলা মানুষকে ধমকধামক দিতে বেড়ে মজা। মুখটা কেমন হয়ে যায়। তালু শুকিয়ে গিয়ে জিভে কেমন কথা জড়িয়ে যায়। চোখ দুটো কেমন পাঁঠার চোখের মত বোকা বোকা, ফ্যালফেলে হয়ে যায়।

চাকরিজীবী মানুষ কত ভীতু। ভীতু মানুষদের ন্যাজে খেলাবার মত আনন্দ দ্বিতীয় আর কি আছে! চাকরি আছে বেশ আছে। চাকরি গেল তো হাতে হ্যারিকেন। যাদের কিছুই নেই তারা তো বেপরোয়া। নেঙটার নেই বাটপাড়ের ভয়। যারা ফুটপাথেই জন্মাচ্ছে, ফুটপাথেই মরছে তাদের আর কি ভয় দেখাব। আমার খেলা মধ্যবিত্তদের নিয়ে, যাদের কিছু আছে, আরও কিছু পাবার বাসনা আছে, পেয়ে হারাবার আতঙ্ক আছে। থাক কুকুর তুই মাড়ের আশে। মাড় দিব তোয় পৌষ মাসে।

॥ **লাগ লাগ লাগ লাগিয়ে বসে আছি** ॥ আমরা বোসের পেছনে সেনকে লাগাই, সেনের পেছনে বোসকে, চাটুজ্যের পেছনে বাঁড়ুজ্যেকে, বাঁড়ুজ্যের পেছনে ভটচাযকে। হ্যাঃ দেশ আবার কি। প্ল্যান প্রোগ্রাম। গুলি মার। গৌরী সেনের টাকায় গাড়ি চাপছি, মোটা মাইনে পাচ্ছি, ট্যুরে যাচ্ছি, উপরি আসছে, তবে আবার কি। দেশ চলবে ট্যাকসের টাকায়। স্বদেশের মাঠে ফসল নাই বা ফলল, বিদেশের সাহায্যে পেট ভরবে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক, আমরা ঠিক লাইনে ফেলে দিয়ে, লাগিয়ে বসে থাকব। আমরা ম্যাজিক জানি।

॥ **সর্বেশ্বরের কেরামতি** ॥ আমাদের নীতিই হল ম্যানেজমেণ্টের নামে মিস ম্যানেজমেণ্ট। আমরা মানুষকে প্রতিদিন টেনেটুনে রাস্তায় নামাব, ফিরে যাবার কোনও ব্যবস্থা রাখব না। পথঘাট, যানবাহন, শান্তি, নিরাপত্তা, জীবিকার ব্যবস্থা সব কিছু ভাঙচুর, এলোমেলো করে রেখে দেব। নিজেদের জীবন ছাড়া সকলের জীবনে একটা ঘিনঘিনে অনুভূতি ছড়িয়ে দেব। বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াটাই হবে সকলের কাছে পরম শান্তির। আমাদের অনুচ্চারিত স্লোগান —জ্বলছে জ্বলবে। আমরা সর্প হয়ে দংশন করব, ওঝা হয়ে ঝাড়বার ভান করব। আমরা হলুম কেতু। ছোট ছোট ছুঁচকে সমস্যার পিন ফোটানোয় মানুষকে জেরবার করে দেব। বড় কিছু, সুন্দর কিছু, মহৎ কিছু ভাববার অবসর যেন না থাকে। মানুষ ভাববার অবকাশ পেলেই আমাদের আসন টলে যাবে। 'সিসটেম', হ্যাঁ, 'সিসটেম', এ দেশ এমনভাবে এমন একটা ভাগ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে যেখানে ছত্রাকের মত আমরা গজাবই, কুরে কুরে খেতে থাকব আবহমান কাল ধরে। দার্শনিকদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে দুটি শ্রেণী—খাদ্য আর খাদক। জীব, জীবাহার। রাজনীতি। রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতির কভি মোলাকত নহি হোগি। 'সাদ' কি বলেছিলেন মনে নেই? **Politics teach men to deceive their equals without being deceived themselves.** এক একটা নির্বাচন আসে, জমানা পালটায়, মানুষের ভাগ্য বদলায় না, শুধু কিছু অজগরের সৃষ্টি হয়। বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, ব্যবসা হয়, পারমিট হয়, ব্যাঙ্ক-ব্যালেনস হয়। উদাস দার্শনিকের মত পলিটিসিয়ান বলেন, খুব হয়েছে এনাফ এবার নেকসট গ্রুপ

কিছুদিন লুটেপুটে নিক। ছেলেবেলায় সিগারেট কম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখতুম, মেন মে কাম, মেন মে গো...টেনর কনটিনিউ ফর এভার। রেজিম উইল কাম, রেজিম উইল গো, সর্বেশ্বরস উইল কনটিনিউ ফর এভার।

ভাই সকল, দুঃখ কর না, জগতের নীতিই হল—কিল অর বি কিলড। পরিস্থিতিই মানুষকে রাজা করে, পরিস্থিতিই মানুষকে প্রজা করে। লুট্‌ লে, লুট্‌ লে। তোমাদের ক্ষমতা থাকে চলে এস আমাদের ব্যান্ডওয়াগনে। আমরা হলুম স্বার্থ পার্সোনিফায়েড। সর্বেশ্বর হল সেই জাতের প্রাণী যাদের সম্পর্কে জীববিদ্যার বইতে এইভাবে একটি অনুচ্ছেদ লেখা যেতে পারেঃ

মধ্যবিত্ত হইতে উদ্ভূত এক ধরনের প্রাণী। আকৃতিতে মানুষ, প্রকৃতিতে সরীসৃপ। স্পর্শকাতর, পরমুখাপেক্ষী অথচ অহংসর্বস্ব। ঘৃণাপ্রবণ স্বদেশী। অসম্ভব বিদেশপ্রীতি। বিদেশের কুকুর ধরে, স্বদেশের ঠাকুর ফেলে। বাইরেটা কালো, ভেতরে পরিপূর্ণ সাহেব। মিস্টার রায় কিংবা সর্বেশ্বরদা বললে রেগে পাইপ কামড়ায়। রায় সাহেব না বললে অধস্তনের চাকরি খায়। এরা প্রায়শই অন্ধ হয়। দৃশ্য জগৎটাকে নিজেদের মত করে দেখে। অন্যের দেখা দেখা নয়, নিজের দেখাটাই দেখা। [ঠিক সময়ে অপিসে আসবেন। আজ্ঞে, বাস নেই, ট্রাম থাকে না, জ্যাম রাস্তাঘাট কোদলান। সো হোয়াট। আসতে না পারেন চাকরি ছেড়ে দিন। রিমেমবার গোপাল ভাঁড়, দ্যাট ফেমাস ম্যান, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বলেছিলেন—রোজ সকালে একটা করে সন্দেশ মুখে ফেলে জল খাওয়া আমার অভ্যাস। সে থাকলেও খাই, না থাকলেও খাই। কিছু থাক, না থাক নিয়ম ইজ নিয়ম। আমি গাড়িতে আসি, সো হোয়াট। একদল গাড়ি চাপবে আর একদল চাপা পড়বে। একদল খাবে আর একদল উপোস করবে। একদল প্রাসাদ বানাবে আর একদল থাকবে।]

এই প্রজাতির প্রাণীর এই ধরনের জীবনদর্শন। এরা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। ড্রাগন কাল্পনিক জীব। এরা মানুষের খোলে ড্রাগন। নিঃশ্বাসে আগুনের হলকা, প্রশ্বাসে বিষ। এরা আদর্শের কথা, সুব্যবস্থার কথা, সুশাসনের কথা মুখে বলে, কাজে করে অন্য। সৃষ্টিতত্ত্বে এরা একটি প্রহেলিকা।

সমাজশরীরে আমি ক্যানসারের কোষ। বিন্দুর মত ফুটে উঠি তারপর মালটিপ্লাই অ্যান্ড মালটিপ্লাই। পায়ের কড়ার মত। প্রথমে আঙুলের মাথায় শক্তভাব। ক্রমে ক্রমে গ্যাংজ। যতই কাট বৃদ্ধি রোধ করাব ক্ষমতা কারুর নেই। কোন ওষুধও নেই। সমাজশরীরে আমরা সেই পদকর্ণ। ভেতরে বাড়ি, বাইরেও বাড়ি। আঙুল থেকে পথ করে করে হাঁটু বেয়ে, তলপেট ফুঁড়ে, ওপর পেট হয়ে, ফুসফুস হৃদয়, গলনালী।

আমাকে শিক্ষায় পাওয়া যাবে, শিল্পে পাওয়া যাবে, সংস্কৃতিতে পাওয়া যাবে। আমি অর্থনীতিতে কলকাটি নাড়ি, আমি কৃষিতে বেঁড়ে ওস্তাদি দেখাই, বিজ্ঞানীদের ডেকে কেতাবীবুলি কপচাই। পদাধিকার বলে বিশাল রঙ্গমঞ্চের সর্বত্র আমরা গদা ঘোরাই। কেউ যদি প্রশ্ন করে, ওহে সর্বেশ্বর আর কতকাল! আমরা বলি, সবুরে মেওয়া ফলে। যদি আবার বলে, সবুরে সবুরে কটা স্বাধীনতা দিবস গেল? আমরা বলি, শাটআপ, দুশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি পাঁচশো বছরের আগে যাবে না। জন্মচক্রে বারছয়েক পাক মেরে আসুন তখন দেখবেন, দেখবেন তখন সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং। এইসব বলি, আর মনে মনে হাসি, অনেক অনেক বছর আগে এক উর্দু কবি বলেছিলেন—বুন্ধুকা দেশমে

ধুর্তুকা রাজ।

এইভাবে গ্র্যাজুয়েলি আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে মেরে ধসে যাওয়া সমাজে সারি সারি কবর তৈরি করব। চিৎপুরের দোকান থেকে মার্বেল কিনে তার ওপর চিৎ করে রাখব। লেখা হবে এপিটাফঃ

॥ এপিটাফ ॥ হিয়ার লাইজ এ সর্বেশ্বর। এ'র মনে ছিল একটি বাঁশঝাড়। ইনি স্বদেশের পশ্চাদ্দেশটিই কেবল দেখেছিলেন। বাঁশের, যেমন স্বভাব। কোনও এক জন্মে স্বদেশের মুখ দেখার আশায় ইনি শায়িত। ইনি জন্মে দুঃখ দিয়েছেন, মরে শান্তি দিলেন। তবে শোনা যায়, অক্টোপাসের বাহু কেটে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে গজায়।

ফোঁস

আমি তখন গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকটি মনে মনে শুধু নাড়াচাড়া করছি না, অভ্যাস করারও চেষ্টা করছি। শুধু রিডিং পড়লে তো হবে না! প্রয়োগ চাই। কুরুক্ষেত্রের জন্যেই তো গীতা। আমি আড়চোখে দেখছি। দেখছি পাশে বসে থাকা হাঁসফাঁস মোটা মানুষটির বিবিধ কেরামতি। অনেকক্ষণ ধরেই ভেতরটা জ্বলছে। যা বলা উচিত বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বলব না। কয়েক মাস নাগাড়ে গীতা পাঠ করে নিজেকে চিনে ফেলেছি। ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বাস্তুঘুঘু 'আমি'টাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যাঁরা আমাকে একবচন ভাবেন তাঁরা ভুল করেন। আমি আসলে দ্বিবচন। স্ত্রী যখন বলেন, কি হে তুমি আড্ডা মেরে পান চিবোতে চিবোতে এলে। ওই যে তোমার খাবার চাপা আছে। মনে মনে হাস্য করি। কি ভুলই করছ রমণী! বল 'তোমরা'—কি হে আড্ডা মেরে ফিরলে তোমরা। তোমাদের খাবার চাপা আছে। দুটো আমি একটা খোলে ঢুকে পড়েছে। একটা বসে আছে নাভিমূলে তার বশংবদ প্রজাদের নিয়ে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। আর একটি বসে আছে মাথার ওপর গ্যাঁট হয়ে। তিনি উদাসীন। তাঁর ভাবখানা দেখি তোর কেরামতি! নীচ-আমিটা তেড়ে-ফুঁড়ে উঠতে চাইছে। মাসখানেক আগে হলেও সহযাত্রীর সঙ্গে ঝটাপটি বেধে যেত। আমি যে এখন গীতাপাঠ করি।

ভদ্রলোক আমাকে ঠেলতে ঠেলতে জানালার সঙ্গে চেপে ধরেছেন। কাঁচা কদলীকাণ্ডের মত উরু দিয়ে আমার যোগশীর্ণ, ইন্দ্রিয়-ফলাহার ত্যাগী পাটকাঠি সদৃশ উরুটিকে হেনস্তা করছেন। ব্রীফকেসের আধখানা আমার কোলের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আমি যেন তাঁর বেতনভোগী গোমস্তা! কিংবা তিনি ছেলের বাপ, আমি বিবাহযোগ্য কন্যার ছেলে-ধরা বাপ। মিনিবাসে পাশাপাশি বসে মাছ ধরতে চলেছি। প্যান্টের বাঁ পকেটের গভীরে কিছু একটা আছে। বাঁ হাত পকেটে ঢুকিয়ে সেটি বার করার চেষ্টা। কনুইটা প্রথমে এসে খোঁচা মারল আমার পাঞ্জাবি ঢাকা পাঁজরের রিডে। কনুই ক্রমশ উঁচু হয়ে আমার থুতনিতে এসে লাগল ঘটাং করে। আমার জিভটা তখন কশের দাঁতের গর্ত থেকে একটি জোয়ানের দানার

মুক্তির কাজে ব্যস্ত ছিল। জিভের ডগাটি দাঁতের জাঁতাকলে পড়ে একটু দাগরাজী হয়ে গেল। হাত পকেট থেকে কাম্য বস্তুটি এইবার টেনে বের করে আনছে। কনুই উঠছে। ওপর দিকে উঠছে। ফচাত করে তেড়ে এসে চোখের চশমাটাকে নাকের ওপর ত্যারচা করে দিল। 'তিনছি নজারিয়াকে বান' ছুঁড়লাম। মহামানবের কোন গেরাহ্যিই নেই। তার মানে ভদ্রলোকের একটা 'আমি' ফাংশান করছে না। নাভির 'আমি'র দাসত্ব করছেন। খুব ইচ্ছে করছে বলি—কি হচ্চে মশাই! কিন্তু বলছি না। ঢোক গিলছি। কেবল ঢোঁক গিলছি।

গিলেকরা একটা সিগারেটের প্যাকেট বেরিয়েছে। অ্যাঃ নীচের-'আমি'র ওপর ওপরের-'আমি'র কোনও কনট্রোল নেই রে। একেবারেই 'বিমূঢ়াত্ম'। সিরগেট সিরগেট নয় সিগরেট। ওটি না খেলে চলবে না। বসেই ধরাতে হবে। অ্যাঁ বসেই ধরাতে হবে! কত বছর বয়সে মুখাগ্নি হয়েছে! মুখে আগুন! না ওসব মেয়েলী গালাগাল। গীতাপাঠে-বিশুদ্ধ মনের কথা নয়। নীচের 'আমি'র চোঁয়া ঢেঁকুর। অবশ্য মেয়েরা বলেন সন্ধি করে—'মুখেয়াগুন'।

এই রে আবার বাঁ হাত ঢুকছে বাঁ পকেটে। হ্যাঁ এবার ঢোকার মুখেই খুনখারাপী হয়ে গেল। ঘড়ির ব্যাণ্ড। ইয়া চওড়া গিরিগিটি মেটালিক গন্ধর ব্যাণ্ড খ্যাঁস করে করাতের মত হাত ছুঁয়ে গেল। বাঃ বেড়ে হয়েছে। নুনছাল উঠে গেছে। সেই আগেব প্রক্রিয়া। পকেটে কতরকমেব মাল আছে কে জানে! এ যেন গেরস্থ বাড়ির সিন্দুক। ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে বাঁ হাত পকেট সমুদ্র মন্থন করে চলেছে। পাঁচিলের ওপাশ থেকে লগা দিযে প্রতিবেশীব ফলগাছে খোঁচা মারার মত আমাব শরীরের দক্ষিণাংশে কনুইয়ের খোঁচা চলেছে। ওবে ব্যাটা আমি একটা জ্যান্ত মানুষ—নিউটার জেন্ডার নই। না, ব্যাটা বলব না। গীতার শ্লোকটা মনে মনে আওড়াইঃ

তদ্‌বুদ্ধযস্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥

সাধন করে করে করে করে, চেতনসত্তাকে, খোঁচা মাবা 'আমি'টাকে তদভিমুখী করে দি। তুমিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য প্রভো। তুমিই আমাদের বুদ্ধির একমাত্র বিষয়। তুমি শুধু আমায় মধ্যে নও সর্বত্রই বয়েছ। এমন কি পাশের এই মালটির মধ্যে, আহা মাল নয়, মাল নয়, মানুষটির মধ্যেও রয়েছ। আমি তদবুদ্ধয়-স্তদাত্মানঃ হয়ে যাই। জ্ঞানরূপ সলিলের দ্বারা আমার নীচের প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞান ধুয়ে দি। এর ফল কি হবে? কেন? গীতা বলছেন, এর ফলে সকল বস্তু, সকল ব্যক্তির প্রতি আমার পূর্ণ সমভাব হবে।

আমার মুখে ভলকে ভলকে শস্তা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে প্রভু। কোলের ওপর দিয়ে সিগারেট ধরা হাত চালিয়ে, নাক ঘেঁষে জানালার বাইরে ভীষণ অসভ্যের মত ছাই ঝাড়ছে। আমার কোলে ছাইয়ের মুণ্ডু ভেঙে পড়েছে। 'সরি' বলেনি একবারও।

না বলুক। তোমার তো সমভাব হয়েছে। তুমি তো সাম্যে স্থিত। ঠিক স্থিত হতে পারি নি প্রভু। তবে লাস্ট ফিফটিন মিনিটস ধরে চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, তুমি ব্রহ্মে সব সমর্পণ করে দাও। কারণ, ব্রহ্ম সমস্বরূপ, সমংব্রহ্ম। সাম্যে স্থিতং মনঃ হয়ে যাও। হলেই দেখবে—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গরু, হাতি, ছাগল, কুকুর সব সমান। একে বলে সমদর্শন। একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ। তুমি ব্রহ্ম, তোমার পাশেরটিও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্কোয়ার। সমান ব্রহ্ম দোষ শূন্য, নির্দোষং হি

সমং ব্রহ্ম।

প্রভু ইনি ব্রহ্ম নন ব্রহ্মদৈত্য। এইমাত্র ব্রীফকেসটা এমনভাবে টেনেছেন, পাশের ধারাল অ্যালুমিনিয়াম পাতের খোঁচায় আমার পাঞ্জাবির সুতো উঠে গেছে। ব্রীফকেসের ডালা খুলে ভাঁজ করা একটা প্ল্যান বের করেছেন। সেই কাগজটা তিনি এখন সপাটে খুলেছেন। সামনের দিকটা সামনের আসনে বসে থাকা ভদ্রলোকের মাথার পেছনের দিকের চুল এলোমেলো করছে। পাশের দিকের কোণটা আমার চশমার কাঁচের এক সুতো তফাতে কাঁপছে। দুটো ব্রহ্ম কিন্তু দুরকম স্বভাবের। এখন বাঁ পাটা নাচাতে শুরু করেছেন। অত্যন্ত বদ অভ্যাস। ওই নৃত্যে আমার অনিচ্ছাতেই আমার ডান পাটা থরথর কাঁপছে। আমি পা নাচান পছন্দ করি না, কিন্তু জোর করে নাচিয়ে দিচ্ছে। এইবার প্রভু তোমার গীতার শিক্ষা ফেল করবে বলে দিচ্ছি।

বেশ, তুমি পঞ্চম অধ্যায়েই থাক তবে বাইশতম শ্লোকটি স্মরণ কর:

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

ব্যাখ্যা কর। তা করছি কিন্তু কতক্ষণ এভাবে ঘাড় কাত করে থাকব! এ কি অত্যাচার! দুজনে একই পয়সার টিকিট কেটেছি। আসনের থ্রি-ফোর্থ ওনার পশ্চাদ্দেশে। তাতেও হচ্ছে না। ক্রমান্বয়ে চেপে আসছেন। এতক্ষণ ধুনো দিয়ে আরতি করলেন এইবার চোখের সামনে ব্লু-প্রিন্টের চামর। আমি কে? তুমি? সেই এক 'আমি' মহা 'আমির'ই একটি মায়া। তুমি কেউ নও। ব্যাখ্যাটা মনে মনে অনুসরণ কর। বস্তুর সংস্পর্শে হয় তোমার সুখ, না হয় তোমার দুখ। সুখ বলে কিছু নেই। আপাতদৃষ্টিতে যাকে সুখ বলে মনে হয় পরিণাম কিন্তু



প্রভু ইনি ব্রহ্ম নন ব্রহ্মদৈত্য

তার দুঃখ। যেমন ধর, পাশে যে মানবটি বসে আছেন তিনি যদি একটি ডাগর সাইজের মানবী হতেন এবং তিনি যদি তোমাকে জানালার সঙ্গে ঠেসে ধরে কদলীকাণ্ড সদৃশ উরুটি নাচাতেন তাহলে তোমার হৃদ্দেশে পুলকের যে স্পন্দনটি তৈরি হত তা বস্তুজগতের স্পর্শ থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু এর আদি আছে, অন্ত আছে—আদ্যন্তবন্তঃ। তুমি কেন মনে করতে পারছ না পাশের লোকটি একটি সুন্দরী মহিলা। অবশ্য আমি তোমাকে তা মনে করতে বলছি না কারণ গীতার কোন অনুচ্ছেদে অর্জুনকে আমি নেগেটিভ উপদেশ দিই নি।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম।

বুদ্ধিকে ধরে বুদ্ধির ওপরে উঠে যাও, সেখানে আছেন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাকে পাকড়াও কর। আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং তোমার দুর্নিবার শত্রু কামকে ধ্বংস কর। কামের উল্টো ক্রোধ। মহিলা বসলে গলে যেতে। পুরুষ বসেছে অমনি তার অল্পস্বল্প ছন্দপতনে রেগে মরছ। তোমাকে আমি কি বলেছি - যিনি জ্ঞানী, যার বুদ্ধি (বুধঃ) জাগ্রত তিনি কি ভোগ কি দুর্ভোগ কোন কিছুতেই সুখী বা অসুখী নন। তাঁর আত্মা বাহ্য-বস্তুর স্পর্শে আসক্ত হয না, তিনি আপনাতেই আপনার আনন্দের সন্ধান পান। অতএব পাশের বস্তুটির স্পর্শ উপেক্ষা করে বেশ আনন্দ করতে করতে এগিয়ে চল।

কিন্তু ইনি যে এখন ঢুলতে শুরু করেছেন। এনার ঢুল আবার বাঁদিকে। সাইনবোর্ডের মত কেতরে পড়েছেন। মাথাটা আমার কানের পাশে লটপট করছে। আমি কি ওনার বেডরোল। বেশ মজা তো। দোবো নাকি গুঁতিয়ে। উঁহু, ও কাজ মাসখানেক আগে করা চলত। এখন আর চলে না। গীতা আমাকে রোজ সকালে সাম্য শেখাচ্ছেন।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

শত্রু, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ সকলের প্রতিই আমার সমভাব হওয়া উচিত কারণ আমাকে দেখতে হবে, দেখার অভ্যাস করতে হবে, সব সম্বন্ধ অনিত্য, জীবনের চির পরিবর্তনশীল অবস্থা থেকেই সমস্ত সম্বন্ধের উৎপত্তি। এমন কি বিদ্যার, শুচিতার, পুণ্যের দাবি নিয়ে ছোট-বড়, উঁচু-নীচুর বিচার চলবে না। সাধু, অসাধু, পুণ্যবান, বিদ্বান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, পতিত চণ্ডাল আমার দৃষ্টিতে সব সমান, সকলের প্রতিই আমি সমবুদ্ধিসম্পন্ন।

এইবার তে-এঁটে মাথা দিয়ে আমাকে গোঁত্তা মেরেছে প্রভু। ভীষণ লেগেছে। আর তো ভাবতে পারছি না যে আমিই আমার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছি। নিজেকেই নিজে ঢুঁ মেরেছি। গীতা দিয়ে এই মালকে কাবু করতে পারছি না প্রভু। আমি এখন কথামৃতে চলে যাই। ঠাকুর বলেছেন, ফোঁস করবি। ত্রিগুণাতীত হলেও ফোঁসটি ছেড়া না মানিক। এই তমোগুণী দেহপিণ্ডকে সত্ত্ব দিয়ে সামলান যাবে না, রজঃ দিয়ে ধাক্কা মারতে হবে।

হাত দিয়ে মাথাটা ঠেলে দি।

—কি হল, কি হল রমলা?

—ও বাবা, রমলার স্বপ্ন দেখছেন। মরেছে। আমি রমলা নই, কিছুক্ষণ খাড়া হয়ে বসার চেষ্টা করুন স্যার।

—কেন কি হয়েছে?

হয়নি কিছুই। আমার নামবার জায়গা এসে গেছে। উঠে দাঁড়াই। হাঁটু দুটো সরাবার কোন লক্ষণ নেই। জাম্বুবান। যেতে দিন। শক্তি থাকে ঠেলে চলে যান। ও চ্যালেঞ্জ! ঠিক হ্যায়, রজঃ জাগো। মেরেছি ঠ্যালা। সামনের সিটের পেছন দিকে একটা ইস্ক্রুপ বেরিয়েছিল, পাটা চিরে গেল। তমোগুণাশ্রিত ক্রোধে শরীর জ্বলছে। অসভ্য, নিগার। মেরে থোবনা ফাটিয়ে দোবো। আমি গেটের কাছে—তাই নাকি?—বুড়ো বয়েসে গুন্ডামি। জানেন আমি কে? পাদানি থেকে আমার উত্তর—তার আগে জানা দরকার আমি কে? রাস্তায় নেমে পড়েছি। দু' কদম পেছিয়ে এসে কাটা জানালার কাছে আমার মুখ—জানেন আমি কে? জানেন না। হে হে। আমি, আপনি, আপনি আমি, আপনারা আমি, আমি আপনারা...

লাল আলোয় কলকাতা মুহূর্তের জন্যে থেমে ছিল। সবুজে আবার চলমান। ...আমরা সবাই এই এক কলকাতার সম্বন্ধী।

গ্রীষ্মের দীর্ঘশ্বাস

গ্রীষ্ম এল। কলেরার ইঞ্জেকসান নিতে হবে। পাখায় ব্লেড পরিয়ে গোটাকতক হাতপাখা কিনতে হবে। সাবান আর পাউডারের খরচ বাড়বে। দুপুরের রোদে সুন্দরী মহিলাদের বাইরে বেরোন বন্ধ করতে হবে। রোদের তাপে মুখের এনামেল চটে যাবে। গ্রীষ্ম এল, গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে।

গ্রীষ্মে গেরুয়া। সন্ন্যাস ভাব প্রবল। সব ছেড়ে ছুড়ে, নিজেকে সংযত করে পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে হিসেবের খাতা খুলে বসা, কি এল, কি গেল। বছরের পর বছর গেল। পলি পড়ে পড়ে জীবননদীর জল অস্বচ্ছ ঘোলাটে। নিজের প্রতিবিম্বটাই আর দেখা যায় না। জীবন একটা বড় লিকেজ। ফুটোপাত্রে সময়ের জলাশয়। নিজের উত্তাপেই নিজের জীবন কেঁপে কেঁপে উড়ে গেল। এখনও একটু তলানি পড়ে আছে। অন্ধকার ইঁদারা। সেই কোন তলায় কালচে একটু জল। খসখসে চামড়া, বিস্ফোটকযুক্ত একটি ব্যাঙ মন খারাপ করে বসে আছে। মাঝে মাঝে কুলুক কুলুক করে ডাকছে। তুমি কে হে। আমি তুমি হে! ফেলে পালিয়েছ। আর বেরোতে পারছি না। আমার পরিবেশ ক্রমশই শুকিয়ে আসছে। এই আমার নিয়তি। ব্যাঙের নিয়তি।

এই তো বর্ষা নামবে। তখন তোমার চারপাশ জলে ভরে উঠবে না? না তো! কত বর্ষা এল গেল। এ যে আচ্ছাদিত ইঁদারা। অহং-এর চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। ঘটাকাশ না ভাঙলে চিদাকাশ খুলবে কি করে! তুমি ভাঙোনা? ভেঙে চুরমার ফেল। কায়দাটা জানি না যে। কিছু বই ফেলে দোবো? তাতে কি হবে? সব ভিজে যাবে। গলে যাবে।

তুমি কিছু দেখছ না? হ্যাঁ দেখছি। ঊর্ধ্বের গোল ফোকর যতটুকু দেখায় তাই দেখছি। কখনও আলো কখনও অন্ধকার। কিছু শুনছ না? হ্যাঁ শুধু নিজের

কণ্ঠস্বর। আমি যদি স্তব্ধ না হই কেমন করে শুনবো জগতের কণ্ঠস্বর! তোমার ওই 'কুলুক কুলুক' থামাও না। পারি না থামাতে। আমি যে অনবরতই চাইছি। আমার চাওয়ার শেষ নেই। আমার এই অবস্থায় নিজের সম্বন্ধে কিছুই যে জানা সম্ভব নয়। মৌচাক দেখেছো? আমি যে সেই চাকের মোম: আগুনও জানি না, পুড়তেও জানি না। তারপর সেই মোম থেকে যখন বাতি তৈরি হয়, আর সেই বাতি যখন জ্বলতে থাকে তখনই মোম তার অগ্নিগর্ভ ক্ষমতার পরিচয় পায়।

কি তুমি বলতে চাও?

সহজ কথা। তোমার বেঁচে থাকাটাই মৃত্যু। মৃত্যুটাকেই তুমি জীবন ভেবে মহা সুখে আছ। তাহলে? এই গ্রীষ্মেব উত্তাপ, এই এত আলো, এর কোন কিছুই তোমার কাছে পেঁাছোবে না। কি জানি? তবে শোনোঃ দি ট্রু লাভার ফাইন্ডস দি লাইট ওনলি ইফ্ লাইক দি ক্যান্ডল, হি ইজ হিজ ওন ফ্যুয়েল, কনজিউমিং হিমসেলফ। বুঝলে কিছু?

মনে হচ্ছে। নিজেকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে, জ্বলতে জ্বলতে খরচ হতে হতে আলো আর উত্তাপ পেতে হবে। প্রকৃতি জ্বলছে। ফাটছে। ক্ষয় হচ্ছে। নিজের উত্তাপে বিমর্ষ। বর্ষায় পুলকিত। বসন্তে উদার। শীতে সংকুচিত। প্রকৃতি চলছে নিজেব নিয়মে, বেপরোয়া। তার হাতে আছে সৃষ্টির কৌশল। সে যেমন ঝরাতে জানে, তেমনি ভরাতেও জানে। অফুরন্ত তার ভাণ্ডার। আমরা শুধু ক্ষইতেই জানি। না, না। এ তো তোমার একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী। তাহলে রুমি কি বলছেন শোনঃ

টু রীডস ড্রিঙ্ক ফ্রম ওয়ান স্ট্রিম।
ওয়ান ইজ হলো, দি আদার ইজ সুগারকেন॥

একই স্রোতস্বতীর জলে পুষ্ট। তুমি হলে শূন্যগর্ভ খাগড়া। আখ হতে পারলে না কেন? সব 'কেন'র তো জবাব মেলে না। হ্যান্ডস অফ ডেসটিনি। ভাগ্যবিধাতা। এই উত্তাপে কেউ শীতল ছায়া পায়, কেউ ধু-ধু প্রান্তরে জ্বলে মরে।

যদি বলিঃ খুদিকো কর বুলন্দ ইতনা
কি হর তকদীর সে পহেলে
খুদা বন্দে সে খুদ পুছে বতা
তেরী রজা কেয়া হ্যায?

তোমাব আত্মবিশ্বাস, তোমাব চেতনশক্তিতে গ্রীষ্মের সন্ন্যাসীর মত অটল হয়ে বসে থাক। দেখনা কি হয়! ঈশ্ববও তখন তোমার তেজের কাছে ম্লান। তোমার ভাগ্যলিপি বানাবার সময নিজেই এসে চুপি চুপি তোমাকে জিজ্ঞাসা কববেন বলো তুমি কি চাও?

আমি কি চাই? এই মুহূর্তে আমি আবার শীত ফিরে পেতে চাই। না তা হয না। তবে তোমার মনের মধ্যে শৈত্যের একটা বোধ আনার চেষ্টা করতে পার। প্রকৃতি জ্বলছে জ্বলুক, মনে তুমি শীতল থাক। ডুব্বার সে লড়ো তুন্দ লহরোঁ সে উলঝো, কহাঁ তক চ'লাগে কিনারে কিনারে। লড়ে যাও। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে যাও। কতদিন আব কিনারে কিনাবে হাঁটবে।

আমি তো সে যুগের লাটসাহেব নই, সিমলায় গ্রীষ্মাবাসে পালাব। ফিল্মস্টার নই গুলমার্গে শুটিং করে কাটাব। কল্পনা করি পৃথিবীর কোথাও এখন বরফ পড়ছে। তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশীর্ষ রোদেব আলোয় আকাশের গায়ে প্রকৃতির

ওষ্ঠ বিস্ফারিত হাসির মত লেগে আছে।

ঝরনার শব্দ শুনি কল্পনায়। হারিদ্বারের গঙ্গার বরফ শীতল জল। সন্ধ্যেবেলা দুলে দুলে ভেসে চলেছে সারি সারি জ্বলন্ত প্রদীপ, রাশি রাশি ফুল। মনে যদি বরফ পড়াতে পারি গ্রীষ্মের উত্তাপ আমার কি করবে! কিন্তু,

চমনমে যব কাহি হোতা নেহি বাহার কা জিকর্
তো লোগ বিতি বাহাবোঁকা বাৎ করতে হ্যায়।

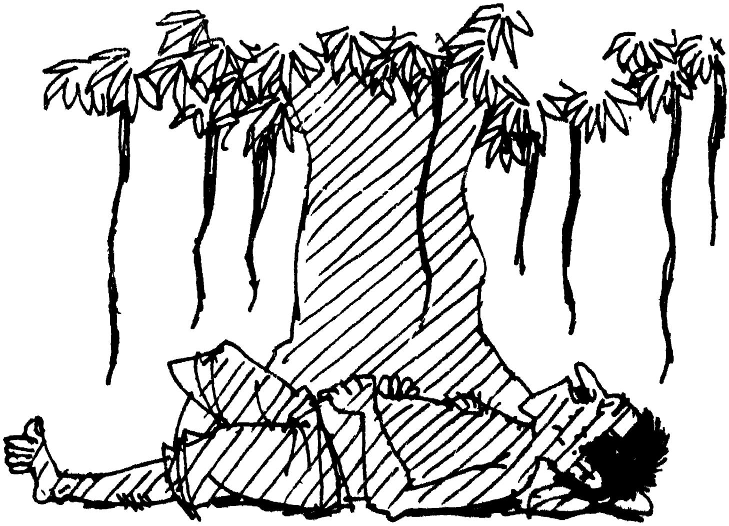
যাঁরা মাঠে কাজ করেন, তাঁদের কাছে কিবা গ্রীষ্ম কিবা শীত। গায়ে গেঞ্জির ছাপ। পোড়া তামাটে স্ট্যাচুর মত চেহারা। এই গ্রীষ্মের দুপুরেও তাঁরা গাইতে পারেন, এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল।

নির্জন রাস্তায় ঠ্যাং ঠ্যাং করে কাঁসি বাজাতে বাজাতে চলেছেন বাসনঅলা। ক্লান্ত কণ্ঠ. তামা, পেতল, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম বাসন। হেঁকে চলেছে, বম্বাই চাদর। সায়া, শেমিজ ব্লাউজ। মালবোঝাই ঠ্যালা ঠেলে নিয়ে চলেছেন দুই মধ্যবয়সী মানুষ। রিকশাঅলার পিঠে মুক্তোর দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম। আয়েসী আরোহী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন আর ভাবছেন,

মৎ পুছকে ক্যা হাল হ্যায় মেরা তেরে পিছে
তু দেখ ক্যা রঙ্গ্ হ্যায় তেরা মেরে আগে।

পৃথিবী যেন জলরঙে আঁকা ছবি। সামনে চড়া রঙ মাঝে হালকা, দূরে আরো হালকা। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র। কোন কালটা তাহলে দরিদ্রের। শীত নয় নিশ্চয়। হিমশীতল রাতে ছেঁড়া চটে ফুটপাথে শুয়ে দেখা হয়নি। বর্ষা, সেও তো নিরাশ্রয়ের কাল নয়। কটা মানুষের মাথার ওপর ছাদ আছে?

তাহলে গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মই এদেশের উপযুক্ত ঋতু। বট আছে শীতল ছায়া পায়ের তলায় লুটিয়ে। সবুজ ঘাসের বিছানা আছে। বাতাস আছে। সেই সোস্যালিস্ট গ্রীষ্ম এসেছেন বর্ষাকে পেছনে রেখে।



চৈত্রের সন্ন্যাসীরা এগিয়ে চলেছেন গাজনের দিকে। বাবার নামটি মৃত্যুঞ্জয়, শমন করে ভয়। সারা জীবনই যাঁদের কাটে কৃচ্ছ্রতায় তাঁরা সেই কৃচ্ছ্রতাকেই একটা অনুষ্ঠানের একটা ব্রতের চেহারা দিয়েছেন। এদেশে দরিদ্র হতে কোনো লজ্জা নেই বরং গৌরব আছে। সংখ্যাধিক্যের গৌরব। গ্রীষ্মকে তাই আমরা ঘর্ম দেবো, উপবাসে ক্লিষ্ট, চর্মসার শরীরের মিছিলে আবাহন জানাবো। জীর্ণ বলদ হাল টানবে মাঠে মাঠে। সন্ধ্যার অন্ধকারে উদাস চোখে রোমন্থন করতে করতে ভাববে, জলে, উত্তাপে পৃথিবী শস্যশ্যামলা হোক। তারপর একদিন তার বিশাল কঙ্কাল ত্রিভঙ্গ হয়ে একপাশে পড়ে থাকবে। স্নিগ্ধ গোয়াল, সযত্ন সাঁজালের স্বপ্ন এইভাবেই মৃত্তিকায় মিশে যাবে। কৃষি বিশেষজ্ঞ বলবেন, আহা বড় সুন্দর বোন মিল। বহুদূর আকাশে মাংসলোভী শকুন লাট খাবে। চামড়ার জুতো পরে বাবু আসবেন মসমশিয়ে। ক্যাপিটেল যার ভোগের অধিকার তার। বলদ তো দু রকমের, এক, রিয়েল বলদ, দুই হিউম্যান বলদ। মৃত্যুর পর একজনের সৎকার হয়, এক মুঠো ছাই পোড়া কাঠকয়লার সঙ্গে হাওয়ায় উড়তে থাকে। আর একজনের সৎকার হয় না। সবচেয়ে বোকা, তাই সবচেয়ে বড় দাতা।

বনস্থলীতে এখন যেন যাত্রার আসর বসেছে। কাঁচা সবুজের সাজ পরে নানা চেহারার গাছ। দর্শক নেই তবু সারাদিন সেজেগুজে জমাট হয়ে আছে। পলাশ উঠেছে লাল হয়ে। নতুন জীবনের গান। এমন সময় যদি দেখা যায় সোনালী হলুদ রঙের শাড়ির আঁচল উড়িয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে কোনও প্রেমিকা চলেছে, প্রেমিকের কাঁধে হাত রেখে। না, এ দৃশ্য চোখে পড়বে না। যুগের সঙ্গে প্রেমের চেহারা পাল্টে গেছে। মানব, মানবীরা এখন প্রেম চায় না, প্রকৃতি চায না, দেহ চায়। ফুলের গন্ধ আসে শিশিতে, বিলিতী নামের লেবেল নিয়ে। বাতাস? তার জন্যে মাঠ কেন? একটি পাখাই তো যথেষ্ট। নামী রেস্তোরাঁর মোলায়েম অন্ধকারে রুমকুলার থেকে চোখের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। দুটি হাত পাশাপাশি। পাখির ডাক নয়, বিলিতী সুর। উর্দিপরা বেয়ারা। প্রেম করতেও ক্যাপিটেল চাই। আমি সাকার দুষ্মন্ত তুমি ইংলিশ মিডিয়মের শকুন্তলা, ট্রা লা লা লা।

আমি কাটলে বাড়ি, আমাকে না দেখলেও সেজে উঠি। আমার পথে চৈত্রের ধুলো ওড়ে অভ্রের মত। আমার পথে আমিই হাঁটি। মাঝে মাঝে জরিপের বাবুরা আসেন ধ্বংসের চোখ নিয়ে। সেগুনের নধর কাণ্ডে হাত রেখে ইজারাদার ভাবেন, আহা, চিরলে ফাইন গ্রেন বেরোবে। ফাশক্লাশ ফার্নিচার হবে হে।

পালিয়ে এসো। তোমার ইঁদারায় আবার ঢুকে পড়। বাইরে বেশীক্ষণ থাকলে মন উদার হযে যাবে। ক্যাপিটেলে টান ধরবে। মরবে তখন। সঙ্কীর্ণ না হলে বাঁচবে কি করে এই যুগে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, চাকরি, কেরিয়ার। এর বাইরে বেশীক্ষণ থেকো না হে। প্রকৃতি বড় মোহময়ী।

আমি যে প্রেম করতে চাই। আহা মরে যাই। বলো সেক্স চাই। আমি যে গ্রীষ্মের চাঁদনী রাতে ভাল্লুকের মত পাকা মহুয়া খেয়ে ঘাসের বিছানায় শুতে চাই। মরবে নাকি। বিছে কামড়াবে, সাপে ছোবলাবে। পয়সা থাকে শহরে বসে ভাল্লুক খাও। এই নাও, পড়ে দেখো কি লেখা আছে। আই হ্যাভ মেজারড আউট মাই লাইফ উইথ কফিস্পুনস।

তবে তাই হোক। গ্রীষ্মের দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে যাই। রোদ লাগলে পিত্ত বাড়বে। প্রেসার চড়বে। পাখির ডাক শুনতে চাও? রেডিওর নাটক শোন টেপ

রেকর্ডে পাখির কলকাকলি ধরা আছে। প্রেম চাও। আত্মপ্রেমিক হও। নিজের চেয়ে ভালবাসার ধন আর কি আছে। শকুন্তলারা সেই আঙটি হারাবার পর থেকে বড় সাবধানী হয়ে গেছে।

দিল এ নাদান তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়
আখের ইস দর্দ কী দবা ক্যা হ্যায়?

কাশীধামে কাক মরেছে বৃন্দাবনে হাহাকার

এই সর্বাধুনিক বন্যা সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে।

আপনি আবার কি বলবেন? ছিলেন শহর কলকাতায়, শুকনো ডাঙগায়। আপনার আবার কি বলার থাকতে পারে?

প্লিজ অ্যালাও মি টু সে সামথিং।

বেশ বলুন। তবে দু-চার কথায়। ম্যালা বজরং বজরং করবেন না।

এই যে বন্যা, আমি জানি না, এর সঙ্গে বাইবেলোক্ত ডেল্যুজের তুলনা করা চলে কি না! (না চলে না।) ডোন্ট ডিসটার্ব, আমাকে মিনিট তিনেক বলতে দাও, দাও, দাও আমায় বলতে দাও। ডেল্যুজ হল গিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাপার। উত্তর ও দক্ষিণে কমলালেবুর মত ঈষৎ চাপা পৃথিবীটাকে পুরোপুরি জলে না চোবালে শাস্ত্র-সম্মত মহাপ্রলয় হয় না একথা আমি জানি, আমি মানি; কিন্তু এটাকে আমরা প্রাদেশিক প্রলয় বা বাঙালী বন্যা বলতে পারি। আমি আশা রাখি, আমাদের পরিকল্পনাবিদরা যদি ঠাণ্ডা মাথায় আর কয়েক বছর কাজ করার সুযোগ পান তাহলে এই প্রাদেশিক প্রলয় অবশ্যই রাষ্ট্রীয় প্রলয়ের চেহারা নেবে এবং তখন আমরা অখণ্ড ডেল্যুজ না হলেও খণ্ড ডেল্যুজের স্বাদ পাব।

নিজেকে একটু পরিষ্কার করুন। কি বলতে চাইছেন বোঝা গেল না।

তবে শুনুন। ঈশ্বর কহিলেন, কি কহিলেন—ধরা আজ পাপে ভরা বুঝলে নোয়া, মানুষের ছ্যাঁচড়ামি, ভণ্ডামি, দুষ্টুমি, পাগলামি, নেমোখারামি ভীষণ বেড়ে গ্যাছে হে। অনেক আশা নিয়ে মানুষ তৈরি করেছিলুম এখন সেই মানুষই আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে, আমি মানুষ মারব, মেরে লোপাট করে দেবো।

ঈশ্বর এত ভ্যাজরং ভ্যাজরং করেননি। তিনি দু লাইনে প্রলয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন:

I will destroy man whom I have created from the face of the earth ; both man and beast, and the creeping thing and the fowls of the air ; for it repenteth me that I have made them.

একেবারে পরিষ্কার কথা—করে ফেলেছি ভাই, ফেলে এখন বুঝছি কি মাল ছেড়েছি বাজারে! এইবার জল দিয়ে ঢেইয়ে ঢেইয়ে পৃথিবীটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দোবো। যেমন সুনীলবাবু বলেন—কি ভুল করেছি দাদা সংসার করে, ছেলেপুলে নয়তো সব কটা বকরাক্ষস! যেমন বলেন বিধানবাবু—দোবো

একদিন লাথি মেরে সব চুরমার করে। যেমন করেছিলেন হরেনবাবু মালের ঘোরে —নিজের আটচালায় আগুন লাগিয়ে ধেই ধেই নৃত্য—আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে বোওওল হোরি বোল।

ঈশ্বরের দু কথা তুমি নিজেই পাঁচকথা করে রবারের মত টেনে টেনে বাড়ালে, নাও এবার আমাকে বলতে দাও। আবহাওয়া দপ্তর সন্ধ্যের ঘোষণায় জানাল: আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাষে বলা হয়েছে, হালকা থেকে মাঝারি থেকে ভারী ধরনের কয়েক পশলা বৃষ্টি হবে। যেই এক পশলা হল সরকারী বাস বন্ধ হল। যেই আর এক পেগ পেটে পড়ল...

অ্যাই, পেগ আসছে কোথা থেকে, হচ্ছে জলের কথা, বন্যার কথা।

ওই হল রে বাপু, আর এক পশলা হতে না হতেই ট্যাকসির মিটার ঢাকা পড়ল লাল কাপড়ে। আর এক পশলায় প্রাইভেট আউট। রইল পড়ে মিনি। তেনার তলপেটে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ লাগতে তখনও আরও পশলা কয়েকের প্রয়োজন। অবশেষে লাস্ট ফর দি রোড—সব ব্যাটাই আউট। পড়ে রইল ক্ষতবিক্ষত সরীসৃপ রাস্তা—ঈশ্বরের পুত্রদের মানুষ মারা কল। এরই মধ্যে দিয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে..

কাপড় না প্যাণ্ট?

আহা ওই হল। কিছু বলার উপায় নেই। চলারও উপায় নেই বলারও উপায় নেই। কেবল হোঁচট। হাঁটতে হাঁটতে কখনও হাঁটু জল, কখনও কোমর জল। বুড়ো আঙুলের নখটা সি এম ডি এর সিকে লেগে সুটকেসের ডালার মত ওপর পানে উঠে গেল। তখন একটা এটিএস লজেনস মুখে ফেলে চুষতে চুষতে..

এটিএস লজেনসটা কি জিনিস? ওটা তো ইনজেকসান বলেই জানি।

সে কি? তাহলে পকেট থেকে বের করে মুখে ওটা কি ফেললুম?

কাফ লজেনস টজেনস হবে।

যাঃ তেরিকা, আমি তো এটিএস ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। কি হবে?

কি আর হবে! নখটা কোথায়?

সেটাকে তো চেপে বসিয়ে তার ওপর আরও কয়েকজনকে বসিয়ে মোটামুটি বাগে এনেছি।

ব্যাস ছেড়ে দিন। আর ভাবতে হবে না, ধনুষ্টংকার হলে এতদিনে হয়ে যেতো।

তারপর সেইভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রবল থেকে প্রবলতর বর্ষণের মধ্যে দিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। আমি ঢুকলাম পেছন পেছন একটা ব্যাং ঢুকলো। প্রতিবাদ করায় স্ত্রী বললেন—আহা থাক থাক কৃষ্ণের জীব। ও সোফায় উঠে থেবড়ে বসে থাক, অনেকটা তোমার মত দেখতে গো, প্যাণ্ট-জামা পরালে অবিকল তোমাব ক্ষুদ্র সংস্করণ। ওকে থাকতে দাও, দাও, দাও। তাছাড়া ছাতার বড় অভাব, কারিগর যখন নিজেই এসেছে তাড়িও না, বলা যায় না দু-একটা যদি তৈরি করে ফেলে।

বেশ জবরদস্ত একটা উত্তর দোবো ভেবেছিলুম, তার আগে জেনে নিলুম খিচুড়ি হয়েছে কি না। আমার স্ট্রিক্ট অর্ডার বৃষ্টি হলেই খিচুড়ি। যখন শুনলুম হয়েছে তখন পতিতপাবনবাবুর কন্যাকে ক্ষমা করে দিলুম।

তিনি আবার কে?

আমার ফাজিল স্ত্রী। অতঃপর পেঁয়াজ দিয়ে মুশুর ডালের খিচুড়ি, বেশ ফুলোফুলো, ছোটো ছোটো লালচে লালচে মুচমুচে ডিমভাজা, একটু গব্য ঘৃত, বেশ ফাসক্লাস করে মেরে, পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে ফুলোফুলো নরম বিছানায় সব দোরতাড়া বন্ধ করে, পাখাটাকে দুপয়েণ্টে নিয়ে গিয়ে বৃষ্টির অবিরাম শব্দ শুনতে শুনতে...

হয়েছে...হয়েছে...এর নাম বন্যা! এতে দুর্ভোগটা কোথায়, সবই তো ভোগের কথা!

আমি কিন্তু এখনও শেষ করিনি। এ হল গিয়ে প্রথম রাতের কথা। এখনও তিনপ্রহর বাকি। পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদরটা চাপা দেবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে রেগুলার ফাইট করে একবাটি গরম সরষের তেল আদায় করে বেশ ঘষে ঘষে পায়ের তলায় অ্যাপ্লাই করেছি। দুটো বালিশে ঘাড় উঁচু। সিগারেট ধরা হাতটা মশারির বাইরে। মাথাটাও মশারির বাইরে। মনে মনে গুন গুন—এলো বরষা সহসা যে রে ভাই, রিম-ঝিম ঝিম-ঝিম গান গেয়ে যা-আআই। ফ্যাঁচাফাঁই আলো গেল। জানালার কাঁচে রুষ্ট লাল আকাশ বিদ্যুতে বিদ্যুতে শিউরে উঠছে। গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর বজ্রনির্ঘোষ। বাইরে যেন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলেছে। শেষ পাক ঘুরে পাখা ভারতীয় প্রগতির মত স্থির।, অ্যাশট্রেটা ছিল মেঝেতে প্রায় হাতের কাছাকাছি তবু হাতটাকে একটু বাঁকিয়ে ছাই ঝাড়তে হচ্ছিল। একটু তন্দ্রার মতও এসেছিল। আমি ভাবলুম ঘুমোলে মানুষের হাত বোধহয় লম্বা হয়ে যায়, তা না হলে অ্যাশট্রেটা হাতের কাছে উঠে এল কি করে। একটু একটু দুলছে যেন। অ্যাশট্রেরও পদস্খলন। সিগারেটটা ফেলে দিলুম অ্যাশট্রেতে। বেসামাল ছাইদানী নিয়ে ধূমপান করার সাহস হল না। ঘুমচোখে ভুল দেখছি না তো, আমার ফেলে দেওয়া সিগারেটের টিপের মত আগুন সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কি রে বাবা? ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। আহা! মুদিত নয়নে কি পবিত্র মনোরম দৃশ্য! হরিদ্বারের গঙ্গায় সারি সারি প্রদীপ ভেসে চলেছে, দুলে দুলে, নেচে নেচে। কানের কাছে জল ভেঙে ভেঙে কে যেন আসছে? হরিণ! নাকি কোনো ঘোটকী কিংবা কোনো অপ্সরা? কে তুমি? কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা? আমি পতিতপাবন দুহিতা। হাতে লণ্ঠন। মাঝি বৈঠা তোলো।

প্রথমে মনটা কেমন নেচে উঠল। ছিল পুবে মাথা পশ্চিমে পা, এখন দেখছি উত্তরে মাথা দক্ষিণে পা! কি করে এমন করলে গো! তুমি কি যাদু জানো ভাই? আরে ড্রেসিং টেবলটা আমার ডানপাশে এসে লগবগ করছে কেন? ধমকাচ্ছো নাকি? কর্নার টেবিলটার এমন দুর্মতি কেন—রেগেমেগে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চাইছে। ওকে ধরো। ওকে চলে যেতে দিও না। ওর ড্রয়ারে আমার শেষ মাসের সম্বল। উঠে বোসো মানিক ঘরে তোমার কোমর জল।

কোথেকে এল?

যেখান থেকে আসে। পয়ঃপ্রণালী থেকে রাস্তা পেরিয়ে পায়ে পায়ে, ধীরে ধীরে।

অ্যাঁ সেই নর্দমার জল। আমি আর নামছি না, নামবো না, না না না...

ঈশ্বর বললেন, কলকাতার নোয়া তুমি, বৌবাজার থেকে একটি জোড়া খাট কিনবে। বড় উপকারী, প্রাণদায়িনী বস্তু। মহাকরণ থেকে, পৌরভবন থেকে যে কোনও মুহূর্তে আমি মহাপ্লাবন পাঠাতে পারি। এর জন্যে চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত বৃষ্টির প্রয়োজন হবে না। ঘণ্টাখানেকই যথেষ্ট। ওই খাটে তুমি উঠবে,

তোমার বউ উঠবে, তোমার ছেলে উঠবে, ছেলের বউ উঠবে, নাতি উঠবে, পুতি উঠবে।

সেই অর্ডারেই সব উঠল, বাড়তি উঠল একটি তোলা উনুন, কেরোসিন স্টোভ, ঘুঁটে, কাঠ, কয়লা, শিল-নোড়া, চায়ের কেটলি, পানের ডাবর জর্দার কৌটো, বাতের তেল ইত্যাদি, টিয়াপাখির খাঁচা, স্ত্রীর আদরের হুলো 'বুড়ো'। সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম—দরজার ওপরে বসবাস কি ভীষণ থ্রিলিং! সিলিংটা কত কাছে! ছেলেবেলায় কল্পনা করতুম—আমার যদি টিকটিকির মত ক্ষমতা থাকতো তাহলে একবার ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতুম—কেমন লাগে! সে অভিজ্ঞতা হল। আড়মোড়া ভাঙতে গেলেই ছাদে হাত ঠেকে যাচ্ছে। লাগাবার পর থেকে পাখার ব্লেড সাফ করা হয়নি। সাহস করে চেয়ারের ওপর টুল পেতে কে উঠে দাঁড়াবে! মাথা ঘুরে পড়ে গেলে—কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র। পাখা! এইবার তোমাকে বাগে পেয়েছি ভায়া। বন্যা আমার স্ট্যাটাস বাড়িয়ে তোমার কাছাকাছি এনে ফেলেছে। দাড়িকামাবার বুরুশ দিয়ে ঝটাঝট করে পাখার ব্লেডটা সাফ করে দেখিয়ে দিলুম—আমি কত কাজের লোক।

সেই দিনই বুঝেছিলাম তুলোর বালিশের চেয়ে রবার ফোমের বালিশ কত উপকারী। গৃহিণীর তাকিয়াটি গড়িয়ে নোয়ার আর্ক থেকে জলে পড়ল আর ডুবলো। সাবধান করে দিলুম—মানু সাবধান, জলে পা ডুবিয়ে খলবল করার মজা বুঝবে, একবার যদি 'সিলিপ' কর ঢ্যাপোস তাকিয়াটার মত অবস্থা হবে। কে কার কথা শোনে! ওরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ। একপাশে পুত্রবধূ অন্যপাশে



তরী করে টলোমলো/পাশরাতে ওঠে জল

শ্বশ্রু মাতা—মাঝে আমরা, তোলা উনুনটি জাপটে ধরে, মাথায় চায়ের সসপ্যানটি চাপিয়ে কোলে জনতা স্টোভটিকে রেখে কোনোরকমে বসে আছি। সকালে চা না হলে মরে যাবো ভাই। মুখে পান-জর্দা ঠুসে আমার আঙুরবালা শেষ রাতে ধরা গলায় গান ধরলেন—তরি করে টলমল পাশরাতে ওঠে জল। গান শুনে খেপে গিয়ে বুড়ো মারল জলে ঝাঁপ। আর তখনই আমার ফোমের মাথার বালিশ জলে নামল রেসকিউ অপারেশানে।

শুনুন, শুনুন ওসব গাল-গপ্প অন্য জায়গায় করবেন। আমার প্রশ্ন হল—(এক) বন্যা কাকে বলে, (দুই) বন্যা হয়েছিল কি না, (তিন) কোথায় হয়েছিল।

এ কি রে বাবা! অবাক করলেন মশাই, আমার সেই 'খাটার্কে' সপরিবারে বসে বসে আমার কর্কশ কণ্ঠ ট্র্যানজিস্টারে অনবরত শুনেছি—বিশ ফুট জল, তিরিশ ফুট জল -শান্তিপুর হাবুডুবু, নদে ভেসে যায়। জেলা-ফেলা জানিনে মশাই, এটুকু বলতে পারি—লবণ হ্রদের ধার ঘেঁষে আমাদের এলাকাতে, আমার নিজের বেড রুমে যে জল উঠেছিল তার উল্টো মাপ .

উল্টো মাপটা কি জিনিস?

নিচে থেকে ওপরে নয়, ওপর থেকে নিচে অর্থাৎ চিত হয়ে শুলে সিলিং থেকে আমার নাভির দূরত্ব ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট। আমার প্রশ্ন এ জল কাঁহাসে আয়া ক্যায়সে আয়া!

জানি না।

আমরাও জানতুম না, পরে জেনেছি—উঁচু তলার জল নিচু তলায় এসে জমে।

এ আর নতুন কথা কি! উঁচুর জল নিচেই তো নামবে!

সে উঁচু নয় মশাই। আপার স্ট্যাটাসের জল লোয়ার স্ট্যাটাসের দিকে পাম্পের সাহায্যে চালান করা হয়। এপাশের মাল ওপাশে। এখন হল কি...আমার স্টোরি এখনও শেষ হয়নি। আমরা অন্ধকারে অন্ধকারেই সপরিবারে ওপর দিকে উঠছিলুম—লোড শেডিং চলছিল। সুইচ, মেন কিছুই অফ করা হয়নি, করা সম্ভব হয়নি। হঠাৎ ভোরের দিকে ফনফন করে পাখা ঘুরতে আরম্ভ করল। ভাগ্যিস দুয়ে ছিল। ব্লেডটাকে জাপটে ধরলুম। কতক্ষণ ধরে থাকবো, থেকে থেকে ঝটকা মারছে। শেষে একটা খুন্তি দিয়ে কোনরকমে ব্লেড তিনটে খুলে ফেললুম—হাণ্ডাটা নাকের ডগায় ঘ্যাঁচোর ঘ্যাঁচোর করে দ্বিতীয় লোড শেডিং তক ঘুরতেই থাকল। অতল জলে টেলিফোনটা শেষবারের মত একবার বেজে উঠেই সেই যে নীরব হল আর সরব হবে বলে মনে হচ্ছে না। এরে কয় ম্যান-মেইড বইন্যা।

ম্যান আর গডে তফাত কতটুকু? ম্যান তো গডের হাতের যন্ত্র মাত্র। ম্যান প্রোপোজ করে গড ডিসপোজ করেন।

আমারও যে কিছু বলার ছিল।

আপনি কে?

আমি লোক্যাল পুজো কমিটির সেক্রেটারী।

দাঁড়ান, ইনি তো সবে সপরিবারে ওপর দিকে উঠেই চলেছেন, নামবার কোন লক্ষণ দেখছি না। এইবার ঝটপট ছোটো করে সেরে দিন।

ছোটো করে কেন? ওই কুণ্ডুর কথা শুনতে হবে বলে। ওদের ব্যবসার ক্যাপিটেল কি জানেন—মানুষের বিপদ। ব্যাটা বাজার থেকে তরি তরিকারি, চাল-ডাল, ওষুধ পত্তর সব উধাও করে দিয়েছে। আলু নিয়ে প্রথম দিন থেকেই খুব খেল খেলতে গিয়েছিল—শেষকালে হালে পানি না পেয়ে সব আলু সুড়সুড়

করে বের করে দিয়েছে—ব্যাটা আলুবাজ ছোকরা এখন চালবাজি করতে এসেছো।

অ্যাই মথুরেশ কাকে কি বলছ, আমি তো হার্ডওয়্যারের বিজনেস কার, আমার আবার আলু এল কোত্থেকে?

ওই হল, ব্যবসাদার, ব্যবসাদার। সব এক জাতের, আলু, পটল সব বাইরের ভেদ, ভেতরে সবার সমান রাঙা।

আমার রেন-কোটটা কেন ফেরত দিচ্ছ না বল ত?

তোমার রেন-কোটে ভাই আটটা একস্ট্রা ফুটো হয়েছে।

সে কি?

হবেই তো ভাই, তোমার বোঝা উচিত ছিল মা আমাদের দশভুজা। আরে ভাই সে কি প্রবলেম, মাকে বর্ষাতি পরানোর যে কি ঝামেলা! দশটা হাত এ বাজারে চলে? এক একটা এক এক কায়দায় উঁচু হয়ে আছে। শেষে আমাদের পঞ্চুদার ছেলেকে ডাকতে হল। বড় সার্জেন। মার হাত তো আর অ্যামপুট করা যায় না, তাই তোমার রেন-কোটটায় কায়দা করে একসট্রা হোল বানাতে হল। তারপর জেন্টস লেডিজ যে কটা ছাতা পাওয়া গেল সব ছেলেমেয়েদের মাথায় ফিট করে দিলুম। তাও একটু বেকায়দা হয়ে গেল। অসুর বেচারা পায়ের তলায় পড়ে গলে থসথসে হয়ে গেল। মার হাতে মাব খাবে কি, যুদ্ধ করার ক্ষমতাই নেই, দাঁড়াতেই পারে না, পায়ের দিকটা গলে গিয়ে নিউকাট-ফিউকাট ভেসে বেরিয়ে গেল। শেষে লাস্ট মোমেণ্টে ডুপ্লিকেট অসুর ফিট করতে হল, সে শালা আবার, সরি, তিনি মাপে মেলেন না, পোজে মেলে না। মার হাতের বর্শা যেদিক দিয়েই ফিট কর তার ধারে কাছে পেঁছয় না। সেই ডিফেকটিভ, বেয়াড়া মহিষাসুর নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি প্রবলেম! সবাই বললে—ইনি হলেন গিয়ে পলিটিক্যাল অসুর, অবধ্য, যত অপরাধই করুক হাইকম্যাণ্ডের ফোনে থানা থেকে কোর্ট থেকে বুক ফুলিয়ে. হাসি মুখে বেরিয়ে আসে। অনেক কষ্টে মার হাতের বর্শার ফলাটা সমকোণে বেঁকিয়ে অসুরের কাঁধে টাচ করিয়ে দেওয়া হল। গণেশ বললে—দাদা হল বটে তবে মাইনর ইনজুরি—এতে মানুষই মরবে না অসুর তো কোন ছার। আমার ছেলেটা কিন্তু ঠিক বুঝেছে—বললে, বাবা মা দুগ্‌গা আগে অসুরটার বুকে ক্যাঁচা মেরেছিল তারপর সেখান থেকে তুলে মেরে দিয়েছে কাঁধে। সিংহটাকে তো কোনোরকমে তোয়ালে-টোয়ালে জড়িয়ে ম্যানেজ করা হল। গণেশের শুঁড়টাকে বাঁচানো গেল না। আরে ধ্যুর, ওভাবে শুঁড় উঁচিয়ে থাকলে ছাতায় আটকায়। আমি শম্ভু পালকে বলেছি এবার থেকে গণেশের শুঁড়, সিংহের ন্যাজ সব ফোল্ডিং করবে। ওঃ পুজোটা যে কোনরকমে সামলাতে পেরেছি মার কৃপা।

আরে গণেশ আর অসুর নিয়ে অত ভাবতে গেলে কেন? তোমরা দু ভাই তো ছিলে। তুমি অসুর, তোমার ছোটটি গণেশ। দুজনেরই তো বড়বাজারে আনাগোনা আছে। পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেই পারতে। আমারটা এখনও কিন্তু শেষ হয়নি। সেই খাটে...

কোন খাটে?

আরে যে খাটে আমরা সপরিবারে ভাসছিলুম, সেই খাটে রাত ভোর না হতেই শাশুড়ী বউতে হাতাহাতি হয়ে গেল। আরে ভাই, বন্যার সময় শুনেছি সাপে মানুষে পাশাপাশি একই গাছের ডালে বন্ধুর মত থাকে, থাকে না কেবল শাশুড়ী আর পুত্রবধূ। একটা পান সাজো তো বউমা। সকালেই হুকুম হল,

মুখটা কিরকম ফ্যাক ফ্যাক করছে। বউমা ডাবরটি কোলে নিয়ে সবে শুরু করেছে, গৃহিণী আমার ওই চেহারা নিয়ে পাশে একটু আড় হলেন, নৌকো ভীষণ দুলে উঠল, ডাবরটি সিলিপ করে সোজা জলে—নাতি সঙ্গে সঙ্গে গান ধরেছে—সাধের পান রে। বাস্, মিউটিনি অন দি বাউনটি। মুখ নয় তো যেন নেলসনের তোপ। আহা চ্যাঁচাচ্ছো কেন—রিলিফে তোমার পান, জর্দা, দোক্তা সব হেলিকপটর থেকে ফেলবে। থামো—রিলিফে ছাতু দেবে ছাতু। একটা পানের দাম হবে পাঁচ টাকা, সব বরোজ বন্যায় ভেসে গেছে। এই দুজনে চুলোচুলি। ছেলে যখন তার বউয়ের পক্ষ নিল তখন আমাকে নিতে হল আমার বউয়ের পক্ষ। মাথার বালিশ দিয়ে খাটের মাঝখানটায় পার্টিশান তোলা হল। দুটো সংসার দুদিকে দুমুখো। জিনিসপত্তর ভাগাভাগি হয়ে গেল। জনতাটা গেল ও তরফে, তোলাটা রইল এ তরফে।

আর ভাল লাগছে না। এবার দয়া করে শেষ করুন।

কচ্ছি, কচ্ছি। পলিটিক্যাল চিঁড়ের কথাটা বলি। উনুন তো ধরল না। দেশলাই ভিজে গ্যাছে। রাঁধবেই বা কি। ঘরে দু-চারটে মাছ অবশ্য ঘাই মারছিল, মশারিটাকে খ্যাপলা জালের মত ফেলে ধরার চেষ্টা করা যেত। ইচ্ছে হল না। ধ্যাত্তোর, সংসারটা এক নৌকোতে ভেসে থেকেই দু খন্ড হয়ে গেল। হ্যাঁ মশাই নোয়ারও কি এই রকম হয়েছিল?

জানি না, আমরা আর মেকী বন্যার কথা শুনবো না।

একটা কথা, ওই চিঁড়ে আর গুড় উদ্ধার করতে পারবেন. রিলিফের জন্যে ভেসে ভেসে এল, তারপর ছ'টা পলিটিক্যাল পার্টি ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে—এরা আমাদের সাবজেক্ট, রিলিফ আমরা ডিসট্রিবিউট করব। মারামারি ঝটাপটি। ভেন্টিলেটার দিয়ে মুখ বের করে বললুম—বাবা গ্রামারে ভুল করিসনি, আমরা সব অবজেক্ট। ওই জন্যে বলে বিদ্যালয়ে গ্রামারটি একটু ভাল করে পড় হে তা না হলে কনস্ট্রাকসান বড় ভুল হয়। তা সে চিঁড়ে বোধ হয় এত দিনে সীতাভোগ হয়ে গ্যাছে।

চিঁড়ে? আমি বলে আজ সাত রাত্তির দুর্ভাবনায় ঘুমোতে পারছি না। বিলিতি কম্বলগুলো যে কোন পার্টিতে গিয়ে ঢুকেছে! আমার বৃদ্ধ শ্বশুর মশাই নবদ্বীপে বাড়ির ছাতে সেই যে উঠে বসে আছেন কিছুতেই নামতে চাইছেন না, বলছেন বন্যা সম্পর্কে সরকারী বিবরণ আর বেসরকারী বিবরণ না মেলা পর্যন্ত নামছি না, শুধু জীবনে একটাই আমার ইচ্ছে ছিল—এতবার বন্যা হল, একটা বিলিতি কম্বলের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারলুম না।

আমিও যাই। ছেলেমেয়েদের একটা ডোবার ধারে বসিয়ে এসেছি, আমাকেও বসতে হবে কয়েক দিন। কষ্ট না করলে কেষ্ট কি মেলে রে ভাই!

মানে!

মানে সরকারী বাড়ি তো একটা চাইরে বাপু। বন্যায় সব ভেসেটেসে গেল এইবার বাড়িঘর তৈরি করে দেবেন তাই একটু লড়ে যাই।

পার্কসার্কাসের বাড়ি ভেসে গেছে?

তাই তো ঘাঁটালে ডোবার ধারে কয়েক দিন গেড়ে বসতে হচ্ছে। কাশীধামে কাক মরেছে বৃন্দাবনে হাহাকার। আহা বল ভাই কাশীধামে কাক মরেছে...

শীত

শীত এসেছে, লেংচে লেংচে। নববধূর ব্রীড়া নিয়ে! এসেও আসে না। এলেও বসে না। কলকাতার সমস্যা-সংকুল জীবনে এ যেন আর এক সমস্যা। শীত কেন আসছে না! কলকাতার আশেপাশে তাঁবু ফেলেছে। তাকে দেখা গেছে বীরভূমের ফাঁকা মাঠে। ভোরে তার আঁচল উড়েছে নবদ্বীপে। আমরা শুনতে পাচ্ছি তার জিপসী ক্যাম্পে কুকুর ডাকছে মধ্যরাতে। সে কেন শহরে আসছে না?

পরশু আম্বালা থেকে আমার শ্যালক এসেছে। বেএএশ শীত পড়েছে। উলেন গেঞ্জি, তার ওপর মোটা জামা, তার ওপর লুধিয়ানার ফুলহাতা গলাবন্ধ সোয়েটার, তার ওপর কোট, মাথায় হনুমান টুপি, উরেববাপ, তাও ঠকঠক ঠকঠক, ঠ্যাকঠ্যাক। জলে হাত দিচ্ছি হাত কেটে নিচ্ছে। বিছানায় পাশ ফিরলেই ছ্যাড়াক করে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। গেলাসে একটু ওই ঢেলে নিয়ে ট্যাপের তলায় গেলাসটা ধরলুম, টপাটপ, টপাটপ, গোটা কতক ন্যাপথালিনের বল বেরিয়ে এল। বিশ্বাস করবে না, আইস। জল জমে আইস।

শোন, শোন বিষ্টু। তোমার শ্যালক এসেছেন আম্বালা থেকে, তুমি আসনি। বয়েসটা তোমার সত্যিই বেড়েছে। আম্বালার শীত ছাড়ো। এই কলকাতায়, ইন দিস ভেরি সিটি, আমার ছেলেবেলায় যা শীত দেখেছি না, তুমি ইম্যাজিন করতে পারবে না। ভোর! আহা বিউটি! চারদিক যেন তালশাঁসের মত সাদা। সেই সাদা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে হিমালয়ের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। হাওয়া কোনদিন চোখে দেখেছো? কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যখন হাওয়া চলে যায় তখন দেখা যায়। গুঁড়ো গুঁড়ো অতি মিহি অভ্রের কণার মত শিশিরের রেণু ঠেলে ঠেলে হাওয়া চলেছে। কত কি যে তোমার দেখা হল না। ভোরের হিম লাগালে তোমার তো আবার হাঁপানি হয়।

তারপর পুব দিকে ছোট্ট চাঁদের মত সূর্য উঠত। যেন উঠতেই পারছে না। তুমি জান কি চাঁদের চেয়ে সূর্য ছোট। সেই সূর্য তখন কুয়াশার কাপে লাল গুলতে আরম্ভ করত। কতরকমের রঙ। প্রথমে আমার বউয়ের গালের গোলাপীলাল।

হচ্ছে প্রকৃতির কথা সেখানে একটা বিচ্ছিরি মহিলা কেন আমদানি করছ? উপমা কালিদাসস্য। ওটা তোমার সাবজেক্ট নয়। বলতে হয় বল আমার বউয়ের যৌবনের গালের মত গোলাপী। তোমার বউ তো রক্ষেকালীর বাচ্চা।

মুখ সামলে! এখনও সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে আমার বউ বিউটি কনটেস্টে দাঁড়াতে পারে।

তা পারে, তবে সেই কনটেস্টে যদি আমার বউ যায় তোমার বউকে প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিতে হবে।

তোমরা তা হলে বউ নিয়ে সাতসকালে মারদাঙ্গা কর। আমি ততক্ষণে সকালটা শেষ করি। মাটি আর আকাশের মাঝখানে সূর্যের নির্যাস ক্রমশ ঘন হচ্ছে। যেন এক গেলাস লাইম-কর্ডিয়েলে একটু একটু করে ফরাসী রেড ওয়াইন ঢালা হচ্ছে। সেই অস্বচ্ছ কাঁচ-ঘষা সকালে আমার গ্র্যান্ডফাদারের বিশাল বাগানে সারা গায়ে কাশ্মীরী শাল মুড়ে হিম খাচ্ছি। তখন আমাদের কত কি খেতে

হত—কালমেঘ চিরতা কাঁচা হলুদ হিম শিল বেত জুতো দুপুরের রোদ সন্ধ্যের হাওয়া। তবেই না আজ আমি আয়রন ম্যান। গেজেটেড অফিসার।

ওই তোমার দোষ। যখনই সুযোগ পাও একবার করে জানান দাও তুমি একটি গেজে। সেদিন তুমি বাজারে সামান্য একটা মাছঅলাকেও কায়দা করে জানিয়ে দিলে—দাও হে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি পেটির দিকটা দিয়ে ছেড়ে দাও, গেজেটেড অফিসারদের বড় দায়িত্ব হে, সবার আগে অফিস গিয়ে সবার শেষে বেরোতে হয়। আমাদের না হলে মন্ত্রীদের চলে না, মন্ত্রীরা না চালালে দেশ চলে না। অবশ্য সেদিন তোমার খুব শিক্ষা হল—পেটিটা ওজন করে ব্যাঙ্কে কাজ করে ওই নতুন ছোকরাটির ঝুলিতে ফেলে দিল, চায়ের গেলাসটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে বেশ আয়েস করে চুমুকে চুমুকে খেতে লাগল, তোমার গেজেটেড কথা তার কান ঢুকলই না। মাঝখান থেকে এক বৃদ্ধ বেশ মোলায়েম করে তোমাকে দুরমুশ করে দিলেন—অফিস তো যাবেন বেলা বারোটায়। কাজের মধ্যে তো পাকা ঘুঁটি কাঁচা করা। সব কাজে বাগড়া দেওয়া। কার পেনশান আটকে দেওয়া, বিধবার ফ্যামিলি পেনশান কি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা আটকে দেওয়া, জুনিয়ারকে সিনিয়ার-এর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়া, ম্যানিপুলেট করে নিজের প্রোমোশান ম্যানেজ করা। আপনাদের দেশ তো আপনি নিজে। নিজেরটা হলেই হয়ে গেল। কোথায় গেল আপনার মৎস্যমন্ত্রীর মাছ! কোথায় গেল সরকারী মাছের স্টল? ওঃ, তোমার তখন কি করুণ অবস্থা! বৃদ্ধ মানুষ, কিছু বলতেও পারছ না। শেষে পালিয়ে বাঁচলে।

কে কি বলেছিল তোমার দেখি সব মনে আছে, একেবারে টেপ-রেকর্ড। না, এভাবে বন্ধুত্ব হয় না। রইল তোমার সকাল। আমি চললুম।

যাও ভাই, তাই যাও। গৃহং গত্বা ইস্ত্রীকে হেঁসেলের কাজে সাহায্য কর। শহরে বন্ধুত্ব মৃত। ওসব এখানে হয় না। সামনাসামনি দেখা হলে ওই একটু দেঁতো হাসি—বড় জোর পরচর্চা। হৃদয়টা মরে গেছে ভাই, থ্রম্বোসিসে আর কি মরবো! আমরা মরেই রয়েছি। সময় কোথা! নিজের কেরিয়ার, ছেলে মেয়ের কেরিয়ার, প্রপার্টি ফিউচার—চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত, শুধু নিজের চারপাশেই ঘুরঘুর।

আমি বুঝেছি।

তুমি আবার কি বুঝলে? তোমরা তো এতক্ষণ বউ নিয়েই মশগুল ছিলে। যিনি রেগে-মেগে চলে গেলেন তিনি তো কাশ্মীরী শাল পরে গ্র্যাণ্ডফাদারের বাগানে এতক্ষণ বেড়াচ্ছিলেন ও আর বুঝবে কি, বোঝার আছেটাই বা কি! ঢক্কা নিনাদ।

না, না, তুমি যত পার গাল দাও কেবল সংস্কৃত বল না। ছাত্রজীবন মনে পড়ে গেলেই শীত করে। আসলে শীত কেন আসতে এত দ্বিধা করে জান? আমাদের সময় নেই বলে। শীত আর প্রেম দুটোই একটু সময় চায়, সোহাগ চায়। শীতের সঙ্গে খেলতে হয়, শীতকে খেলাতে হয়। বেশ একটা নরম বিছানা চাই, যেন কাবলী বেড়ালের লোম। ফ্লানেলের চাদর বিছোতে পারলে ভাল হয়। দুপাশে দুটি পাশবালিশ। মাথার বালিশটা হবে দীর্ঘ, স্নেহপ্রবণ! তোমার মাথাটা সেই বালিশে ডুবে থাকবে। খড়কে কাঠি নিয়ে দু কোণে দু ফোঁটা আতর মাখিয়ে রাখতে পার—ফিরদৌস কিংবা স্যাণ্ডাল। এরপর অঞ্চল বুঝে কালচারের লেভেল অনুসারে গায়ে দেবার ব্যবস্থা। কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে

এইসব বস্তু অচল—যেমন চুলে তেল, গামছা, লেপ। লেপের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বাঁদিপোতার খোলে হালকা শিমুল তুলো ভরে বেশ একটা ফুলেল ওয়ার লাগিয়ে তার তলায় সারারাত হামা দিতে কি ভালই যে লাগে। খাটটা বেশ ঝকঝকে হবে, ঘরটা বেশ খটখটে হবে। মাথার দিকের টেবিলে বেশ স্লিম একটা ফুলদানিতে হালকা ধরনের কিছু ফুল রাখতে পার। শীত ভীষণ ফুল ভালবাসে। খাও আর না খাও একটি কমলালেবু এবং একটি টোম্যাটো শীত-স্বাস্থ্যের প্রতিনিধি হিসেবে চোখের সামনে রেখ।

ভোরে চোখ খুলে প্রভাতকে একবার অবলোকন কর। লেপের তলায় মাছের মত শরীরটাকে বার কতক খেলিয়ে নাও। শৈশবকে স্মরণ কর, যেন তুমি প্রিনস অফ ওয়েলস, জুনিয়ার। জীবিকার জন্যে ঘোঁত ঘোঁত করে ছুটতে হবে না, টাকার চিন্তায় চিঁতিয়ে পড়তে হবে না। চারটে স্কোয়্যার মিল পিতার হোটেলে বাঁধা। কারুর হুকুমের তুমি চাকর নও! মনটাকে ওইরকম নিশ্চিন্ততায় নিয়ে গিয়ে শুনতে থাক কাক ডাকছে খ্যা খ্যা, দু-চারটে শালিক কিচির কিচির করছে। একটা ময়লা ফেলা টিনের ঠ্যালা গাড়ি ঢ্যান ঢ্যান শব্দ করতে করতে চলেছে। চোখে ঘুম, শরীরে শীতের আমেজ, মনে সুখের গড়ের মাঠ। পারিবারিক শব্দটব্দ কিছু কানে আসছে। চায়ের কাপ ডিশ, চামচে কেটলির শব্দ। কোথাও জল পড়ছে সরু ধারায়। সেই শব্দটাও কানে আসছে। ঘরের ওপরের দিকে অন্ধকার ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। এঘর থেকে ওঘরে যাবার দরজার পর্দার তলায় অন্ধকার যেন শীতে কাঁপছে। খাটের তলায় স্লিপারটা হিমশীতল। তুমি দেখছ, শুনছ, কোন তাড়া নেই।

এমন সময় চায়ের বিজ্ঞাপনে দেখা মেয়েটির মত একটি সুন্দর মুখ ফ্যাশান প্যারেডের মডেলের মত হাসিহাসি মুখে এককাপ চা হাতে তোমার বিছানার



প্রেম যাচাই হবে প্রৌঢ়ত্বের কষ্টিপাথরে

পাশে এসে বড় সুরেলা গলায় বলবে—রাই জাগো রাই জাগো নয়, চা এনেছি, চা এনেছি। এই মহিলা তোমার পুত্রবধূ হতে পারেন, তোমার দ্বিতীয়পক্ষ হতে পারেন, তোমার বেশী বয়েসের প্রথমপক্ষও হতে পারেন। বরাত ভাল হলে ব্যাচেলারের সুন্দরী পরিচারিকাও হতে পারেন।

আধশোয়া হয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তোমার চোখ তখন ঝকঝকে মেঝের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এঘর থেকে ওঘর হয়ে সে ঘরে, নানাবিধ ছড়ান এটা-ওটা স্পর্শ করতে করতে, বাথরুমের সামনে পাতা পাপোশে গিয়ে হোঁচট খাবে। তুমি কখন দেখছ সাদা ধবধবে রেফ্রিজারেটারের নিম্নাঙ্গ, খাটের চকচকে পায়া, সুদৃশ্য চাদরের কোণ, কার্ডিগানের কাজ করা হাতা, জুতোর র‍্যাকের পাশে অসাবধানে উল্টে থাকা এক জোড়া হাইহীল জুতো। চায়ের ফ্লেভারে, বিছানার গরমে, চারপাশের প্রাচুর্যে শীত তোমার কাছে সবে স্নান করে ওঠা প্রেমিকার আলিঙ্গনের মত মনে হবে।

এইবার তুমি বিছানা থেকে নেমে পড়ে বিলিতী কায়দায় শরীরটাকে সামনে পেছনে, পাশে পর্যায়ক্রমে বাঁকাতে থাকবে, ইতিমধ্যে বাইরেটা বেশ রোদ ঝলমলে হয়ে উঠেছে, এক চুমুক গড়িয়ে পড়েছে ঘরে। তুমি বয়স্ক মানুষ। তোমার ধারণা বেশীক্ষণ গেঞ্জি গায়ে খোলা জানালার ধারে দেয়ালা করলে ব্রংকাইটিশ হবে। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের পেছন থেকে তোমার উলিকট গেঞ্জিটি তুলে নিয়ে গায়ে দিতে গিয়ে পিঠের দিকের তুলোর জমিতে গোটাকতক রুপালী চুল আটকে আছে দেখে একটু উদাস হয়ে ভাববে—আর একটা শীত এল, চলেও যাবে, স্লো সাইকেল রেস টু ডেথ। গতবার যে পাখি শীতের ডালে বসে গান গেয়েছিল সে কি এবারেও গাইবে! হঠাৎ তুমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবে। তোমার চোখে পড়বে একটা বিশাল শিশুগাছ। সমস্ত পাতা তার সময়ের অভিজ্ঞতায় কালচে সবুজ। গুঁড়িটা তোমার পোড়খাওয়া কপালের মত ভাঁজ ভাঁজ, ফাটা ফাটা। তুমি অস্ফুটে বলবে, অনেকদিন দেখছি, আরও কিছুকাল দেখব, তারপর হয়তো কোনও পাতাঝরা সকালে তোমারই তলা দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাব স্মৃতিটুকু ফেলে রেখে। আর তখনই তোমার কানে আসবে একদল শিশুর উল্লাসের চিৎকার। নীল প্যাণ্ট আর সাদা জামা পরে ফুটফুটে ছেলের দল স্কুলে চলেছে। ফোলা ফোলা মুখ, ঝকঝকে চোখ। সময়ের ঝাড়ু মুখের ওপর কোনও চিহ্ন আঁকতে পারেনি। জীবনের গাছ পৃথিবীর নবীন বাতাসে সবে সজীব পাতা মেলেছে। তুমি তখন মনে মনে একটি হিসেব করে নেবে, শুরু থেকে শেষ, সময়ের পথের দৈর্ঘ্য কত বছর? বড় জোর ষাট, কিংবা সত্তর। এর মধ্যে সেই সুন্দর নদীর উপমা—প্রথম চল-চঞ্চল পাহাড়ী ঝরনা, তারপর তরতরে স্রোত, তারপর ধীরে ধীরে বিশালের কোলে হারিয়ে যাওয়া। তারপরই তোমার চোখে পড়বে উত্তুরে হাওয়ায় উড়ছে ঝরাপাতা। বছরে বছরে গাছের পাতা ঝরে আবার নবীন পাতার দল হেসে ওঠে ; কিন্তু জীবন থেকে সময়ের পাতা শুধু ঝরতেই থাকে, পায়ের তলায় জমে ওঠে অভিজ্ঞতার স্তূপ।

এইবার বাথরুমের পাপোশে দাঁড়িয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা করবে—না, আর দ্বিধা নয়, আর যে কটা আছে যেমন করেই হোক সব কটাকে তুলে ফেলতে হবে। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। একটু গরম জল। এই সময়েই তোমার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা। সংসাররূপ কৃষিক্ষেত্রে তুমি কেমন বীজ ছড়িয়েছ এইবার বোঝা যাবে। শীতে বুড়োরা একটু তোয়াজ চায়, সেবা চায়। যৌবনের কর্মফল তোমাকে

লোটা ভরে নিতে হবে। তোমার বধূ কিংবা স্নেহের পুত্রবধূ যদি এক কেটলি গরম জল নিয়ে তৎক্ষণাৎ সামনে এসে দাঁড়ান বুঝতে হবে যৌবনে তুমি ছিলে গুড ফার্মার। তোমার গোলাটি এই পৌষে ফসলে ফসলে ভরা। তোমার সময়ের সূর্যটিকে তুমি আলস্যের অপচয় করে তোলনি। গরম জল আর ঠাণ্ডা জলের একটি হিসেবী মিশ্রণে তোমার প্রৌঢ় পানসে দাঁত পিপারমেন্টের মৃদু ঘষায় স্বাস্থ্যসম্মত হতে থাকবে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখতে চাইবে—তোমার গৃহিণী ধূসর বর্ণের একটি খলে একগুলি চ্যবনপ্রাশ বেশ চনচনে মধুসহ স্থূল হাতে ঘষছেন। শরীরটি তাঁর বেশ ঘটের মত, শাড়িটি বেশ বয়সোচিত, বসে থাকাটি বেশ নিষ্ঠামিশ্রিত। এই সময়টিতে তুমি বুঝবে কমরেডশিপের মূল্য। তুমি বুঝবে, যৌবনের প্রেম প্রেমই নয়, প্রেম যাচাই হবে প্রৌঢ়ত্বের কষ্টিপাথরে।

শীত হল সফল যুবক-যুবতীদের কাল। শীত হল সুখী প্রৌঢ়দের কাল। তোমার পুত্রেরা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তোমাকে যদি উপেক্ষা করার শিক্ষা না পেয়ে থাকে তাহলে তুমি সংসারের আমব্রেলা। ছেলেরা তোমার শরীর, স্বাস্থ্য এবং মেজাজ সম্পর্কে সজাগ। তাদের তুমি প্রায়ই বলতে শুনেছ—এই শীতটাতে বাবাকে একটু সাবধানে রাখতে হবে। ব্রংকাইটিশটা আবার পেয়ে না বসে। যদ্দিন আছেন, ওহে তোমরা কি বুঝবে বল, আধুনিক কালের বউ, আমরা সব ছাতার তলায় আছি।

এই ধরনের ছাতা সদৃশ, সুখী প্রৌঢ়দের জন্যে শীতের বাজার—ইটস অ্যা প্লেজার। সঙ্গে চলেছে গাঁট্টাগোঁট্টা বেলদার একটি চাকর। হাতে তার নানা মাপের ব্যাগ। আহা টাটকা ফুলকপিটি পাতার মধ্যে থেকে তাকিয়ে আছে যেন শিশিরভেজা মুখ। পালমশাকের পাতা যেন যুবতীর মসৃণ ঢলঢলে ত্বক। বেগুন, কী রূপসী যেন এলোকেশী। মনে হয় পাশে শুইয়ে রেখে গায়ে হাত বুলোই। মাছের বাজার জমজমাট। গা দেখলে মনে হয় সবে অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট লাগান হয়েছে।

তোমার লেপ এবং তোমাকে, দুটি বস্তুকেই রোজ ছাদে তুলতে হবে। লেপ খাবে শুধু রোদ। আর তুমি খাবে তেল আর রোদ। এখন এই দুটি শীতের 'মাস্ট' কে করবে! একটু ডেলিকেট কেয়ারই তুমি আশা করবে। রোদের দিকে তোমার পিঠ। এই পিঠে তুমি সংসারের অনেক দায়িত্ব বহন করেছ। সেই পিঠে তোমার মা লক্ষ্মীর মত পুত্রবধূ, নরম নরম ঠাণ্ডা হাতে বেশ খাঁটি ঝাঁঝাল সরষের তেল একটু একটু করে, ঘষে ঘষে খাওয়াতে থাকবে। মাঝে মাঝে তার আঁচল খসে তোমার পিঠে ঝাপটা মেরেই যথাস্থানে ফিরে যাবে। তুমি শুনবে চুড়ির শব্দ। মাঝে মাঝে ভিজে এলোচুল ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঝুলে তোমার কাঁধে লাগবে, পিঠে সুড়সুড়ি দেবে। তুমি তখন বকর বকর করে হরেক রকম অসংলগ্ন কথা বলতে থাকবে—নলেন গুড়, টাকীর পাটালি, জিরেনকাটির রস মোয়া পিঠেপুলি কেক হাফ-বয়েলড মুরগীর ডিম, মধু, মকরধ্বজ, ভেজিটেবল স্ট্যু, শিমুলতলা, মধুপুর। পুত্রবধূকে নবজাতক সম্পর্কে উপদেশ দেবে। ত্বকের ওপর আধুনিক কসমেটিকসের প্রভাব সম্পর্কে তোমার জ্ঞান দেবে। পুরোনো আমলের ফর্মুলাটা জানাবে। অনিবার্যভাবেই রবীন্দ্র-নাথের ছেলেবেলা থেকে ঠাকুর পরিবারে রূপচর্চার উল্লেখ করবে।

তেমন পুত্রবধূ আর কি পাওয়া যাবে রে, ভাই!



শীতের কপি, গাজর, মুলো

তাহলে কাজটা বধূকে দিয়েই করিয়ো কারণ শীতে বুড়োদের পিঠে একটু রোদ, শরীরে একটু সর্ষপ তেল খাওয়াবার বিধান শাস্ত্রে আছে।

আরে ভাই পুত্রবধূর পাল্লায় পড়ে নিজের বধূটিও তো বখে গেছে। শীতের সেবা নেই, বায়নাটাই খালি আছে। বোটানিকসে পিকনিকে যাবেন গোলাপী কার্ডিগান গায়ে। ভুতঘাট থেকে স্টিমারে করে সুন্দরবনে পাখির বাসা দেখতে যাবেন। চিড়িয়াখানায় যাবেন, কিমা-কারী, দু-দিস্তে পাউরুটি, এক টুকরি কমলালেবু নিয়ে। পারলে ক্রিকেট খেলাও দেখতে যাবেন। কাল যাচ্ছেন সার্কাসে। আমি যেতে চাইলুম। হুকুম হল—না। তুমি এই বয়েসে সার্কাসের মেয়েদের থাই দেখে আমার পাশে বসে বসে উঃ আঃ করবে তা হবে না। আমি ভীষণ জেলাস হয়ে পড়ি। আমি যাবো বউমাদের নিয়ে। তুমি বাড়িতে থাকবে, নাতিকে নিয়ে। সবে হামা দিতে শিখেছে।

আমি কি করব জান—ব্যাটার কোমরে বাঁধব লম্বা মত একটা শাড়ির পাড়। এ মাথাটা বেঁধে রাখব ইজিচেয়ারের হাতলে। দে হামা, কত দিবি দে, ঘরের বাইরে তো আর যেতে পারছে না। আমি আরামসে চেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে—বিজ্ঞাপন পড়ব। শীত এসেছে কলক্যাতায়, মাঝরাতে মেয়েছেলে নাচবে নামী হোটেলের নাচমহলে—কে সেরা, সেরা।

বসন্ত

বসন্ত এসেছে। টিকে নিতে হবে। অসম্ভব মশা বেড়েছে। ত্যাঁদোড় মশা। দন্দণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে দেয় না। হঠাৎ সেদিন কোকিল ডাকল। সকাল ৬টা বেজে পাঁচ মিনিটে। মাত্র তিনবার ডেকে জানিয়ে দিল, আ গিয়া। বেগম আখতারের সেই রেকর্ডটা আর বাজাতে হল না, 'কোয়েলিয়া গান থামা এবার'। কোকিল জানে আধ বেলার বসন্তের জন্যে তিনটে ডাকই যথেষ্ট।

মিহি আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি। ঘন কালো পাড় মিহি ধুতি। পায়ে ঝকঝকে কালো হাল্কা নিউকাট। দখিনের হাওয়ায় উড়ু উড়ু চুল। বসন্তের বাবু। কানের লতিতে অল্প একটু আতর। খাঁ সাহেব কাফী ঠুমরি ধরবেন সন্ধ্যের মুখে, হোলি খেলত নন্দকুমার। অতীত। এখন নিতান্তই অচল।

আদ্দির পাঞ্জাবির জন্যে শরীর চাই। ছাতি, আটচল্লিশ ইঞ্চি। কণ্ঠা দুটোকে হাতুড়ি মেরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ট্রাইসেপ, বাইসেপ ঠেলে তুলতে হবে। থাই আর কাফ দুটোকে বেশ মানানসই করতে হবে। তা না হলে ছিঁচকে চোরের বিবাহ বেশের মত দেখতে হবে।

অবশ্যই নিজের একটা গাড়ি থাকা চাই। তা না হলে ওই পোশাকে সাধারণ যানবাহনে চলাচল করলে স্ত্রী বেচারা অকালে বিধবা হবে। বসন্ত এসেছে বলে শহরের জনসংখ্যা তো আর কমবে না। তার জন্যে চাই মহামারী বসন্ত। অবশ্য মশকবাহিনী খুবই তৎপর। ম্যালেরিয়া এনেছে, এনকেফেলাইটিস এনেছে। আমাদেরই ফেলে রাখা আবর্জনায় সতেজ তরুণ মাছিরা আঁতুড় ঘর তৈরি করেছে। এদের অবদান হবে কলেরা, টাইফয়েড। তবু, তবু, মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি। আমরা হেলায়, জীবন ভেলায় ভেসে চলি কলকল্লিয়ে।

বাসে, ট্রামে আমরা বিকচ্ছ হবই। কোঁচা নিয়ে সহশত্রুর সঙ্গে কাজিয়া হবেই। তবে প্যাণ্ট পরেই বসন্ত হোক। প্যাণ্ট পরে কীর্তনিয়া যদি গলায় গাঁদার মালা পরে আসরে দাঁড়িয়ে সখি গো, সখি গো করতে পারে, আমরাও পারব গুন গুন করতে, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

উইদিন এ কাপল অফ ডেজ, সেই বাঁশ দেনেঅলা নরওয়েস্টার ইজ কামিং। সন্ধ্যের বিদ্যুৎহীন অন্ধকারে সৃষ্টি ওলটপালট করে, ধুলোর ঝালর উড়িয়ে কেরানী ঠ্যাঙাতে প্রতি বিকেলে মারমার কাটকাট করে তিনি আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে পথ-দুলালীরা আমাদের পথে বসিয়ে হাওয়া হয়ে যাবেন। ট্যাকসি উধাও হবে। প্রথমেই ঠ্যাং তুলে সারি সারি দাঁড়িয়ে যাবে ট্রাম। বিভিন্ন গোত্রের বাসেরা গা ঢাকা দেবে। মিনিরাও সরে পড়বে। থই থই মানুষ ভেঙে-আসা শরীরে পথে দাঁড়িয়ে বিছানার স্বপ্ন দেখবে। হেঁটে ফিরবে তারও উপায় থাকবে না। টিউব হচ্ছে, টিউব। ছোট পাহাড়, বড় পাহাড়, ছোট জলাশয়, বড় জলাশয়। কোথায় লাগে ভিয়েতনামের যুদ্ধ। প্রতিদিনের ক্লেশে আমাদের গোঁফ ঝুলে যাবে, ন্যাজ গুটিয়ে আসবে পায়ের ফাঁকে। ইয়ে কলকাত্তা মেরে জান। রাম প্রত্যাখ্যাত সীতা। পাতাল প্রবেশের আয়োজন সম্পূর্ণ। চেড়ীরা চারপাশে ঘিরে আছে। আমরা সুগ্রীবের দোসর কিছুই করতে পারছি না। সত্যিই যদি লাঙ্গুলটি



ঘন তনু কম্পই ঝম্পই কাম

দৃশ্যমান থাকত, তাহলে নিজেদের সুগ্রীবীর দশ হাত একটি শাড়ি পাটে পাটে জড়িয়ে, কয়েক লিটার কেরোসিনে চপচপে করে, আগুন ধরিয়ে একটা লঙ্কা-কাণ্ডের আয়োজন করা যেত। আমাদের সব থেকেও একটি ন্যাজের অভাবে স্বভাবটা প্রচ্ছন্ন থেকে গেল।

তবুও বসন্ত। এই সময়টায় বড় প্রেম পায়। মনে হয়, বনে বনে আগুন ধরেছে যখন তখন মনে আগুন ধরাবার মত কেউ যদি থাকত পাশে! বন নেই, রক্তিম কিংশুক নেই। এ'দো গলি আছে। খুপরি ঘর আছে। রাধা নেই, কৃষ্ণ নেই। ঘাড়ে ঘাড়ে বাবরী আছে। চাঁদটাকে কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। থালার মত চাঁদ উঠেছে ঝাপসা আকাশে। চালো ছেলের মা, আলসে ভাঙা ছাদে, জলের ট্যাঙ্কের পাশে। মনে করি তোমার বেশ বিয়ে হয়নি আমার মত এক পোড়ার মুখোর সঙ্গে। তুমি আমার প্রেমিকা। নীল শাড়ি পরে চুপি চুপি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো। অদৃশ্য একটি গাছের ডাল একহাতে ধরে আমি গেয়ে উঠি ঃ

নিশি দিষী ভাবি ভবনে ধনি রহই
দারুণ মদন দহনে তনু দহই॥
সুন্দরী আকুল পরাণ।
মরম কি দুখ কোই নাহি জান॥
ঘন তনু কম্পই ঝম্পই কাম।

কিংবা

চান্দনী রাতি চন্দনে ভরা অঙ্গ।
গোপ নাগরী করে বেশ তরঙ্গ॥

এইবার তুমি গাও লক্ষ্মীটি ঃ

মাধব বোললি মধুর বাণী সে সুনি মুদু মোঞে কান।
তঁহি অবসর ঠাম বাম ভেল ধরি ধনু পচবান॥
তনুপসেবে পসাহনি ভাসলি পুলক তইমন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি বহু বলয়া ভাগু॥

আচ্ছা মাধব বলতে তোমার এত লজ্জা কেন! আমার নাম তো মধু গো। শব্দরূপ কর, মধু মধু মাধব। ও, সেই বিয়ের জন্যে শেখা একটা গানই মনে আছে ঃ বাঁধ না তরিখানি। বেশ তাই, তাই সই। চেপে গাও, মাইক ফিটিং গলায় গাও, ক্র্যাক করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই তো, অভ্যাস নেই। চড়ায় গিয়ে গলাটা দোক্তা বাঁড়ুজ্জের মত হয়ে যাচ্ছে। নেভার মাইন্ড। এখন তোমার খোঁপায় এক গুচ্ছ কুন্দ ফুল গুঁজে দি। ফুলের অনেক দাম। প্ল্যাস্টিকের ফুল চালাই। ওমা তোমার অমন খোঁপাটা কোথায় গেল খুকীর মা? কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধন, মান। একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান। কি হল চললে যে! দাঁতের গোড়া কনকন করছে? মরেছে! তোলাতে হবে, বাঁধাতে হবে। খরচের ধাককা! আমারও নাক সুড়সুড় করছে। ইমিউনিটি নষ্ট হয়ে গেছে। ইউনিটি নেই, ইমিউনিটিও নেই। আই গ্রো ওলড, আই গ্রো ওলড, আই শ্যাল ওয়্যার দি বটমস অফ মাই ট্রাউজারস রোলড।

তারক তোমাকে নিয়েই আমাদের মহা সমস্যা। মনে আছে নিশ্চয়, গতবার শিবরাত্রিতে, তোমার মেয়েকে নিয়ে মহা কেচ্ছা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, গতবার একটু অপসংস্কৃতি মত হয়ে গিয়েছিল। এবারে কিন্তু সাবধান। হেসো না। বসন্তে মন বড় উতলা হয়। বয়েসকালে আমাদেরও হত। তখন এতটা সুযোগ ছিল না। তাই কবিতা লিখতুম। না, হাসছি অন্য কারণে। এবারে আমার মেয়ের পেছনে পলিটিক্যাল সাপোর্ট আছে। সেটা আবার কি? এক শিবুদা জুটেছে। গাট্টা গোঁট্টা ঝুমকো ঝামকা, চকরা বকরা। সেই লড়ে যাবে। বুড়ো শিবতলায় নিয়ে যাবে। বেলপাতা যোগাড় করে দেবে। শিবু ফাইনালে খেলবে তো না সেমি-ফাইন্যালেই বসে যাবে! তা জানি না। বুড়ো শিব জানেন।

বন্ধুগণ, এই বিশাল বিপুল যুব শক্তিকে যেমন করেই হোক এনগেজ করে রাখতে হবে। এ হল নদীর স্রোতের মত। বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখতে পারলে, সেচ হবে, চাষ হবে. বিদ্যুৎ হবে, জীবন সুজলাং সুফলাং। বাঁধনহারা বিধ্বংসী যৌবন সমাজের অভিশাপ। যৌবন হল মাদার টিংচার। যত ডাইল্যুট করবেন ধন্বন্তরি, অ্যাজ ইট ইজ পয়েজন। আমাদের জাতীয় জীবনে সরস্বতী পুজোর পর যুবক যুবতীদের এনগেজ করে রাখার মত তেমন কোন জনপ্রিয়, পপুলার গড বা গডেস নেই। আমাদের দাবি, একটা ন্যাশনাল কমিটি করে আরও কিছু দেব-দেবীর প্রচারের ব্যবস্থা হোক। সম্প্রতি সন্তোষী মা বাঙলার ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। তাঁকে এখনও বারোয়ারী লেভেলে নামাতে পারিনি। 'তুমি আছ কি নেই ভগবান', 'ভোলে বাবা পার লাগাও', সংগীত হিসেবে পপ্যুলার হলেও আমাদের বারোয়ারীতে তার কোন কনট্রিবিউশান নেই। তবু হাল ছাড়লে চলবে না। বারোয়ারী শিবরাত্রি চালু হয়েছে। আরও চালু করতে হবে। নেতা, অভিনেতা, সকলেই আমাদের সাহায্য করুন।

তা সাহায্য করলাম। বুঝলেন, এবারের আয়োজন বেশ বড় আয়োজন। দেহাত



মনোপুর হতে আমার হারায়েছে মন

থেকে চারটে ভোজপুরী আনিয়েছি। সংগে এসেছে বিশাল দুটো নিম কাঠের খল। দুর্গাপুজোর উপচারে সিদ্ধির খরচ মাত্র পাঁচ পয়সা, এ ক্ষেত্রে অনেক বেশী। ডন দেখেছেন। অমিতাভ বচ্চনের নাচ দেখেছেন? ঠিক সেই সিন আপনার বাড়ির পাশে চলবে, সারা রাত। রাত আটটার মধ্যে যুবশক্তি শিবশক্তিতে ঢুলুঢুলু হয়ে লটকে পড়বে। ব্যস, অপ-সংস্কৃতি আপনিই কমে যাবে। তবু পঞ্চবটীতে প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছে। বড় বড় মন্দিরে লাঠির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ও তো হয়েই থাকে। মন্দির গাত্রেই তো কামকলার ভাস্কর্য।

তবুও বসন্ত। অতি ক্ষণস্থায়ী। তা হোক। তুঁতে নীল আকাশ। ফ্ল্যাগ তোলার দণ্ডে স্থির চিল। প্রকৃতির জড়তা কাটছে। স্থলচর, সরীসৃপের শীত-ঘুম ভাঙছে। চিনচিনে উত্তাপের ছোঁয়া লাগছে মনে। যে সব বৃদ্ধ এ শীতের চৌকাঠ পেরোতে পারলেন, তাঁদের কোঁচকান চামড়া টান টান হচ্ছে। হাঁপানির শ্বাসনালীতে হাওয়া ঢুকছে। মুখে মৃদু হাসি, এ শীতটাও কাটল, দুঃখ-সুখের আর একটি বছর সামনে প্রসারিত। বড় কষ্ট, তবু জীবনটাকে ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না। মন মরে আসছে, দেহের বড় মায়া ঃ

মনোপুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব নিলে কোন জন।

শৃগাল

পরিবেশ সাপ্লাই করপোরেশান, একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কাজই হবে যখন যেখানে যেমন পরিবেশ প্রয়োজন হবে তৈরি করে দেওয়া। খেতাবধারী একাধিক এনভায়রনমেণ্ট আর্কিটেক্ট এই প্রতিষ্ঠানের মাথা। চেয়ারম্যান কি 'সাম' ব্যানারজি! ব্যানারজি সাহেব বললে তিনি ভারি খুশি হন।

এই প্রতিষ্ঠান এখন কলকাতার পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন। সব কাজই ধাপে ধাপে এগোয়। প্রথমে সার্ভে। তারপর—ব্লু-প্রিণ্ট। তারপর—একজিকিউসান। রোজ সকালে চেয়ারম্যানের ঘরে বৈঠক বসে। বৈঠকের নাম—একসপার্ট মিটিং।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষ হয়েছে। রিপোর্ট বলছে, পড়ছি তা হলে? হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়ুন। পশ্চিমে, গোদাবরী...

গোদাবরী! ব্যানারজি সাহেব বাধা দিলেন, কোন্ শহরের কথা বলছেন মশাই! কলকাতার পশ্চিমে গোদাবরী! আবগারী বিভাগ আপনাকে যে ধরবে মশাই!

অ্যাম সরি স্যার। সাউথ ইণ্ডিয়ান প্রভাব।

করেক্ট করুন, করেক্ট করুন। কাজ কি হবে না হবে পরের কথা। রিপোর্টটাই থাকবে। ড্রেস মেকস এ ম্যান, রিপোর্ট মেকস ইণ্ডিয়া। মাইলের পর মাইল রিপোর্টের দুব্বো দিয়ে ভারতকে মুড়ে দিয়ে...

কয়েক লক্ষ গরু ছেড়ে দাও।

মিঃ সেন, নো রসিকতা। স্বপ্ন দেখতে শিখুন, কল্পনাকে উদ্রিক্ত করতে শিখুন, চার্ন ইওর ইম্যাজিনেসান টু ফার্ন হাইট। বিশেষত আমরা যে ডিস্‌সিপ্লিনে আছি, সেখানে কল্পনাটাই আমাদের ক্যাপিটাল। স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘব বাঁধবো, বাঁধবোও ভালবেসে। ওঃ কতদিনের শোনা গান কিভাবে ফিরে এল মাইরি! সরি, শেষের শব্দটা মুখ ফসকে রিলিজড হয়েছে। একসপাঞ্জ ইট।

পশ্চিমে গঙ্গা, পুবে ধাপা।

ধাপা!

ইয়েস স্যার ধাপা নট ভাপা।

ধাপা বলবেন? আগলি শব্দ!

আছে যখন বাদ দি কি করে, আইডেন্টিফিকেসান মার্ক!

থাক তা হলে।

পুবে ধাপা। দক্ষিণে, দক্ষিণ কলকাতা, উত্তরে, উত্তর কলকাতা।

বাঃ বা। বেশ হয়েছে। নাইস। জিনিয়াস।

অনেক মাথা খাটিয়ে বের করতে হল স্যার। তিন-চার রকমের কলকাতা আছে স্যার। সি এম ডি এ-র এক রকম, সি ই এস সি-র এক রকম, করপোরেশানের

এক রকম, পুলিশের আর এক রকম। কে অত ঝামেলার মধ্যে যায়!

বেশ করেছেন, কলকাতা কি, তা সবাই জানে, কোথায়, তাও জানে। পড়ে যান।

পশ্চিমের গঙ্গা প্রায় বুজে এসেছে। খোঁচা-খুঁচি করেও বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। ফারাক্কা ফেঁসে গেছে।

ফেঁসে গেছে মানে?

পার্পাস সার্ভড। শব্দটা অনেক ভেবে বসিয়েছি। একে বলে ডিপ্লোমেটিক শব্দ। যে যেমন মানে করে। পুবের ধাপায় সহস্র বছরের আবর্জনার স্তূপ। স্টুপাস অব জঞ্জালস। মাঝখানে মনুমেন্ট। চারপাশে প্যাসচারস ডটেড উইথ অ্যাপলজি গার্ডেনস: আকাশ থেকে কলকাতা দেখলে মনে হবে, ছ্যাতরান, ডেন্টেড, টিলটেড, এ পিস অফ ভূখণ্ড। ধুলো দিয়ে, ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা।



টেকসান গ্যাঙস্টার ইমপোর্টেড

এ সুইপিং সার্ভে রিভিলস—·০০০০০৫ পার্সেন্ট ফুটপাত অক্ষত আছে। ফিগারটা চেক করেছেন তো!

অফকোর্স! রাস্তা! রাস্তার অবস্থা—হেং হেং রাস্তা।

তার মানে?

রাস্তাকে প্রশ্ন করা হলে, রাস্তা এইভাবেই উত্তর দেবে—লোকে বলে তাই আমি রাস্তা—হেং হেং।

ও আই সি! ভাববাচ্য!

ইয়েস স্যার, ভাববাচ্য। সবাই ভাবে তাই কলকাতা একটা শহর। আসলে এটা একটা ফ্রন্টিয়ার। ভীষণ লড়াই চলেছে এই রণভূমিতে! কয়েক গন্ডা এজেনসিজ খাবলে খুবলে, কোদলা-কুদলি করে হালে আর পানি পাচ্ছে না। যে ভাল করেছিস কালী/আর ভালতে কাজ নেই মা/এবার ভালয় ভালয় বিদায় দে মা/আলোয় আলোয় চলে যাই।

এটা কার ডায়ালগ?

প্ল্যানার ছাড়া সকলের। গ্রীক নাটকের কোরাস।

নাটক সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই। ঘাঁটাঘাঁটির সাহসও নেই। "আলসার" আছে। টক নিষেধ। তবে শুনেছি সব গ্রীক নাটকের শেষেই ট্র্যাজেডি।

দ্যাটস রাইট।

তা হলে ওই এলিমেন্টটা মনে রাখুন। আমাদের কাজের সুবিধে হবে। ট্র্যাজেডির উপাদান দিয়েই ভবিষ্যতের কলকাতাকে গড়ে তুলতে হবে। নিয়তিকে তো কেউ খন্ডাতে পারবে না! রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সর্বত্রই নিয়তির অট্টহাসি। মনে রাখতে হবে, আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থটস।

তা হলে এই ট্র্যাজেডির পরিবেশই আমাদের তৈরি করতে হবে। বন্ধুগণ!

বন্ধুগণ শব্দটা উইথড্র করুন। দিস ইজ নট এ পলিটিক্যাল বক্তৃতা! ফ্রেন্ডস বলুন মেনে নেবো বাট নট দ্যাট বন্ধুগণ।

অলরাইট, ফ্রেন্ডস! ট্র্যাজেডির উপাদান কি কি? মৃত্যু, বিচ্ছেদ, যন্ত্রণা লাঞ্ছনা বঞ্চনা, হত্যা জিঘাংসা জিজীবিষা, জুগুপ্সা, জুজু, টর্চার ফ্রাকচার ম্যাসাকার হাহাকার, বিকার অন্ধকার। এর থ্রি-ফোর্থ এই শহরে অলরেডি আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আনপ্ল্যানড ওয়েতে আছে। এদের মেজার্ড ডোজে, মার্কড এলাকায় সাজাতে হবে। প্রথমেই হল মৃত্যু। মৃত্যু না হলে বিচ্ছেদ আসে না, বিচ্ছেদ না হলে বিষণ্ণতা আসে না। সুতরাং মৃত্যুর নানা রকম ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। মৃত্যু যত আকস্মিক হবে বেদনা তত জোরদার হবে। সার্ভে বলছে মৃত্যুর একজিসটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যা আছে তা হল—কিলিং ডিজিজ। ডিজিজ আমাদের আওতার বাইরে। গ্রীক অথবা শেকস-পীরিয়ান ট্র্যাজেডিতে কেউ অসুখে মরেনি। অসুখ হল ন্যাচারাল ফেনমেনান, নেচারস ন্যাচারাল। আমাদের পুরো কারবারটাই হল আনন্যাচারাল নিয়ে। অতএব ডেথ-ট্র্যাপ তৈরি করতে হবে—মরণফাঁদ। মরণফাঁদ যা যা রয়েছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান—পথ এবং পথ দুর্ঘটনা। এটাকে প্ল্যানড ওয়েতে বাড়াতে হবে। সকলের সহযোগিতার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে—বাসচালক, মিনিবাস চালক, ট্যাকসি ও প্রাইভেট গাড়ির চালক, লরি ড্রাইভার, পথচারী, পুলিস। ইতিমধ্যেই যাঁদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব উসখুস করছে তাঁরা হলেন—লরিচালক, মিনি-

চালক, বাসচালক। এ'দের আর একটু মদত দিতে পারলে পুরা কাম খতম হোগা। মদত! কিভাবে মদত!

মদত নম্বর এক। পথের পাশে খাল খনন। যে-কোনো গাড়িরই খালের দিকে, খাদের দিকে যাবার একটা সুস্থ প্রবণতা আছে। খাদলোভী, খালপ্রেমীরা তাই মাঝে মধ্যে ফুটপাথে চড়ে বসে। দিবসের ফুট আর রজনীর ফুটে অনেক তফাৎ। রজনীতে আরোহণ করলে একসঙ্গে অনেককে পিষ্ট করা যায়। রজনীতে অহরহ আরোহণের জন্যে দ্রাক্ষারিষ্ট চাই। আমরা দেখেছি ট্র্যাজেডির সবচেয়ে বড় উৎস দ্রাক্ষা। আগেও দ্রাক্ষা পরেও দ্রাক্ষা। দেবদাসের কথা স্মরণ করুন। প্রেম, বিচ্ছেদ, দ্রাক্ষা, ডেথ। মাঝে সামান্য থাইসিস। তাহলে একটি দ্রাক্ষানীতির প্রয়োজন। দ্রাক্ষা দ্রাক্ষৈব পরমাগতি।

এই খাদ খননের ব্যাপারে আর একটি এজেন্সি খুব তৎপর হয়েছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাব। কিভাবে! আমরা তৈরি করব ডেথ ট্র্যাপ। মনে রাখতে হবে, প্রথমে বিশ্বাস উৎপাদন তারপরই ঝপাত করে পতন, ধড়ফড়, ধড়ফড়, মৃত্যু। সাধারণ মানুষের পায়ের তলা থেকে পাটাতন সরিয়ে নিতে হবে আচমকা। এই ব্যাপারে ডেকিং আমাদের চমৎকার সাহায্য করতে পারে হামেসাই কেভইন করে। তাহলে মেথড ওয়ান হল—ডেকিং কেভ ইন।

এইবার বন্ধুগণ, সরি ফ্রেন্ডস! এইবার একবার চোখ বুজিয়ে মানসচক্ষে দেখুন—চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রিট ইত্যাদি অঞ্চলের সেই কাটাখালের চেহারা। গভীর পঙ্কিল। আচ্ছা, চোখ খুলুন। পরবর্তী পর্যায় হল, অপারেশন ক্রোকোডাইল। আমরা 'র‍্যান অফ কাছ' থেকে কিছু কুমির আনাব। সেখানে না পেলে আফ্রিকা থেকে। ওই কর্দমাক্ত গহ্বরে কুমির! ভাবা যায় না। পার্কের ইঁদুরতলায় কলকাতার মানুষ কাজকর্ম ছেড়ে মুড়ি খাওয়াবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েন। কুমির দেখলে তাঁরা তো নেচে উঠবেন। বিশেষত মহিলারা। শৈশবের সেই কুমির কুমির খেলার দিনগুলো মনে পড়ে যাবে। ডেকিং-এর রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়বেন, কুমির তোর জলকে নেমেছি। এদিকে টন টন গাড়ি চলেছে, লোক চলেছে। এমন সময় ডেক ভেঙে ধ্বস। উপোসী কুমিরের পেটে কয়েক শ মানুষ। ব্যানার হেডলাইন। টেলিগ্রাম। হই হই, রই রই। সভা, সমিতি, মিছিল। রাজনৈতিক দলাদলি। রাজভবন ঘেরাও। মুদুলাঠি, কড়ালাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি। একেই বলে স্নোবল এফেক্ট।

কল্পনা করুন। ইডেন উদ্যান। সময় প্রথম রাত। ঝোপের পাশে পাশে, জোড়া জোড়া, ফিসফাস। ওদিকে গেট দিয়ে জিভ চাটতে চাটতে ডোরা বেঙ্গল ঢুকছে। কেউ জানে না কে আসছে! প্রেমে মশগুল। জলের ধারে বসে থাকা প্রথম জোড়াটাকে তেমন পছন্দ হল না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চলে গেল। প্রেমিকা প্রেমিককে সুর করে বললেন, দ্যাখোওও, দ্যাখোওও, কি সুন্দর একটা কুকুর। প্রেমিক বললেন, রাখো কুকুর। তুমি ওর চেয়েও সুন্দর, উম। তৃতীয় জোড়ার ঘাড়ে ততক্ষণে বাঘ লাফিয়ে পড়েছে—হালুম। পরের দিন হেড লাইন—ইডেনে বাঘ। সংবাদে প্রকাশ, একই সময়ে, কার্জন পার্কে জনৈক নাদুস চ্যাটাইতে চিত হয়ে শুয়ে মালিস নিচ্ছিলেন, দুজনেই বাঘের পেটে। নিউ মার্কেটেও একটি বাঘ ন্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘুরছিল। বিলিতী কুকুর ভেবে অনেকে আদর করে মাথায় চাঁটিফাঁটি মেরেছিল, তারপর হঠাৎ আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে একটি খাসা জিনিস মুখে করে গ্লোবের গলিতে ঢুকে গেছে। মিনতির শাশুড়ী আমাদের সংবাদদাতাকে



ইডেনে বাঘ এসেছে

চোখ বড় বড় করে বলেছেন—বোটকা গন্ধ শুঁকে আমি ঠিকই ধরেছিলুম বাবা, বউমা ধমকে উঠলো, চুপ করুন তো কলকাতায় আবার বাঘ আসবে কোথা থেকে। যখন মুখে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তখন আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, কেমন লাগছে। তা বাবা মুখ দিয়ে কেবল বা-বা-বা বেরোল। অজ্ঞান হয়ে গেলুম। বড় ভাল হয়েছে, ছেলের আবার বে দোবো, নগদ দশ হাজার।

বড় বাঘ তেমন মানাবে না, পরিবেশের সঙ্গে তেমন খাপ খাবে না। মিনিবাসের জন্যে মিনি বাঘ চাই। যেখানে সেখানে ঘুরবে। তোমায় চিনি গো, চিনি গো করতে করতেই তিনি জলযোগ শেষ করে ফেলবেন। এই গুল বাঘ কোথা থেকে আমদানী করা যায় ভেবে দেখতে হবে।

উত্তর কলকাতার জন্যে বেশ বিগ সাইজের, ফ্রেশ কিছু ঠ্যাঙাড়ে আর ফাঁসুড়ে চাই। দক্ষিণ কলকাতার জন্যে চাই আধুনিক ধরনের কিছু 'টেকসান গ্যাঙস্টার'। নদীপথে বর্গীর হামলার মত নতুন কিছু হামলা উদ্ভাবন করতে হবে। সন্ধ্যে নামলেই ঘোর অন্ধকার, ভিন ভিন মশা, ঠ্যাঙাড়ে, ফাঁসুড়ে, কাউবয়, জলদস্যু। ভাবা যায় না। রোমানস, ট্র্যাজেডি, ফিয়ার। কি সাংঘাতিক উত্তেজনা ডিনার! রঙমহলের সামনে সত্যিকারের কার্ভালো ঘুরছে। হ্যাঁগো, কোন অভিনেতা নয়।

রিয়েল কার্ভালো, এই দেখো মাইরি, সব খুলে নিয়েছে, পাঁচ ভরি ফাঁক। আর কিছু করে নি তো! না না, ভীষণ ভদ্র। দেবভাষায় মুখপোড়াটা শুধু বললে, মাতঃ বঙ্গজননী, তব বক্ষ বিদীর্ণ করি তুলে দাও মণিহার, কর্ণকুণ্ডল, বাজুবন্ধ। সে কী হাসি। এগজ্যাক্ট স্টেজের কার্ভালো।

দুশো বছর পরে, পাক্কা দুশো বছর পরে, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ঠ্যাঙাড়ে দেখা গেল। বেলগেছের ব্রিজে আবার ফাঁসুড়ে। রাসবিহারীতে গান-ডুয়েল। বিশুডাকাত, রঘুডাকাতের সেকেণ্ড এডিশান তৈরির দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে। বন্ধ কলকারখানা, অচল চটকল পাটকল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট হবে এদের পীঠস্থান। সেখানেই এদের কালচার করতে হবে। দেখতে হবে হাইব্রিড তৈরি করা যায় কিনা। ডাকাতের সঙ্গে ঠ্যাঙাড়ে ক্রস করে, কি ঠ্যাঙাড়ের সঙ্গে কাউবয়।

আচ্ছা! চেয়ারম্যান, স্যার। আপনি একটা হিসেব চেয়েছিলেন। আমি একটা একমেটে ব্রেকডাউন তৈরি করেছি। ইডেনে দশ জোড়া, বিবাদি বাগে তিরিশ জোড়া, চৌরঙ্গিতে একশো জোড়া, এইভাবে সারা কলকাতার জন্যে প্রয়োজন হাজার দুয়েক পেয়ার। এখন প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের শেয়ালরা সব গেল কোথায়! সব পণ্ডিত হয়ে গেল নাকি! হতেও পারে। তা না হলে দেশে শেয়ালের সংখ্যা কমে পণ্ডিতের সংখ্যা এত বেড়ে গেল কি করে!

চেয়ারম্যান চেয়ারে নড়েচড়ে বললেন, শেয়াল ছাড়া রাত জমে না, অন্ধকারের মাহাত্য নষ্ট হয়ে যায়! শেয়াল বড় তান্ত্রিক, বড় মিসটিক। শেয়াল ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। হ্যাঁ, কোথায় লাগে জ্যোতিষী! দুর্ভিক্ষের আগে ডাকতে থাকে, ক্রাইমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে মাঝরাতে আহত সৈনিকের আর্তনাদ, মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক। আনন্দমঠে শেয়ালের ডাক, তারাশঙ্করের পঞ্চগ্রামে শেয়ালের ডাক, খালি নীলকুঠির ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে শেয়ালের ডাক, তারাপীঠের মহাশ্মশানে শেয়ালের ডাক। শিবা, শিবা। তন্ত্র, তান্ত্রিক, নরবলি। এই অন্ধকার মজা হাজা কলকাতায় প্রহরে প্রহরে শৃগালের হাহাকার চাই।

চেয়ারম্যান ঠিকই বলেছেন, অন্ধকার এসেছে, এইবার শেয়াল আনাতে হবে। কবিরাজী ওষুধের মত, অন্ধকারের অনুপান শেয়াল। মনে পড়ে সেই অতীতের কথা! প্রহরে প্রহরে পেটা ঘড়ি বাজছে, চৌকিদার হেঁকে যাচ্ছে, সাবধান! আর্ত চিৎকারে রাত চমকে উঠছে। ভারি কিছু বয়ে নিয়ে যাবার শব্দ। ছুটে পালাচ্ছে আততায়ীর দল। মা বুকের কাছে সন্তানকে চেপে ধরছেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে শেয়াল ডাকছে। একবার ভেবে দেখুন, জীবনের তারটাই কেমন পাল্টে যাবে! বিবাদিবাগের জলের ধারে দাঁড়িয়ে ভর সন্ধ্যেবেলায় কোরাসে শেয়াল ডেকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বাবুরা দপ্তর গুছিয়ে দ্রুত রাস্তায় নেমে এলেন, বাড়ি চল, বাড়ি চল। মারমুখী বাস ট্রাম, অন্ধকারে আসছে যাচ্ছে, যেন অবরুদ্ধ নগরীতে নাজি সাঁজোয়া বাহিনী। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে বন্দীদের নিয়ে চলেছে। থামঅলা বিশাল বিশাল বাড়ির অন্ধকার ছায়া পেরিয়ে যেতে যেতে মনে হবে--কারফিউ টোলস দি নেল অফ দি পার্টিং ডে।

প্রস্তাব এক॥ শেয়ালদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আলাদা একটা দপ্তর চাই। ফুল ফ্লেজেড একজন মন্ত্রী চাই। একটা ডাইরেকটরেট চাই। মনে রাখতে হবে, শেয়ালের মান সম্মান জ্ঞান মানুষের চেয়েও বেশি। কত কাহিনীর নায়ক, যুগ যুগ ধরে, এই শেয়াল। সেই শেয়ালকে নতুন করে ইনট্রোডিউস করতে হলে, জাপানী

জাতের রেশম চাষের মতই যত্ন নিতে হবে।

প্রস্তাব দুই॥ বিভিন্ন জাতের শেয়াল আছে—রেড ফকস, গ্রে ফকস, আর্কটিক ফকস, কিট ফকস, সুইফট ফকস, ফেনেক ফকস। আমরা আফ্রিকা থেকে আপাতত দু হাজার পেয়ার কিট ফকস আনাব। বড় বড় কান, ছোট চেহারা, চটপটে। গরম সহ্য করতে পারে, জল কম খায়। বাঙালীর চেয়েও ধূর্ত।

প্রস্তাব তিন॥ আপাতত এরা অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত ভূগর্ভ সুড়ঙ্গে থাকবে অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানে। যদি ইচ্ছে করে, কলকাতার তলায় তলায় আরও কিছু গর্ত খুঁড়ে কলকাতার পুরো বুনিয়াদটাকে আরো একটু নড়বড়ে করে আমরা যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছি সেই মহৎ কাজে সাহায্য করতে পারে।

প্রস্তাব চার॥ এরা যদি এই পরিবেশে প্রাণ খুলে ডাকতে ইতস্তত করে, করতেও পারে, তার জন্যে আগেভাগেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। সে ব্যবস্থা নেবেন শেয়াল মন্ত্রণালয়। অভিজ্ঞ কিছু গায়ক তাঁরা নির্বাচন করবেন। শেয়ালের ডাকের স্বরলিপি তৈরি করে...

ওঃ মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক! প্রথমে হুক্কাটা ধরে মুদারায়, মনে হয় গান্ধারে তারপর কি ভাবে সড়াৎ করে কা হুয়ায় চলে যায়, একেবারে তারার পঞ্চমে, সেখানে গিয়ে সকালের জিভ ছোলার মত—কা হুয়া, কাহুয়া, কা হুয়া। ইয়েস, স্বরলিপি একটা চাই।

শেকসপীয়রের কলকাতা

কলকাতার সমস্ত বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ বিদায় করাই ভাল। কি দরকার ওই বিচ্ছিরি ক্যাটকেটে ঝাঁঝাল আলোর! সরকারী বিদ্যুৎহীন ব্যবস্থায় এই প্রথম ধরা পড়ল অন্ধকার কলকাতা কত সুন্দর! অন্ধকারের অদ্ভুত ক্ষমতা বৈষম্য ঘোচানর। নতুন বাড়ি, পুরন বাড়ি, পলেস্তারা-চটা নোনাধরা বাড়ি, অন্ধকারে একাকার, গায়ে গায়ে লাগা শিল্যুয়েট। কোন বাড়ির জানালা গলে বৈদ্যুতিক আলো বাইরে অসভ্যের মত ছেতরে পড়ছে না। কাঁপা কাঁপা মোলায়েম মৃদু আলো। জানালায় একটি ছায়ামূর্তি। রূপের বিচার, বয়সের বিচার নেই। কি ভীষণ রোমাণ্টিক। সারা শহরটাই যেন রোমিও-জুলিয়েট নাটকের স্টেজ। বহুকাল পার করে এসে রোমিও দাঁড়িয়েছে কোদলান ফুটপাথে। লতাবিতান নেই, ফিটন নেই, গ্যাসের মিটি মিটি বাতি নেই। পিয়ানোর সুর বাতাসে ভাসছে না। গাউনের লেস পাশ দিয়ে খসখস করে মৃত প্রেমিকের কবরের দিকে ক্রুশ হাতে এগিয়ে যাচ্ছে না। তবু মনটা তো এখনও মরে যায়নি। তার এগোবার পেছোবার ক্ষমতা আছে। এই অন্ধকার ছায়া ছায়া কলকাতা ছ'শো বছর আগের সেই রাতকে কত সহজে ফিরিয়ে এনেছে! ছিদাম মুদি লেন নয়, এ তো সেই ক্যাপুলেটর বাগিচা। গর্তে পড়ে পা মচকেচে। রোমিওর গা হাত পা ছড়ে গিয়েছিল লতা ধরে পাঁচিল টপকাতে গিয়ে। তখনঃ

He jests at scars, that never felt a wound.

জানালায় জুলিয়েটের ছায়া

What light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the Sun!
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
who is already sick and pale with grief.

'অ্যা মা মুখে আগুন! রাস্তার মাঝখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মড়া কি বিড়বিড় করছে দেখ।'

'সঅরি দিদিমা, আমি রোমিও।'

'সেটা আবার কে বটেক! আমি তো ভেবেছিলুম গরু। তা গুঁতোলো না যখন তখন ভাবলুম মানুষ। একটু একপাশে সরে দাঁড়াও বাছা। হোমিও বলে কি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াবে! ধাক্কা মেরে কি পসার বাড়ানো যায় বাছা।'

জুলিয়েটও সে রাতে রোমিওকে বলেছিল,

What man art thou, that, thus be screened in night so stumblest on my counsel.

'দিদিমা তুমিও এক সময় জুলিয়েট ছিলে। এখন বুড়ী হয়ে গেছো।'

'হ্যাঁ বাছা, হোমিও করেই দ্যাখো, সারে কিনা! পেটের রোগ আর মাথার ব্যামো এখন খুব হচ্ছে ঘরে ঘরে। আর হবে না, যা সব মা হয়েছে এখনকার? বিয়োলেই মা। না চেনে কালমেঘ, না জানে গাঁদাল।'



দিদিমা, তুমিও এক সময় জুলিয়েট ছিলে

'She speaks | o speak again.

'কি করে তুমি এলে এই অন্ধকারে। টর্চ কিনেছো! না আজও ভুলেছো।'

'চুপ। নো টর্চ। রোমিও জুলিয়েট নাইট।

with love's light wings did I o'er perch these walls;
For stony limits cannot hold love out.'

'লাভ ফাভ ছাড়। ঘরমুখো গরু গোয়ালে আসবেই। বাপের বাড়িতে দেখেছি তো, মঙ্গলা গাই সন্ধ্যের সময় কোত্থেকে ঠিক ফিরে আসত। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকত—হাম্বা।'

'সে তো গাই! এ হল ষাঁড়. ষন্ড ফিরে আসে 'লাভে'র টানে। লভ লভ।
Love goes toward love, as school boys from their books.
হেহে, বুঝলে জুলিয়েট। জুলীই আই লাভ ইউ।'

'এই নাও টিন, কেরোসিন তেল লে আও।'

'হেডমাস্টার মশাইকা সার্টিফিকেট মাংগনা লাও।'

'সে গুড়ে বালি মাই ডিয়ার। ছেলে হবে, বড় হবে, স্কুলে যাবে, হেড-মাস্টারমশাই সার্টিফিকেট দেবেন তবে দু লিটার কেরোসিন। টিনটা রঙ করে তুলে রাখি, মরচে না ধরে যায়।'

মোমবাতির আলোয় আমার তিনশো টাকা ভাড়ার খুপরিটি সহসা তাজ হোটেলের রম্যকক্ষে পরিণত হল। পায়ের তলায় নরম নরম গালচে নেই। পরোয়া নেহি কুছ্। হাতে বাতি, মনে কল্পনা, কে আমাকে আটকাবে! ঝাড়লণ্ঠনের বেলোয়ারী আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। সমস্ত দরজা, জানালা বন্ধ, নইলে বাতাসে বাতি হার্টফেল করবে। কলকাতা তার শব্দ, ধুলো, ধোঁয়া, সরীসৃপ শরীর নিয়ে যেন বহু দূর চলে গেছে।

—তুমি আমার 'হেজেল আয়েড' ইরানী প্রেমিকা। সিঁড়ির শেষ ধাপে ঘাগরা পরে দাঁড়িয়ে আছ। আমি খৈয়াম লটর-পটর করতে করতে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগিয়ে চলেছি।

—আরে মেঝেতে মোম পড়ছে যে, মোজাইক নষ্ট হয়ে যাবে। ইউ ইনডিসেন্ট, কেয়ারলেস ইনডোলেন্ট হাজব্যান্ড।

—খবরদার! এই ঘোরান্ধকারা অমানিশায় সামান্য মোজাইকের মেঝের জন্যে তোমার ওই আর্ত চিৎকার! তুমি না মৈত্রেয়ী, গার্গীর দেশের মহিলা। বেদ-বেদান্ত পড়, পড়ে দেখো, জীবনের সব কিছু অতি ক্ষণস্থায়ী। শাশ্বত হল আত্মা। জ্যোতির্ময় সেই লিঙ্গশরীর আমার হাতে কাঁপছে। আমি পশ্চিম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, নির্মলেন্দুবাবুর মত গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলিঃ বাঙলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘোর ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, কে তাকে দেখাবে আলো, তুমি ইরানীবালা, তুচ্ছ মোজাইক, হা হা। গেল গেল। যাঃ নিভে গেল। কৃতদাসী লেআও দিয়াশলাই, সিঁড়ির শেষ ধাপকটা এখনও উঠতে বাকি।

—কি বললে, কৃতদাসী? ইরানীবালা অবদি সহ্য করেছি। বাসনউলীদের দেখেছি তো মন্দ না, বেড়ে লচকে আছে। হু ইজ ইওর কৃতদাসী?

—সুন্দরী! ভুল কোরো না, আমরা এখন যুগ থেকে যুগান্তরে চলে গেছি। সিপাহী বিদ্রোহ, পলাশীর যুদ্ধ, আকবরের সিংহাসনে আরোহণ, বিসমার্ক,

ডিজরেলী, গোলাপের যুদ্ধ, ক্রুসেড, তখন তো অ্যারিস্টোক্র্যাটদের দাসদাসীই ছিল, হারেম ছিল, বুক-সেল্ফে টমকাকার কুটীর আছে পড়ে দেখো কল্য দিবসে। আমার মনের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে তোমার চেহারা ঘন ঘন পালটাবে। কখনও জুলিয়েট, কখনও ইডিয়েট, কখনও ইরানীবালা, কখনও শকুন্তলা, আমি কি করব। চাবুক-ফাবুকও চালিয়ে দিতে পারি। কথায় বলে—যুগ পালটাচ্ছে, বলে না?

—যুগ পালটাচ্ছে মানে? ১৯৭৯ সাল। কত বছর অন্তর যুগ পালটায় শুনি?

—এক এ পক্ষ, দুই এ নেত্র—

—হয়েচে, হয়েচে আর চেষ্টা কোরো না, প্রথমেই ভুল। এক এ চন্দ্র, ওতে যুগ নেই, দিক এ গিয়ে শেষ হয়েছে, দশ এ দিক। বারো বছরে এক যুগ হয়। তার মধ্যে যুগ পালটায় না।

—পালটাতে জানলেই পালটায়। পালটে যাবারও তো একটা গতি আছে। আমরা ড্রাইভারকে বলি—ওহে স্পিড বাড়াও, বলি না? সেই রকম স্পিডি চেঞ্জ। আমি এখন আরব দেশ থেকে ঘোড়া আনাব, লণ্ডন থেকে বর্ম আনাব, স্পেন থেকে সোর্ড আনাব, ভারত থেকে দাসদাসী আনাব।

—সে আবার কি? তুমি তো ভারতীয়, ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যের কলকাতা শহরের একটি ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে আছ।

—হি হি, কলকাতা আবার শহর! ঠিক হ্যায়! তাহলে আমি ভারতীয় ভাস্কো ডা গামা, ঠিকই তো, কবি বলেছিলেন, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লভে। আমি সেই কলোনিয়ালিস্ট, সেই মহাবীর, মহামতি আলেকসাণ্ডার। ওঁরা এসেছিলেন নিচের দিকে, আমি ঠেলে উঠবো ওপরে, তুরস্ক-ফুরস্ক ভেদ করে সোজা সাদা চামড়ার দেশে। দেখো, দেখো, আয়া হ'ুউউ ব্ল্যাক জাপান। তলোয়ার খুলে লড়ে যাব—লাইক বার্ট ল্যাঙকাস্টার, ক্লার্ক গ্যাবল, গ্যারী কুপার। আমার প্যালেসে রাখব সাদা কৃতদাসী তুমি হবে হেড দাসী। নাও ব্যবস্থা করে দিলুম। এবার খুশি তো! এইবারঃ

হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি চোখে যে ভাল দেখি না॥

কংক্রিট প্রকোষ্ঠে বাতি জ্বলছে কেঁপে কেঁপে। এতকাল আলো দেখেছি ওপর থেকে, সিলিং থেকে নিচে নামছে। এখন দেখছি নিচে থেকে ওপরে উঠছে। বাস্তব থেকে উঠে কল্পনার রাজত্বে ছড়িয়ে পড়ছে। আহা তাই বোধহয় এত ভাল লাগছে! মাথার ওপর স্তব্ধ শ্বেত পাখা। অপ্সরার মত ভাসছে। কল্পনায় ঘুরছে। বাস্তবের নোংরা ঘরের মেঝের চেয়ে ঈষৎ নীলাভ, ঘরের ভেতরের ছাদটি অনেক বেশি পবিত্র। এইভাবেই আমাদের মন যেন ক্রমশই ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। আরোহণ, আরোহণ, অমৃতস্য পুত্রা!

শৈশব ফিরে এসেছে যেন! ছায়া নিয়ে খেলা করি। ওহে শুনছো, ও মিনুর মা, শোভা, শোভা তোমার সঙ্গ আর আমি থোড়াই কেয়ার করি! আমার নিজের ছায়াই আমার সঙ্গী। ইচ্ছেমত দেয়ালের গায়ে নিজের ছায়াকে বাতির আলোয় বড় করি, ছোট করি। ছোট হতে হতে যেন শিশুটি কচি খোকাটি! এইবার হামা দিলেই হয় মা, মা, করে। এইবার বড় করি, ক্রমশ বড় হচ্ছি, কিশোর, যুবক, বিশাল বড়, সব শিশুদের পিতা, ঘরের ছাদে ভেঙে, মচকে লতানে পিতার মত

লতিয়ে লতপত করছি। বাঃ বেশ মজা তো! বৈদ্যুতিক আলো কাজকর্মের আলো, খেটে খাওয়া প্রোলেটারিয়াটদের আলো, বাতির আলো—রোমান্টিকদের আলো, খেলু খেলু করার আলো। ও আলো চাই না মাগো, আমায় মোমের আলো দে জননী/ঘরে ফিরে একা একা খেলা করি ছায়া নিয়ে॥

[সুর—রামপ্রসাদী। তাল—সুর ফাঁক তাল]

কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ। অন্ধকার ঘাপটি মেরে বসে আছে, খাটের তলায়, ঘরের কোণে কোণে, টেবিলের তলায়। এসো চোর চোর খেলি। অনেকদিন খেলা হয়নি। বয়েস হয়েছে তো কি হয়েছে! মনের আবার বয়েস আছে না কি! তুমি ও ঘরে খাটের তলায় ঢুকে টু উ কি বল। আমি খুঁজতে বেরোই।

আচ্ছা, বেশ একটা গা-ছমছম করা ভূতের গল্প বল। ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য ডাইনী সব ফিরিয়ে আন একে একে। ইলেকট্রিকের ভয়ে ওরা এতদিন দূরে দূরে ছিল। এখন আর ফিরে আসতে বাধা কি! কি হল, পা তুলে বসলে কেন? কি হল, পিঠে হাত দিচ্ছ কেন? ভালই করেছ, ভালই করেছ। খাটের তলা হল চোর ভূত আর পরকীয়া প্রেমীদের বড় প্রিয় স্থান। ভূত সাধারণত পিঠ বেয়েই উঠতে ভালবাসে। ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে। ওঁরা জেনারেটর, টারবাইন ইমপোর্ট করছেন করুন। আমি হারুন অল রশীদের দেশ থেকে কিছু ভূত আমদানী করি। যখন শুয়ে থাকব গোটাকতক ভূত যদি সারা শরীরে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলতে থাকে রুমকুলারের কাজ হবে। তুমি তো ইউসলেস, হাতপাখাটাও টানতে পার না, পেতনী আনাবো না। তোমার সঙ্গে লাঠালাঠি বেঁধে যাবে। তেমন সার্ভিস দিতে পারবে না। আনাতে হলে রেনেসাঁ যুগের ভূতই আনাব। হাল আমলের ভূতেরাও ফাঁকিবাজ হবে। দেখি কাল সকালে আলমারি থেকে ঝেড়েঝুড়ে নামাই, এডগার অ্যালেন পো। হিচকক, কীরোর ভূতের গল্পের সংকলন। পড়তে পড়তেই তাঁরা এসে যাবেন, এসে দাঁড়ালেই চুল খাড়া, শরীর হিম, অন্ধকারে বসে কিংবা শুয়ে কাঁপতে থাকব, ভূভূভূউউ। পাখা ফিট করে কি হবে? ভূত ফিট করি।

শুনেছি পাগলদেরও শীত গ্রীষ্ম বোধ খুব কম। নেই-ই। আধপাগলা হয়ে আছি, কোনরকমে ফুল ম্যাড যদি হতে পারতুম। ওই রেকর্ডটা একবার বাজাও তো ঃ আমায় দে মা পাগল করে, ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল করে। বাজান যাবে না! কেন? ও ইলেকট্রিক! দেখি কাল চোরাবাজার থেকে দম দেওয়া, চোঙঅলা একটা গ্রামোফোন কিনতে পারি কিনা!

চলো, ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমাকে তারা চেনাই। এমন আকাশ আগে কখন দেখেছো! আহা তারার খই ফুটছে। এতকাল নীচের আলোয়, নীচ আলোয় ওপরের আলো চাপা ছিল। শহরের আলোকে ফিনিশ করতেই—দ্যাখো দ্যাখো রাতের আলো, তারার আলো, চাঁদের আলো কেমন খুলেছে। ওই দেখ—ডিউক অব ওয়েলিংডন সেনেট থেকে প্যালেসে ফিরে আসছেন। কাকে কি বলছ? ও তো আমাদের বিধু। ভ্যাট, দিনের বিধু রাতের মঞ্চে ঐতিহাসিক ব্যাপার। ওই দেখ, প্রিন্স অব ভেরোনা আসছেন। ও তো আমাদের বিশু ঠাকুরপোর বড় ছেলে। চুল রেখেছে লম্বা লম্বা। ফাঁদাল ট্রাউজার পরে।

ও তোমার কম্ম নয়। প্রেসারের রুগীর পক্ষে কিংবা স্নায়বিক দুর্বলতা থাকলে মোমবাতি বসাবার চেষ্টা না করাই ভাল। একটা বাতির দাম আশি পয়সা।

দিলে তো মাজাটা ভেঙেগ! আর একটু হলেই টেবিল ক্লথে আগুন ধরে যেত। বাতির জন্যে চাই, স্ট্রেট আর স্ট্রং নার্ভ। চাই ধৈর্য। কোথায় সেই ধৈর্যশীলা মহিলা! প্রথমে পলতেটিতে আগুন ধরাও। প্রথমে দাউ দাউ করে জ্বলেই নিবু নিবু নিবুউ হয়ে আসবে। উত্তেজিত হবে না: ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর। বল, নিববি না, নিববি না। বাতিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, ম্যানিপুলেট করে করে শিখাটিকে পণ্ডিত মশাইয়ের শিখার মত করে তোল। একে বলে, ম্যানিপুলেটিং অ্যান আপ-টু-ডেট ক্যাণ্ডেল। যুগটাই হল ম্যানিপুলেশানের।

এরপরই হল পুডলিং। বাতিটাকে যেখানে, যার ওপর বসাতে চাও, তার ওপর কাত করে ধর। প্রথমে গলতেই চাইবে না। এক ফোঁটা, দু ফোঁটা। এই সময় নিজের মোমের ধাক্কায় নিজেই নিবে যেতে পারে। নিবলেও বিরক্ত হবে না। ধৈর্যের অপর নাম মোমবাতি! দু তিন ফোঁটা গলে পড়ার পর সেই দুর্বল ভিতের ওপর বসাতে চেষ্টা করবে না। মোমবাতি আর মনুমেণ্ট একই রকম দেখতে। বেশ জোরদার ফাউণ্ডেশান চাই। এ যুগের বাতির সে যুগের বাতির মত রস নেই, স্নেহ নেই, আলো নেই। এ বাতি, সে বাতি নয়। যে বাতিতে ম্যাকবেথ লেখা হয়েছিল। চোখ সরাও, এখনকার বাতি মাঝে মধ্যে ধমকে ওঠে।



চাঁদামামা, চাঁদমামা টি দিয়ে যা

স্পিটিং লামার নাম শুনেছ! একরকমের জন্তু। ছিড়িক করে থুতু ছিটকে মানুষকে কানা করে দেয়। অতএব ফোঁটা দুয়েক কি তিনেক ভিতের ওপর বসিও না। প্রথমে বসবে তারপর তিনি শুয়ে পড়বেন কাত হয়ে। ফোঁটা ফেলতে থাক, ফেলতে থাক। দীক্ষা হয়েছে? মন্তর নিয়েছো? বেশ, এই ফাঁকে জপ করে যাও—অউম, অউম। যেই দেখবে বেশ পাঁক পাঁক মোম-পুকুর তৈরী হয়েছে—কোয়গমায়ার, তখন থার্ড অপারেশন। অপারেশন স্ট্যাবিং। স্রেফ বসিয়ে দাও। পাকা খুনী বুকে যেভাবে ছোরা বসায় সেইভাবে বিগলিত মোমগর্ভে মোম কান্ডটিকে অকম্পিত হস্তে প্রোথিত কর। বিড়ি খাও না সিগারেট ফোঁকা কর না, অন্য কোন নেশা নেই তবু তোমার হাত কাঁপছে কেন? এ কি তোমার দিদিমার দাঁত পেয়েছ! নড়বে তবু পড়বে না। নির্ভীকভাবে বসিয়ে দাও। হাত সরিয়ে নাও। দেখো কেমন দাঁড়িয়েছে। না প্লাম্বলাইন ফেলার দরকার নেই, একেবারে খাড়া বসেছে কিনা দেখো। তালগাছের মত হেলে থাকলে তোমার অর্থনীতিও হেলে পড়বে। নিমেষে গলে ফাঁক। এ তোমার পিসার লিনিং টাওয়ার নয়।

পরের বার তোমাকে হ্যারিকেন সম্পর্কে জ্ঞান দেবো। ভবিষ্যৎ যেমন জানতে হয়, অতীত তেমনি শিখতে হয়। অ্যানসেন্ট সব ব্যাপার স্যাপার, ইতিহাস পড়ে জানতে হয়। বল না তোমার ইলেকট্রিসিয়ানকে, সাবেক আমলের একটা গ্যাসের বাতি ফিট করতে। ফেল করবেন। স্টেট বাসের ড্রাইভার পারবেন গরুর গাড়ি চালাতে! অথচ আমরা হড়কে হড়কে সেই গুড ওল্ড ডেজের দিকে নেমে চলেছি। তোমার নাম রেবা, পালটে পৌরাণিক করে দিলুম—বেহুলা। আমার নাম অরিজিৎ কি ওরিসুল নয়—লখিন্দর। এস লোহার বাসর ঘরে সুখনিদ্রায় শয়ন করি। লোহার বাসরই তো। হাওয়া নেই, আলো নেই, তার ওপর মশারি। পাখাটা ঝুলছে দেখ, যেন বেঙগমা বেঙগমী। এসো ঘামতে ঘামতে ঘুমোই।

কাত্যায়ন এ কি দুঃস্বপ্ন? কে যেন আমার বুকে চেপে বসেছে। কে, কে। মহারাজ আপনার বুকে বসেছে—অ্যাডমিনিসট্রেশান। ব্রঙকাইটিসের মত দুরারোগ্য। এ কি, আমার গলায় কে কলার বেল্ট বেঁধেছে। আমি কি কুকুর! হিজ ম্যাজেস্টি, কুকুর বড় বিশ্বাসী প্রভুভক্ত জীব। তবু ওটা কলার বেল্ট নয়, শয্যাসঙ্গিনীর গোদা হাত।

মশারি ফসারি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ঘুম নেই, ঘুম নাহি আঁখি পাতে। একি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! নিথর প্রকৃতি!

Macbeth does murder sleep, the innocent sleep, sleep that knits up the ravelled sleave of care.

থামলে কেন?

ও তুমিও উঠে পড়েছ?

উঠব কি? জেগেই তো পড়ে আছি। ঘুমোয় কার পিতার সাধ্য! ওটাও বল,

Out, damned spot! Out I say! one..two:

কিসের স্পট। আমি তো খুন করিনি?

নাই বা করলে! ভোট তো দিয়েছিলে? আঙুলের সেই কালির ফোঁটাটা... ড্যামড স্পট আউট আই সে।

নেমে এস। ওটা তোমার ডায়ালগ লেডি ম্যাকবেথ। ওই দেখ, কি অদ্ভুত শেকসপীয়রের কলকাতা, অন্ধকার ধোঁয়া ধোঁয়া—আই প্লে দি রোমান ফুল অ্যান্ড ডাই।

অন্ধকার সাপ্লাই করপোরেশন

বেয়ারা কাঁচুমাচু মুখ করে বললে—স্যার আমার কি দোষ, সাহেব স্লিপে যা লিখলেন আমি সেইটাই আপনার টেবিলে রেখে গেছি। তিনি ভিজিটার্স রুমে বসে আছেন।

শাট্ আপ। তুমি কি আজকাল গাঁজা টাঁজা খাচ্ছো? বেয়ারা স্মার্টলি বললে, না স্যার। গাঁজা সস্তা হলেও, দুধ সস্তা নয়। গাঁজার সঙ্গে দুধ টানতে হয়, তা না হলেই কলকের মত ফটাস। খুব কথা শিখেছো? তোমার চাকরি আমি নট্ করে দেবো। পারবেন না স্যার। আমাদের ইউনিয়ান আছে। বেশি ট্যাঁ-ফোঁ করলে নিজেই ট্রানসফার হয়ে যাবেন ধাধধাড়া গোবিন্দপুরে। গেট আউট! যে আজ্ঞে। বেয়ারাকে বিদায় করে স্যার ইন্টারকমে পি এ কে ডাকলেন, বিশ্বাস দেখো তো স্লিপটায় কি লেখা আছে! বিশ্বাস চশমা খুলে কাগজের টুকরোটা চোখের খুব কাছে এনে বললেন—আজ্ঞে চার্চিল। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট, লন্ডন। স্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, ইমপোস্টার? দেখে এস তো ভিজিটার্স রুমটা। কি দেখলে! আজ্ঞে সেই মোটা চুরুট। সেই টুপি। সেই ছাতা। কি করে হয় বল তো। মরা মানুষ জ্যান্ত হয়! আমার ইতিহাস তেমন পড়া নেই বলতে পারবো না স্যার। চার্চিল কি মারা গেছেন? তুমি আর এক ইডিয়েট! ওয়ার মেময়ার্সটা কাল থেকে রোজ পাঁচ পাতা করে পড়ে অফিসে আসবে। বয়েস হয়েচে। একটু লেখাপড়া কর পাঁচু। ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে! যাও ডেকে আন! স্যার! মিস্টার তুলপুলে এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ! সে আবার কে? তুলতুলে? তুলতুলে নয়, তুলপুলে। আমাদের এজেনসি হাউসের কপিরাইটার। আই সি, আই সি। স্মৃতিশক্তিটা ক্রমশ কমে আসছে বিশ্বাস। কাল থেকে সকালে আর একটা ডিম, রাতে আর একটা মাল্টি ভিটামিন ক্যাপসুল বাড়াতে হবে দেখছি! মেমারির কি দোষ বল! দেশে দুধ নেই, ঘি নেই, গরু নেই, ছাগল নেই। থাকার মধ্যে গুচ্ছের অপদার্থ মানুষ! দুজনকেই ডাকো।

চার্চিল পরে, তুলপুলে আগে ঘরে ঢুকলেন। আপনি চার্চিল? ছবি দেখেছি। বেড়ে মেক আপ নিয়েছেন। অবিকল সেই রকম দেখাচ্ছে। মোটাসোটা, থলথলে থপথপে। বসুন। উঠে দাঁড়ালুম না। সাতচল্লিশে স্বাধীন হয়েছি। সাহেব দেখলে বোকার মত উঠে দাঁড়াবো না, প্রতিজ্ঞা করেছি। বসুন তুলপুলে। চার্চিল আপনি তো মারা গেছেন, যদ্দুর জানি। চার্চিল, চুরুট সরিয়ে বললেন, তাহলেও আসতে হল, রেসারেকসান। ইউ হ্যাভ আউটচার্চিলড চার্চিল। হ্যাভ এ সিগার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার আমার কৃতিত্বকে তোমরা ম্লান করে দিয়েছো। হাও স্মুথ! হাও সাডেন! মানে! মানে, তোমাদের এই আলো থেকে অন্ধকারে চলে যাওয়া। এই আলো এই অন্ধকার! এই আছে এই নেই। চকিত চপলা সম চঞ্চল সতত মন। আরে ব্রাদার গ্রেট ওয়ারের সময় ওরকম একটা ডিসিপ্লিনড লন্ডন শহরকে নিমেষে অন্ধকার করতে আমার জান কয়লা হয়ে যেত! আমি ভাই স্টাডি টুরে এসেছি। আমি তোমার কাছে তোমাদের এই আর্টটা শিখতে চাই।

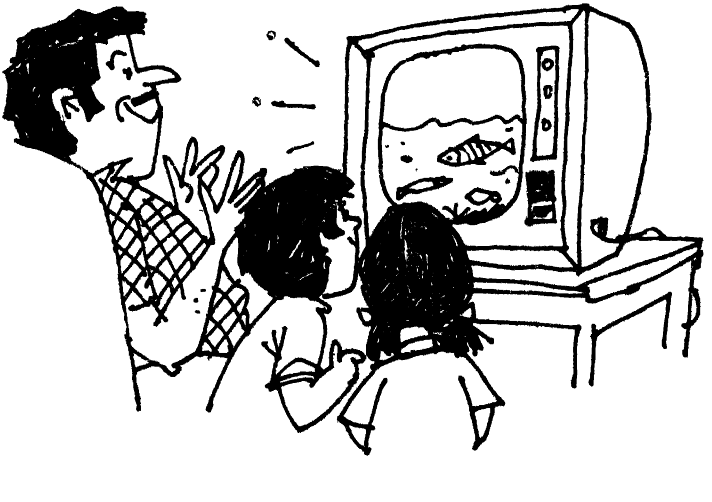
হে হে বাবা! হোয়াট বেঙ্গল ডাজ টুডে ওয়ার্লড উইল ডু টুমরো।

কিন্তু! এটা তো একার চেষ্টায় হবে না। এর জন্যে ভাল টিমওয়ার্ক চাই, শক্তিশালী প্রশাসন চাই। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভ্যাঁপ পোঁ পোঁ, ভ্যাঁ পোঁ পোঁ। চা না কফি! কফিই হোক, আমারটা ব্ল্যাক। বিশ্বাস, একটা ব্ল্যাক দুটো ব্লু ব্ল্যাক। হ্যাঁ যা বলছিলুম, ভাল অন্ধকারের জন্যে তোমার গোটা কতক জিনিস চাই—একটা হল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, দুই, বাঙালী কর্মী, তিন, গোটা কতক ইউনিয়ন, চার, মাশরুম পলিটিকস। ওই গোটা দুয়েক কি তিনেক পলিটিক্যাল পার্টিতে অন্ধকার হয় না, সাহেব, বড় জোর মৃদু আলো ডিম লাইট হয়। টোটাল ডার্কনেসের জন্যে সেই রকম জাতীয় প্রস্তুতি চাই, সেই রকম মেজাজ চাই। বঙ্গ আমার জননী আমার, যেখানে বাঙালী, সেখানেই অন্ধকার। গর্বে আমার গর্ভকেশর ফুলছে। তুমি বস। আমি ততক্ষণ মিস্টার তুলপুলের সঙ্গে একটু কাজের কথা সেরে নি। জাস্ট ফাইভ মিনিটস।

মিস্টার ফুলফুলে! আই অ্যাম তুলপুলে স্যার। ইয়েস ইয়েস। কোথাকার লোক আপনি! বাঙালী স্যার। চাকরি হচ্ছিল না বলে টাইটল্ পাল্টে তুলপুলে। আমার একটা ডিসকোয়ালিফিকেসানও ছিল। দশ বছর সরকারী চাকরি করে ফেলেছিলুম। প্রাইভেট হাউসের ধারণা পাঁচ বছর সরকারী চাকরি করলে মানুষ খ হয়ে যায়। খ হয়ে যায়! আই সি, আই সি মিউল হয়ে যায়। যাক্, স্লোগানটা ভেবেছেন? দেখি। বাঃ নাইস! 'আমরা ঘরে ঘরে অন্ধকার বিলি করি।' অ্যাপ্রো-প্রিয়েট, ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট! কিন্তু এটা কি ঠিক হবে স্যার। একটু স্যাটায়রি-ক্যাল শোনাচ্ছে না! কাণ্ট হেলপ! এখন আমাদের সত্যি কথা, সোজা করে বলতে হবে। বিজ্ঞাপন মানে, সেলিং হোপস, টাকে চুল গজিয়ে দেবো, এক বড়িতে বুড়োর যৌবন ফিরিয়ে দেবো, কেলেমানিককে ফর্সা করে দেবো। মিথ্যা ভাষণ আর চলবে না। বাজে প্রতিশ্রুতি নো মোর। এখন কোদাল ইজ এ কোদাল। তবে হ্যাঁ, এখনো মাঝে মাঝে আলো জ্বলে। জ্বলে, অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করার জন্যে। রেটিনায় আলোর ধাক্কা মেরেই অন্ধকারে ভাসিয়ে দাও! তবে না, 'ভেসে যায় ভাসিয়ে নে যায়।' তবেই না বলতে পারছি আমরা অন্ধকার বিতরণ করি! সূর্য ডুবলেই তো অন্ধকার! আমাদের কেরামতিটা কোথায়! সেইখানে, অন্ধকারটা আমরা ঘাড় ধরে উপভোগ করাই। নিন লিখুন—সাব হেডিং, 'দুধ চাইলে দুধ দেবো টামাক চাইলে টামাক। 'টামাক' নট তামাক। স্বেচ্ছায় যাঁরা আমাদের অন্ধকার প্রকল্পে যোগ দেবেন, যেমন ডি সি থেকে এ সি-তে যাবার সময় করা হয়েছিল, ঠিক সেই ভাবে আমরা আপনাদের সাহায্য করব। কি সাহায্য করব! এক, পাখা বদল। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্ভাবিত, ঘোরালেই ঘোরে পাখা।' কাঠের লম্বা গোল ডাণ্ডা। কাঠের ব্লেড। বলবেয়ারিং লাগান। সিনথেটিক এনামেল রং মাখানো। বাহারি হালকা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ছুতোর মিস্ত্রির তুরপুন ঘোরাবার কায়দায় শিশু, কিশোর, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ইচ্ছামত সারাদিন ঘোরাতে পারেন। ঘোরানোর একটা নেশা আছে। চাকা ঘোরানোর নেশার মত! চাকা ঘুরিয়েই জুয়া খেলা হয়। জুয়ার নেশা ধরে গেলে সহজে ছাড়ে না। এই পাখা নাছোড়বান্দা। ঘোরানোর জায়গায় সিল্কের সুতোর ফাঁস। দুটো প্রান্ত দুদিকে ঝুলছে। একবার এ প্রান্ত আর একবার ও প্রান্ত ধরে টেনে ছেড়ে দিন। পাখা ঘোরে বনবন। 'মোমেণ্টাম'কে বেশ কয়েক পাক ঘুরে যেই থামবো থামবো হচ্ছে, মারুন আবার টান। খিঁচো পাখা, পাখা খিঁচো। হাতে পায়ে চঞ্চল দুরন্ত শিশু সব সময় যে কিছু না কিছু অনিষ্ট করছে, লাগিয়ে দিন তাকে পাখা

ঘোরানোর কাজে। পাখার নেশায় মশগুল থাকবে সারাদিন। অবসরভোগী খুঁত-খুঁতে বৃদ্ধ সারারাত যাঁর চোখে ঘুম নেই, ফিট করে দিন পাখায়, নিদ্রাহীন রাত কোথা দিয়ে ভোর হয়ে যাবে টেরও পাবেন না। কত্তার পাখা চালানোর গতি প্রকৃতি দেখে বোঝা যাবে মেজাজ সপ্তমে না সুরে বাঁধা। ফুর ফুরে হাওয়ায় ফুর ফুরে মেজাজ। মেজাজ বুঝে পাছাপাড় শাড়ির বায়না, সিনেমার বায়না। মঞ্জুর। এই পাখা ঘরে ঘরে বেকারকে সাকার করবে। পাখা ঘুরিয়ে রোজগার করুন। রোজগার করে পাখা ঘোরান। অভ্যাস করলে সারারাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পা দিয়ে পাখা চালানো যাবে। দড়ির এক মাথা কত্তার পায়ে আর একমাথা গিন্নীর পায়ে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা বাড়বে। ঝগড়া কমবে। নির্ভরতার ভাব আরো দৃঢ় হবে! বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা কমবে। সুস্থ সন্তান জন্মাবে। হাতের পায়ের পেটের মাংসপেশী দৃঢ় হবে।

এইবার সেকেণ্ড আইটেম। দুই, রেফ্রিজারেটার। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোনো অফিসের দিনে সকাল এগারটা থেকে চারটের মধ্যে রং করা বিচিলি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রঙিন বিচিলির বেশ বড়সড় একটা টুপি পরিয়ে ফ্রিজটাকে মরাই বানিয়ে ফেলুন। তার ওপর বিছিয়ে দিন আমাদের দেওয়া খস খস। একটা ছোটো বালতি, পিচকিরি আর একটা ঝালর লাগানো লাল পাখাও দেওয়া হবে। ফিচিক ফিচিক করে জল ছিটিয়ে সারাদিন হাওয়া করুন, পালা করে। খসের গন্ধ, ঠাণ্ডা বাতাবরণের তলায় ফ্রিজ। কলের মত ঠাণ্ডা হয়তো হবে না। আইসক্রিম হয়তো জমবে না তবে তরিতরকারি শেষ মাঘের মত শীতশীত আবহাওয়ায় তাজা থাকবে। আইসক্রিম, ঠাণ্ডা জল শরীরের পক্ষে ভাল নয়। ল্যারেঞ্জাইটিস, ফ্যারেঞ্জাইটিস তৈরি করে। ফ্রিজে কারেণ্টও বেশি পোড়ে। ফ্রোজেন ফুড সহজে হজম হয় না। আমাদের উদ্ভাবিত মরাই ফ্রিজে সব কিছু তরতাজা। রাতের শিশিরে মাঠে পড়ে থাকা তরিতরকারির মত এই ফ্রিজে রাখা



টিভিকোরিয়াম

তরিতরকারির স্বাস্থ্যকর। নিখরচার ফ্রিজ—মরাই-ফ্রিজ। বসার ঘরে সাজিয়ে রাখুন, ফোক আর্ট। চালে বসিয়ে রাখুন লক্ষ্মী প্যাঁচা। গৃহস্থের কল্যাণ হবে। মরাই ফ্রিজের নমুনা আমাদের প্রদর্শনীতে ডিসপ্লে করা হয়েছে। দেখে শিখুন। শিখে দেখান।

তিন, রুমকুলারে মুনিয়া পাখি। কুলারের ভেতরের আবর্জনা দূর করে ফেলে দিয়ে, পেছনের জালতি, সামনের শাটারটা রাখুন। এক জোড়া মুনিয়া দিচ্ছি, ছেড়ে দিন ওই রুম-খাঁচায়। সারাদিন চিড়িকপিড়িক, কিচির মিচির। অফিস নয় তো যেন বৃন্দাবন! বাড়ি নয় তো কদম্ব কানন! আমি ঘুমিয়ে পড়ি পাখির ডাকে, সেই ডাকেতেই জাগি। আহা, আহা।

চার, টিভিতে অ্যাকোরিয়াম। মাছের পিত্তি-টিত্তি যে ভাবে বের করতে হয় সেই ভাবে ভেতরের গার্দা ফেলে দিয়ে সামনের স্ক্রীনটা খালি রাখুন। ভেতরে জল ছাড়ুন। পেছনের ফুটো-ফাটায় তাপপি চড়ান। আমাদের দেওয়া রঙিন মাছ ছাড়ুন। টেলিভিসান যেমন দেখার জিনিস, অ্যাকোয়ারিয়ামও তেমনি দেখার জিনিস।

পাঁচ, ফ্লোরেসেন্ট ক্রিম। শীঘ্রই বাজারে ছাড়ছি। অন্ধকার হলেই মুখে হাতে পায়ে মাখুন। অন্ধকারে ঠোকাঠুকি লাগবে না। কার পা কোথায় পড়ছে কোন হাত কোথায় যাচ্ছে সহজেই ধরা পড়বে। কালো কুকুরটাকে ধরে মাখিয়ে দিন।

ছয়, ফ্লোরেসেন্ট থালা বাটি গেলাস বাজারে আসছে! অন্ধকারে খেতে পারবেন। মহিলারা ঠোঁটে ফ্লোরেসেন্ট ক্রিম মাখুন। ঠোঁটও তো খাদ্য। লিখুন—প্রকৃতি দিনের শেষে অন্ধকারের ব্যবস্থাই রেখেছে। এতকাল আমরা যা করেছি ব্যতিক্রম। আলোর বিল যা ছিল অন্ধকারের বিল তারচে একটু বেশিই হবে কারণ অন্ধকার আলোর চে বেশী ঘন এবং তৃপ্তিদায়ক। অন্ধকার ফেল করলে বিরক্ত হবেন না। আমাদের ব্যবস্থায় এখনো একটু আলো লিক করছে।

॥ দুই ॥

মিস্টার তুলপুলে, ওই পাখার জায়গায় আমি আর একটু যোগ করতে চাই। লিখুন—প্রাচীনকালে, হাতপাখার যুগে, স্নেহভালবাসা, সম্মান, বশ্যতা, সখ্যতা প্রকাশের মাধ্যম ছিল, একটি হাতপাখা। গুরু এসেছেন, শিষ্যা আসনে বসিয়ে পাখার বাতাস করছেন। জমিদার এসেছেন জমিদারিতে, নায়েব পাখার বাতাস করছেন। জামাই গেছে শ্বশুরবাড়ি, শাশুড়ী চৌকিতে বসিয়ে হাওয়া করছেন। পাখার বাতাসে কতরকম ভাব মিশিয়ে দেওয়া যেত সে যুগে! বাতাস বলতো, আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, হুজুর প্রাণে মেরো না, ঠাকুর দয়া কর, নাথ! হৃদয়ে এসে লেপ্টে যাও। সেই কৃষ্ণের বাঁশি, যমুনা পুলিনে, সিক্ত-বসনা রাধা, বঙ্গরমণীর নিটোল হাতে চুড়ির রিনিঝিনির সঙ্গে কচি তালপাতার পাখা। এক হাতে পাখা, এক হাতে শ্বেতপাথরের গেলাসে মিছরির সরবত। অহো, অহো। লিখুন, বড় বড় করে লিখুন, ফচকে বিদ্যুতের পাখা আমাদের সনাতন জীবনছন্দের সমস্ত গৌরব হরণ করে নিয়েছিল, আমাদের মেয়েদের হাতের তালপাখা কেড়ে নিয়ে তাদের নারীসুলভ মধুর বৃত্তি উপড়ে নিয়েছিল। ঘরে ঘরে, টঙে টঙে, রঙ চটা, বীভৎস-দর্শন কাঠ কিম্বা অ্যালুমিনিয়ামের ত্রিবক্র, ফ্যারফ্যারে পাখা, ফরফর করে রসকসবর্জিত, স্নেহহীন, বস্তুতান্ত্রিক হাওয়া

ছিটিয়ে, দাঁত বের করে ধনতন্ত্রের মহিমা প্রচার করছে। হাটাও পাখা। লাগাও হাতে ঘোরানো পাখা। সে পাখার হাওয়াতে ভাই মধু আছে, মধুর রসের ত্যারছা পরশ, অথবা শান্ত, দাস্য সখ্য মধুর ভাবের বৈষ্ণব পদাবলী আছে।

এবার সাবহেডিং দিন ॥ পাখাতে চামচে ফিট ॥ পাখাতে চামচে ফিটটা কি ব্যাপার! যা বলছি লিখে যান, লিখে যান মিঃ তুলপুলে, প্রশ্ন করে ভাব চটকে দেবেন না। এই দেশে ছোটো বড় সকলেরই কিছু না কিছু চামচে আছে। দাদা, দাদা করে পাশে পাশে ঘোরে। মালটি হাতিয়ে নিয়ে, আখেরটি গুছিয়ে নিয়ে দাদাকে লেঙি মেরে ড্রেনে ফেলে দিয়ে সরে পড়ে। চামচে মারা দাদার সংখ্যা খুবই কম, দাদা মারা চামচের সংখ্যাই বেশি। আমাদের এই অবিদ্যুৎচালিত কেঠোপাখা চামচেদের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। নেতাদের পাখা ঘোরাতে প্রথম প্রথম অনেক চামচে জুটবে। নিজের চাকরি, বউয়ের মাস্টারি, ভায়ের বেকার ভাতা, রেশানের দোকান, সিমেন্টের পারমিট, বাপের বৃদ্ধবয়সের ভাতা, এটা ওটা সেটা, কিন্তু! কিন্তু যে মাল শেষের সেদিন পর্যন্ত হাসিমুখে পাখা ঘুরিয়ে যাবে বুঝে নিতে হবে সেই নিষ্ঠাবান, স্টেনলেস চামচ। নেতাগিরির সুপবোলে ভুল চামচে ডোবাতে দিয়ে অনেক নেতাই এক-ঋতুতে কেতরে গেছে। এবার একটু ব্রতকথার ঢঙে দুটো লাইন লিখুন—দারুময় কীলক পাখার কত গুণ ভাই, মানুষের চরিত্র করে যাচাই, নারীর নারীত্ব বাড়ায়, প্রেম উড়োখই, তোমরা বাছা, থেকে থেকে, হাঁক মেরো না, শ্যালক বিদ্যুৎ কই! কিরকম হল মিঃ বুলবুলি! মাস্টারপীস, কোথায় লাগে—দান্তে, লোরকা, চসার, মুসুলিনি, এ যেন সিমলেপাড়ার হরিগিরির ডালফুরুলি। ফুরুলি নয় স্যার ফুলুরি। ওই হল হে, ওই হল, যা বাতাসা, তাহাই বাসাতা, যাহা বকস তাহাই বাসক।

এইবার আমাদের পরের পয়েণ্ট। লিখুন, সবচে বড় অভিযোগ, বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে জলও চলে যায়। সহেলী, সহেলী, শহরবাসী, শোনেননি দাদা,



পাখার বাতাস হালকা বাতাস

জলেই যে বিদ্যুৎ থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করে কল্পনা করুন, পদতলে পড়ে ভোলা, বুকে নাচে মহাশ্যামা। জলের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক রে ভাই! উপমাটা উপলব্ধি করুন। বিদ্যুৎও নেই, জলও নেই। জল যদি নাই থাকে খাবড়াও মাৎ। কবি ব্রাউনিংকে স্মরণ করুন—আমি দুঃখে আছি কিন্তু আমার চে দুঃখে আছে আরও কত জন। রাজস্থানের কথা ভাবুন। সাহারা মরুভূমির কথা চিন্তা করুন। ফ্রানসে জলের বদলে ওয়াইন। তবে? তবে ভাই, জলের জন্যে কেন এত হাহুতাশ। লৌহমিশ্রিত কলকাতার পেঁকো জলে স্নান করলে, রেশম চিককন চুলে আঠা হয়, পাক ধরে। ওই জল খেলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয়। জার্মানীতে জলের বদলে বীয়ার। জলকষ্টে মনোকষ্ট, প্রাণ আঁকুপাঁকু আর তখনই জাগবে পুরুষকার, আরো রোজগারের জন্যে হন্যে হবেন। উপার্জন বাড়িয়ে বোতল বোতল বীয়ার খাবেন। নধরকান্তি, রমণীমোহন চেহারা হবে। বাথরুমে জল নিয়ে খাবলাখাবলি না করার ফলে বাত, সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস সহজে হবে না। আর! তবু যদি মনে হয় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে শিশুর আদর্শ অনুসরণ করুন। ভগবান দু হাতে দুটো বুড়ো আঙুল দিয়েছেন, সে কি কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার জন্যে! আজ্ঞে না। অন্ধকারে বসে বসে চুকচুক করে শিশুর মত বুড়ো আঙুল চুষুন। মনটি শিশু শিশু হয়ে উঠবে। মুখে সব সময় ভুবনভোলানো অমায়িক হাসি। জীবাণুযুক্ত জল সরবরাহ বন্ধ করে আমরা দেশের স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকে জোরদার করে তুলছি। স্নানের বদলে শরীরের চামড়ায় সাদা জুতোর ক্রিম মাখুন। জুতোও চামড়া দেহেও চামড়া। অসুবিধেটা তাহলে কোথায়!

এইবার সেই সুচিন্তিত মারাত্মক অনুচ্ছেদটি "সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধি-জীবীদের প্রতি" আপনার। এইবার দিনের সাহিত্য করুন, আর রাতের সাহিত্য নয়, সারা সন্ধ্যে স্পিরিটে স্পিরিটেড হয়ে মাঝরাতে চোরা আলোয়, তান্ত্রিক চোখে, কলমের ডগা দিয়ে যে বস্তু বেরোয়, তাতে খুন থাকে, ধর্ষণ থাকে, মদ থাকে, মেয়েছেলে থাকে, মনোবিকার থাকে। ওসব আর চলছেনি! চলছেনি লিখবো স্যার! ইয়েস, ওসব আর চলছেনি, অপসংস্কৃতি। তামসী রাত্রি, মানুষের স্নায়ুর বাঁধন আলগা করে দেয়, দুর্বল করে দেয়। মনের দরজা খুলে, মেফিস্টো-ফিলিস সামনের চেয়ারে বসে কেবলি অসৎ পরামর্শ দিতে থাকে—গীতা পড়ে কি হবে, পর্নোগ্রাফি পড, লেখাতে সেকস ঢোকা নইলে বাজার পাবি না। ইয়ারকি! অন্ধকারের দাসত্ব কেন করবেন। কেন ফাউস্টের মত আত্মবিক্রয় করবেন। বরং সন্ধ্যে হলেই শিশুর মত দুধু ভাতু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। তারপর সেই ঊষালগ্নে, পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে উপনিষদের ঋষির মত গেয়ে উঠুন, হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যাস্যাপি হিতং মুখং। আবার ফিরে আসুক বেদের কাল, ত্রিসন্ধ্যা কাল, পান্তাভাতের কাল, পাচনবাড়ির কাল, ভন্ ভন্ মশা ও ম্যালেরিয়ার কাল। জাগো ভারত। জাগো বাঙালী। অনেক দিললাগী হয়েছে আর না, ভারত যাহা ছিল তাহাই হইবে।

এইবার তাঁহাদের উদ্দেশ্যে, "যাঁহারা উৎপাদন কমিয়া গেল বলিয়া চিৎকার করিতেছেন" চিললাও মাৎ। যতই উৎপাদন বাড়ুক সব দই মেরে দিলে বড়লোক নেপোরা। দেশের মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষ বেদের কাল থেকেই নটেশাক, তেলা-কুচা ও কদলিকাণ্ড খেয়ে এই সভ্যতাকে পুষ্পিত, পত্রোদ্গত করে এসেছে। মশাই! ওইসব লোহালককড়, গজাল মজাল, দৈত্যের মত যন্ত্রপাতি, গাড়িঘোড়া, মানুষ মারা কল। বনস্পতি বোতলের জল না তৈরি করলেও চলে। কেন!

চালাবাড়িতে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে, মাটির থালে, পাথরের বাটিতে ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়ে বেঁচে থাকেনি! ব্রিজ যখন ছিল না বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে লগবগ লগবগ করে মানুষ খরস্রোতা নদী পেরিয়ে যেতো না! সাঁকোর ওপর যুবতী রমণী আর ইয়া ইয়া কংক্রিট ঢালা বল্টু মারা ব্রিজের ওপর রমণী, কোনটা ভাল! যন্ত্রের শক্তিকে আমরা এতকাল অশ্ব-শক্তি হর্সপাওয়ার দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি। জীবজগতে শুধু অশ্বই আছে কেন, মানুষ কি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী নয়। মনুষ্য শক্তিতেই সব হবে। সবার উপর মানুষ সত্য। অন্ধকারে মনুষ্য উৎপাদন আশা করি ব্যাহত হবে না।

॥ তিন ॥

ওই গন্ধমাদনটা আবার কি! ঘাড়ে করে নিয়ে এলে বিশ্বাস! তোমার কি কোনো সময় অসময় জ্ঞান নেই হে! দেখছো না, জনসংযোগ বিজ্ঞাপন লিখছি।

আজ্ঞে এটাও জনসংযোগ। জনসাধারণের অভিযোগ।

জনসাধারণের অভিযোগ! দপ্তর অধিকর্তা বিকৃত গলায় বললেন—দাও সব ফেলে দাও গঙ্গার জলে। এই কললোলিনী-তিলোত্তমা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিনী ভাগীরথী। সব ব্যাটাই তার অ্যাডভানটেজ নিচ্ছে, আমরা কেন নোবো না বিশ্বাস! করপোরেশান সারা কলকাতার ময়লা ঢালছে। দু'ধারের কলকারখানা, তেল-কালি-ভুসো ছাড়ছে। আকাশ-মানব-মানবীরা দেহনির্যাস ত্যাগ করছে। তুমি বিশ্বাস, এতই অপদার্থ, ওই রাবিশগুলোকে 'গ্যাঞ্জেস ডিসপোজাল' করে দিতে পারছো না! আমার মত একটা সিনিয়ার অফিসারের কাছে বয়ে এনেচো ওই রাস্তার লোকগুলোর কিছু চোতা! জানো, আমি 'ম্যান অন দি স্ট্রীটে'র চে কত ওপরে! জানো, আমি মাসে কত টাকা মাইনে পাই! পাঁচ হাজার মাত্র! আমি তোমার মত বাঙলা খাই না, আগে খাঁটি স্কচ খেতুম এখন খাই দেশী-বিলাইতি। আমার মিসেস, তোমার মিসেসের মত হাত পুড়িয়ে রাঁধে না ডাল পুড়িয়ে গালাগাল খায় না, বিছানা তোলে না, পাতেও না, মশারি খাটায় না। কেন খাটায় না বল তো, দেখি তোমার কেমন বুদ্ধি!

আজ্ঞে, হয় মশা নেই, না হয় মশারি নেই।

হো হো হো। কি বুদ্ধি, কি বুদ্ধি! তোমাদের মত বুদ্ধুরা আছে বলেই আমাদের মত ধূর্তদের রাজত্ব চলছে। বুদ্ধুরা দেশ মে ধূর্তকা রাজ। জানো না মূর্খ, কলকাতায় আর একটি করপোরেশান আছে—যাহার নাম মশা সাপ্লাই করপোরেশান। মনে পড়েছে! রাখুন, আবর্জনাগুলো ওই কোণে। এখুনি একটা ডিকটেশান নিন।

চেয়ারম্যান, মশা সাপ্লাই করপোরেশান, আমাদের অন্ধকার সাপ্লাই করপোরেশানের তরফ থেকে আপনার সুযোগ্য পরিচালনার, আপনাদের সহযোগিতার জন্যে ধইন্যবাদ। ধইন্যবাদই লিখবেন, কারণ চেয়ারম্যানের দেশের উচ্চারণে আমি যতটা সম্ভব কাছাকাছি যেতে চাই। নিন লিখুন। আমাদের অন্ধকার, আপনাদের মশা, কলকাতার জীবনকে স্কচ হুইসকির জ্বালা দিয়েছে। মশা ছাড়া অন্ধকার, অন্ধকার ছাড়া মশা মানায় না। হরের পাশে গৌরী, রাধার পাশে কৃষ্ণ। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা সাপ্লাই করে, ফাইলেরিয়া দিন, ম্যালেরিয়া দিন। কলকাতার মানুষ হাঁটতে চায় না। না হেঁটে হেঁটে মোটামোটা বাবুদের রোগা রোগা পা। একমাত্র

গোদই কলকাতার টপ হেভি মানুষকে মেরামত করে দিতে পারে। কতদিন কেঁপে কেঁপে জ্বর আসেনি। কেঁপে জ্বর, তার ওপর কম্বল, তার ওপর স্ত্রী, তার ওপর কুইনিন, তার ওপর সকালের রোদ, তার ওপর পানসে বার্লি, সে যে জীবনের সেই হারিয়ে যাওয়া স্বাদ! ম্যালেরিয়া না হলে লিভার খারাপ হবে না সহজে। লিভার খারাপ না হলে অনবরত খিদে পাবে। খিদে পেলে, খরচ হলে দেনা হবে। দেনা হলে, দুর্ভাবনা হবে। ভাবনা হলে শরীর যাবে। অতএব এদেশের সমাধান একটাই—অন্ধকার, মশা, মশাবাহিত পদ-গোদ আর ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া হলে পিলে হবে, পিলে হলে ভুঁড়ি হবে, ভুঁড়ি হলে পেট আলগা হয়ে খস খস করে প্যাণ্ট খুলে পড়ে যাবার অস্বস্তি থাকবে না। হাতে হাত মেলান দাদা। দেশের জন্যে আমরা কিছু করে যাই। স্বামীজী বলেছিলেন—দাগ রেখে যা। এসো দাদা—দাগ রেখে যাই। সব জায়গা দাগরাজি করে যাই। হুতোমের ক্যালকাটাকে ফিরিয়ে আনি—দিনে মশা, রেতে মাছি। ঝাঁক ঝাঁক মাছিও বাজারে ছাড়ুন। ওলাওঠা ছিল বলেই না, শরৎচন্দ্র তারাশংকর ভাল ভাল সাহিত্য, চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সেই ওলাওঠা চাই দোস্ত। ঘোর ঘন অন্ধকার কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ওলাওঠা। অন্ধকারে হাহাকার। ফুলের মত খই ছড়াতে ছড়াতে, নেচে নেচে, দেশহিতব্রতী যুবকেরা অনবরতই একের পর এক চলেছে—ব্যালো হরি, হরি বোল। লং লিভ আওয়ার কো-অপারেশান। ইতি, গুণমুগ্ধ।

কি একটা শব্দ হচ্ছে হে, নাকডাকার মত। ওই যে স্যার সায়েব। বল কি হে সায়েবেরও নাক ডাকে! তবে দাও। দাও তবে তোমার নস্যির ডিবে, সশব্দে এক টিপ নি। জাগিও না ওকে। আহা বুড়োকে ঘুমোতে দাও। স্বপন যদি মধুর এত! লে আও ওই রাবিশ আবর্জনা। ওই সবিনয় নিবেদনের কায়দায় সব উত্তর দোবো। নাও কলম ধর।

কি লিখেছেন ভদ্রলোক। পর পর দুমাস একটাকা করে বিল পেয়েছি। বেশ! তৃতীয় মাসে চক্ষু ছানাবড়া। কেন বাবা। দুশো বারো টাকার পেললায় একটি বাঁশ মেরেছেন। লিখুন জবাব—বেশ করেছি। ট্যাঁকে পয়সা নেই, অত আলোর সখ কেন। বেশি তড়পালে মিটার খুলে নিয়ে আসা হবে। দ্বিতীয় অভিযোগ, গত চারমাস মিটার ঘরের চাবিই খুলতে হল না অথচ প্রতিমাসে বেশ কায়দার বিল আসছে, রিডিং ডেট সমেত। ব্যাপারটা ভৌতিক বলেই মনে হচ্ছে। লিখুন, ভগবানে যখন বিশ্বাস আছে, ভূতকেও বিশ্বাস করতে শিখুন। আপনার এলাকার মিটার ইনস্পেকটার, মাস ছয়েক হল পটল তুলেছেন। পয়সার অভাবে গয়ায় পিন্ড দেওয়া হয়নি। সেই ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোক এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কড়া নেড়ে আপনাকে বিরক্ত না করে সেই ইনস্পেকটার রিডিং নিচ্ছেন, আমাদের কমপিউটার বিলও করছে।

তৃতীয় অভিযোগ, আমার চোদ্দ থেকে ষোল হচ্ছিল, ইদানীং চল্লিশে চলে গেছে। লিখুন, এই তো সংসারের নিয়মরে ভাই। আপনার বয়সও তো এক সময় ষোল ছিল, দেখতে দেখতে চল্লিশ কি হল না! জীবনের ধর্মই বেড়ে চলা। চুল বাড়ে, দাড়ি বাড়ে, গাছ বাড়ে, ছেলে বাড়ে, বিলও বাড়ে।

নেকস্ট। সেদিন রাতে মাছের মুড়ো খাইতেছিলাম। ঝপ করিয়া লোডশেডিং হইয়া গেল। স্ত্রী মোমবাতি হাতে যখন আসিলেন তখন দেখিলাম পাতে মাছের মুড়ো নাই। কতদিন পরে একটি ঘৃতযুক্ত মুড়ো পাতে পড়িবার সৌভাগ্য হইল, আপনাদের হৃদয়হীনতার জন্য ভাগ্যে সহিল না। কেলে বেড়ালে মারিয়া দিল।

ফরাসী দেশ হইলে ক্ষতি পূরণের মামলা করিতাম, বাংলা বলিয়া বাঁচিয়া গেলেন। লিখুন—যে দেশের মানুষ একবেলাও খাইতে পায় না, সেই দেশে রাতের বেলা মুড়ো বিলাস! লজ্জা করে না। বেড়াল, বুভুক্ষু জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে উচিত কাজ করিয়াছে। আপনার নাম ও ঠিকানা ইনকামট্যাকসে পাঠাইতেছি। এতকাল ঘুঘুই দেখিয়াছেন এইবার ফাঁদ দেখিবেন, কেমন! মুড়োর পয়সা ডানহাতে আসছে, কি বাঁ হাতে আসছে, এইবার পরিষ্কার হবে।

কি লিখেছেন? বৌ বদল! সে আবার কি রে বাবা! আমাকে যে মেয়ে দেখানো হয়েছিল, বিয়ের সময় লোডশেডিং হওয়ায় আমার জোচ্চর শ্বশুর, অন্ধকারে, প্যান্তখ্যাঁচা বড় মেয়েটাকে পিঁড়েতে বসিয়ে, কায়দা করে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। দোষ কার! এখন আমি কি করব। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা! চুল ছিঁড়বো!

লিখুন—দোষ কারো নয় গো মা। তুমি স্বখাত সলিলে পড়েছো মানিক। আজকাল বিয়ে দুপুরবেলা চেয়ারে বসেই করা উচিত। যা পেয়েছো চাঁদ তার সঙ্গেই মানিয়ে চল। বৌ একটা হলেই হল। ব্যবহার তো এক।

এরপর! অন্ধকারে ঘর ভুল করে ভ্রাতৃবধূর ঘরে...। লিখুন, অসভ্যতা করলে লাইন কেটে ফাঁক করে দোবো রাসকেল। বাকি। সব এক উত্তর—চিঠি পেয়েছি, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। বিদ্যুৎ ঈশ্বরের দান। জবাবদিহি করতে হয় তাঁর কাছে করব। ক্লিয়ার আউট।

সায়েব ও সায়েব। মিস্টার চার্চিল। চোখ চাইতেই তাঁর ঠোঁটে ধরা চুরুট থেকে অটোমেটিক আবার ধোঁয়া বেরোতে লাগল। চলুন আমাদের কণ্ট্রোলরুমে।



শুনুন সংবাদ এইভাবে হয়

দেখাই কিভাবে আমরা অতি সহজে আলো থেকে অন্ধকারে চলে যাই। ওকাকুরার ছবির নিখুঁত ওয়াশের মত। যেন গ্লাইডারে রাইডার!

এই আমাদের কণ্ট্রোলরুম ডিরেক্‌টার। মাসে কেটে কুটে হাজার পাঁচেক পান। সংসার চলে না সায়েব! এসব কাজে মাথা চাই। মাথায় চানকা চাবুক চাই। পেটে না ঢাললে, গ্যাঁজলা মাথায় গিয়ে ধাক্কা মারে না। ধাক্কা না মারলে এদেশে বড় আলস্য লাগে। হা, আ, আউ। দেখছেন হাই উঠছে কি রকম। যাকগে, বলুন, কি দেখাতে হবে! এ'কে অপারেশানটা দেখান তো!

তিনজন ঝকঝকে ল্যামিনেটেড মিটিং টেবিলে বসলেন। চার্টস, ম্যাপস, গ্রাফস। শুনুন, অন্ধকার এইভাবে হয়। পঁচিশ বছরের নিখুঁত একটা পরিকল্পনা চাই। আপনাদের সময় কিছু ডিফেকটিভ ব্যবস্থার ফলে কলকাতার লোক এখনো আলোর উৎপাতে পীড়িত হচ্ছে। সেসব ত্রুটি এখন মেরামত করতে হচ্ছে। জেনারেটারের নাট-বল্টু আলগা করে, টিউবে ছেঁদা করে, বার্স্ট করিয়ে, নানা ভাবে ওই যন্ত্রদের বিদ্যুত তৈরির একগুঁয়ে স্বভাবকে বাগে আনতে হচ্ছে। কি কল বসিয়ে গিয়েছিলেন মাইরি! ভেঙেও শা ভাঙে না।

এরপর পরিসংখ্যান চাই। প্রথমে একটা সমীক্ষা—৭০-এ এই চাই, ৮০-তে এই চাই, ৯০-তে এই চাই। সেসব এমন পণ্ডিতদের দিয়ে করাতে হবে যা হবে, ফার, ফার, ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড, অ্যাকচুয়াল ডিমাণ্ড। এইবার লম্বা চৌড়া প্রতিশ্রুতি, শিল্প এস, ঠেলে এস, ঢেলে এস, সব গ্রামে, জ্বালো জ্বালো আলো জ্বালো। তার মানে মইটি সাপ্লাই কর, ঠেলেঠুলে গাছে তোলো, তারপর হালে 'নো পানি', মইটি সরিয়ে নিয়ে হড়কে পড়।

এইবার কিছু নদী পরিকল্পনা বানাও। সব আধাখ্যাঁচড়া। বিদেশ থেকে, বেশি দামে, বাতিল করা জল বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র এনে ঢোলসহরত করে বসাও। এদিকে শিল্প বানাও। তাহলে কি হল সায়েব—পর্বতপ্রমাণ চাহিদা তৈরি করে মূষিক প্রমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন কর। প্রশাসনের মাথাটা হেভি করে দাও। তলার দিকটা বাঙালীর পায়ের মত লিকপিকে করে রাখো। 'লেবার'রা কাজ করবে, লেঙটি পরে ঝুপড়ীতে থাকবে, আর আমরা থাকবো সুশীতল থার্মস ফ্লাস্কের মত ঘরে, ববি মার্কা বৌ, উডহাউসের ইংলণ্ডের ফ্যাট পিগ মার্কা, একটি কি দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে। শিক্ষাটা তোমাদের কাছেই পেয়েছি। আর সেইটাই হল সব শিক্ষার সেরা শিক্ষা। নিমেষে, অন্ধকারের উৎসটা ওইখানেই।

বসেছে, বসেছি মগডালে, ওরা সব উৎক্ষিপ্ত, অসন্তুষ্টের দল তলা থেকে চালায় করাত, ভারতের এই তো বরাত। করে নিয়েছি লাখ বেলাখ, আর আমাদের পায়টা কে! তোদের ল্যাঠা সামলা তোরা, আমাদের তো দিন শেষ।

কি বুঝলে সায়েব!

চুরুটটা ঠোঁটে রেখে, মোটাসোটা চার্চিল বললেন—সেই আদিসত্য ওরে আমার 'নেটু'—লর্ড সেড—লেট দেয়ার বি লাইট, দেয়ার ওয়াজ লাইট, নাও হি সেজ, লেট দেয়ার বি ডার্কনেস, এণ্ড ডার্কনেস ফর এভার। গুডবাই।

নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন কর

হাটাও। সব হাটাও। দুটো মুটে এনে ওই ফাইলপত্তর সব স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরে দিয়ে এস। আমার দ্বারা আর সম্ভব হল না। তোমার হাতে ওটা আবার কি!

এটা সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ফাইলটা স্যার। পুলিস আউটপোস্টে একটা চায়ের দোকান করার প্রস্তাব এসেছে। আপনি প্রোপোজালটা আজ একবার দেখবেন বলেছিলেন, বলেছিলেন চা আগে, না পুলিস আগে, আমাদের ভাবতে হবে। এক কাপ চা পেটে পড়লে কাজ বেশি হয়, না পেটে পুলিসের রুলের গুঁতো পড়লে কাজ বেশি হয়, না ধান্যেশ্বরী পড়লে হয়, একসপার্ট ওপিনিয়ান নিয়ে দেখবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলুম। ওটাও স্বাস্থ্যদপ্তরে দিয়ে এস। ওসব সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আমার জ্ঞানগম্মির বাইরে। আমি ডাক্তার নই, ইঞ্জিনিয়ারও নই, ওসবের আমি বুঝি কি! এই কমাস ইয়ারকি করতে গিয়ে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে বল তো? অ্যাঁ কি সাংঘাতিক অবস্থা? এই আছে এই নেই। আমার নিজেরই কিরকম আতঙ্ক ধরে গেছে! ফাইলপত্তর দেখব কি? কেবলই মনে হচ্ছে এই গেল, এই গেল। আর যাওয়াটা কিরকম? একেবারে ফচাত করে ঘুড়ি উপড়ে যাবার মত। ছেলেবেলায় ঘুড়ি উড়িয়েছো!

ঘুড়ির কথায় একটা আইডিয়া আমার মাথায় এল স্যার। বলব?

বলে ফেল, বলে ফেল, নিমজ্জমান ব্যাক্তি একটি তৃণখন্ড দেখলেও আঁকড়ে ধরতে যায়। বল, বল।

ব্যাপারটা হল, ঘুড়ি দিয়েই তো প্রথম বিদ্যুৎ ধরা হয়েছিল। মনে পড়ছে আপনার ঘটনাটা! সেই কে এক সায়েব মেঘলা দিনে তারের সুতো দিয়ে ঢাউস একটা ঘুড়ি উড়িয়েছিল!

ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। দি আইডিয়া! তুমি এখনি স্পেশ্যাল ক্যাবিনেট মিটিং কল কর তিনতলায়। বল পনের মিনিটের মধ্যে, মুখ্যমন্ত্রী সো ডিজায়ার্স। কোনও ধানাইপানাই না, কোনও পার্টিগত কোন্দল নয়। বল 'সেভ ওয়েস্ট বেঙ্গল' পর্যায়ে এস ও এস মিটিং। তোমাদের ওই সার্কুলারে বানানটা ঠিক করে দিয়েছো প্রতুল?

কোনটা স্যার।

বড্ড ভুলে যাও তুমি। সেভ বানানটা। বানানটা এস এ ভি ই। কোত্থেকে একটা এইচ আমদানী করে..। ছি ছি, এস এইচ এ ভি ই, শেভ মানে ত কামান, ওয়েস্ট বেঙ্গলকে কামিয়ে ছেড়ে দাও। আমি কি বলেছিলুম—পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাও না কামাও! আমি এনকোয়ারি কমিশন বসাব। দেখি, ধর তো লাইনটা, জাস্টিস দ্বারকানাথ.

তিনি ত বহুকাল মারা গেছেন স্যার?

তিনি মারা গেলেও তাঁর নামে একটা রাস্তা আছে স্যার, সেই রাস্তায় আমার এক বন্ধু রিটায়ার্ড জজ সায়েব আছেন। পুরোটা না শুনেই তোমরা হই হই কর। চোখ-কান খোলা রেখেই ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বাঁচাতে গিয়ে কামিয়ে ছেড়ে

দাও। দেখি ডিরেক্ট লাইনে ধরি।

হ্যালো? হ্যালো? কে সোনালী? ডার্লিং বাপী কোথায়? বারান্দায় বসে হাতপাখার হাওয়া খেতে খেতে আমাকে গালাগাল দিচ্ছেন। যাক পরমায়ু বাড়ছে আমার। শোন, লাইনটা একবার দাও না লক্ষ্মীটি।

হ্যালো জজ সাহেব? হ্যাঁ খুব গরম। গরম গরম থাকাই ত ভাল! শরীরের রক্ত চলাচল বাড়বে। মোটাদের আবার গরম একটু বেশি। মোটা হবার আগে পাওয়ার পজিশানের কথা ভাবা উচিত ছিল। না না লোড শেডিং চলছে চলবে। চলছে চলবেটাই আমাদের ইটার্নাল শ্লোগান। শুনুন, শুনুন, নো রাগারাগি—আমি কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। ইয়েস, অ্যানাদার এনকোয়ারী কমিশন। না না জেনারেটর ভাঙাভাঙি নয়। এবার অন্যধরনের, এস এ ভি ই-সেভকে কারা স্যাবোতাজ করে এস এইচ এ ভি ই-শেভ করেছে তদন্ত করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁচানটা কামান হয়ে গেছে। আরে ভেতরে বিভীষণ, বাইরে ভীষণ, আমাদের ভাবমূর্তি পাংচার করে দিলে। কখন আসবে? কি কখন আসবে? পাওয়ার। ওঃ, কলা দাও মুলো দাও ভবী ভোলার নয়। জানি না, পাওয়ারের ব্যাপার আমি জানি না। আমি ও মাল হেলথ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিচ্ছি। ও আপনি বুঝবেন না। স্বাস্থ্য দপ্তরই এখন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেবে। সন্তান উৎপাদন আর বিদ্যুৎ উৎপাদন—ইয়েস ইয়েস, সেম কপুলেশান থিউরী—হ্যাঁ হ্যাঁ, নেগেটিভ পজেটিভের খেলা।

যাঃ লাইনটা কেটে গেল যে রে শালা! পার্টিবাজী করে করে দেশটার বারটা বাজিয়ে দিলে মাইরি! চল প্রতুল ক্যাবিনেটটা সেরে আসি। মন্ত্রীরা সব আছেন? —আছেন স্যার। —বল কি? —এখন ত থাকবেনই স্যার! মক্কেলদের ত চেনেন। এই একমাত্র জায়গা যেখানে লোডশেডিং হয় না। পাখার লোভে সব চেম্বারে চেম্বারে ঘাপটি মেরে হাওয়ার লোভে বসে আছেন। একজন ত স্যার হোল ফ্যামিলিটাকে ঘরে এনে পুরেছেন।

—সে কি?

—হ্যাঁ স্যার। ওনার ফ্যামিলি গরম সহ্য করতে পারেন না। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হচ্ছে। তোলা উনুন এসেছে। দেখে এলুম বেগুনপোড়া হচ্ছে।

—সে কি হে, সেক্রেটারিয়েটে বেগুনপোড়া!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মন্ত্রীদের সাতখুন মাফ।

॥ দৃশ্যান্তর ॥

বন্ধুগণ, এই জরুরী অধিবেশন ডাকার কারণটা আপনাদের বলি, কাল রাত্তিরবেলা আমার গৃহিণী আমাকে বাড়ি থেকে অপদার্থ বলে দূর করে দিয়েছেন। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান আমার দ্বারা হল না। আমি দেশবাসীকে বলেছি—এটা আমার একার পিতার শ্রাদ্ধ হতে পারে না। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর আমার এমন পোড়াকপাল সকলের মাথার ওপর পাখা ঘোরাবো, নাকের ডগায় আলো ঝোলাবো। মন্ত্রী বলে কি আমি মানুষ নই! আমি সাফ বলে দিয়েছি—নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন কর। মামার বাড়ি নাকি! ওয়ার্ক এডুকেশান চালু হয়ে গেছে, নিজেদের বুদ্ধিতে না কুলোলে নিজের ছেলেকে জিজ্ঞেস কর। স্কুলের দিদিমণিদের কাছে শিখে নাও। কিছু বলার আছে? শিল্পমন্ত্রী

একটু উসখুস করছেন মনে হয়!

হ্যাঁ খুসখুস করছি। দু লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশো বার জন শ্রমিক বেকার হয়ে বসে আছে।

কোথায় বসে আছে?

রকে, গাছতলায়, নদীর ধারে, রাস্তার পাশে, পাড়ার চায়ের দোকানে।

তাদের সাকার করে দিন। শিল্প তো আপনার হাতে!

মালেক, পাওয়ারটা যে আপনার হাতে। বিদ্যুতের অভাবে শিল্পে যে লালবাতি জ্বলছে। উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, দেশ হড়কে যাচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে!

তাই নাকি মশাই। অত সব কাণ্ড হচ্ছে। আমি ভেবেছিলুম মানুষ শুধু ঘেমে যাচ্ছে। গর্তে পড়ে যাচ্ছে। আপনি কী এতদিন নাকে সরষের তেল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন!

আজ্ঞে না। সে গুড়ে বালি। রেশানে যে ক' সপ্তাহ রেপসীড দেওয়া হয়েছিল সেই সময় দু-এক দিন নাকে, নাইকুণ্ডুলে, ব্রহ্মতালুতে, বুড়ো আঙুলের মাথায় দিয়েছিলুম। বাজারের সরষের তেলে আমার ফেথ নেই। সব ভেজাল। আমাদের ব্যবসাদারদের আমি বিশ্বাস করি না। সব চুর, সুয়র, সুয়র!

ও এখন সব সুয়র হয়ে গেল! ইলেকসানের সময় মনে ছিল না, যা দিচ্ছে সব পরে উশুল করে নেবে!

মুখ সামলে!

মুখ থাকলে তো সামলাবো! আমার মুখের কিছু রেখেছেন আপনারা!

এই রে কেন্দ্রের হাওয়া লেগেছে রে!

কে বললেন এই অশ্লীল কথাটা?

আমি বলেছি। কেন, বলেছি তো কি হয়েছে?

বলবেন না।

বেশ করব বলব।

আমি জানি যেখানে মেয়েছেলে সেইখানেই অশান্তি। বৌ ঢুকলেই যৌথ পরিবার ভাঙবে।

তুমি কী স্বপ্ন দেখছ? এখানে আবার নারী পেলে কোথায়? আমরা সব কটাই ত পুরুষ।

আছে ভাই, আছে। তিনি নেপথ্যে বসে কলকাঠি নাড়ছেন।

বাস বাস নো মোর সাইড টকস! কাজের কথা হোক। কোন্দল বড় ছোঁয়াচে জিনিস রে ভাই।

আপনার ওই দু লক্ষ বেকারকে আমি এখনি সাকার করে দিচ্ছি। শিল্পমন্ত্রী বসে বসে নিজের ক্ষতস্থান না চেটে কাজে নেমে পড়ুন। বন্ধুগণ, আমি সরকার পরিচালিত একটি বোমা লাটাই প্রতিষ্ঠান চালু করার প্রস্তাব রাখছি। উত্তেজিত হবেন না। এটা আমার পি-এর মস্তিষ্ক ঢেউ। প্রতুল পরিষ্কার কর।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সমবেত মন্ত্রীমণ্ডলী এবং অদৃশ্য দেশবাসীগণ, আমাদের সামনে আজ সুপরিকল্পিত অন্ধকার। যত বার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে। রাজনীতির ফুসকারে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমাদের স্বায়ত্বশাসনমন্ত্রীর আরও ঘনঘোর ষড়যন্ত্র চলেছে। তাঁর খন্দকার বাহিনী সারা শহর আর শহরতলিতে বড় বড় পিল, গাববু বানিয়ে চলেছে মনের আনন্দে। তিনি কাল্পনিক কোনও যুদ্ধের কথা ভেবেই হয়ত এই পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন

করেছেন।

কি বললে ছোকরা! পেপারওয়েট ছুঁড়ে মাথা ভেঙে দোবো। কেউ আটকাতে পারবে না। কোনও পার্টির সাধ্য হবে না তোমায় বাঁচায়। আমার কাজ আমি করছি। আমি যদি না খুঁড়ি, কে খুঁড়বে! আমার মেসোমশাই! জান না শাস্ত্রে কি বলেছে—যতই খুঁড়িবে ভাই তত পাবে ধন। আমি খুঁড়তে বলি তাই কণ্ট্র্যাক-টাররা পয়সা পায়, সেই পয়সা লেবারের পকেটে যায়, তারপর কিঞ্চিৎ এদিক সেদিক হয়। খননেই লক্ষ্মীলাভ। অত হিংসে কেন হে তোমার। আমি যতই খুঁড়ব আমার স্বায়ত্বশাসনের শিকড় ততই নামবে। তোমার অত চোখ টাটাচ্ছে কেন হে!

না, চোখ টাটাবে কেন? তবে লোকে বড় বিরক্ত হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই ডুব জল, তার ওপর অন্ধকার।

লোক না পোক। যাও শালা লোক না পোক। ছ লাখ মরলেও অনেক ভোটার থাকবে! লোকের আর কি? তারা আমায় পহা দেবে! যে আমায় পহা দেবে তাকেই আমি খুঁড়তে দোবো। যাও, আমার সাফ কথা।

কী রকম অ্যাডামান্ট অ্যাটিচ্যুড দেখেছেন স্যার। এভাবে মিনিস্ট্রী চলে।

তুমি তোমার পরিকল্পনা বলে যাও। কদিন আর খুঁড়বে। সেদিনের আর বেশী দেরি নেই রে বাপু, ভড় ভড় করে সব গর্তে ঢুকে যাবে। ভরাডুবি আমাদের ললাটলিপি।

তা আজ সকালে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে এক সায়েবকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখলুম। তামার সরু তারে ঢাউস ঘুড়ি। সেই ঘুড়ি দিয়ে সির সির করে বিদ্যুৎ নেমে এল।

প্রতুল, প্রতুল এবার আমাকে বলতে দাও! বন্ধুগণ, স্টেট বোমালাটাই অ্যান্ড ঘুড়ি করপোরেশান স্মল স্কেল সেকটারে থাকবে। এককোটি টাকা ইনিসিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট। আমরা লক্ষ লক্ষ বোমালাটাই আর ঘুড়ি তৈরি করে দেশবাসীকে দুগ্ধ বিপণন কেন্দ্র মারফৎ বিতরণ করব। সমস্ত ঘুড়ির গায়ে আমাদের পার্টির সিম্বল থাকবে। প্রত্যেককে ঘুড়ি ওড়াতে হবে, ছেলে বুড়ো জোয়ান মদ্দ। সারা আকাশ ছেয়ে যাবে ঘুড়িতে। কেবল মনে রাখতে হবে—প্যাঁচ খেলা চলবে না। নো প্যাঁচ। নো ভোমমারা বলে চিৎকার।

অবজেকসান।

কি হল আবার!

ঘুড়িতে শুধু আপনার পার্টির সিম্বল থাকবে কেন? মামার বাড়ি নাকি। সব পার্টির সিম্বল থাকবে। নির্বাচনে যে পার্সেণ্টেজে সিট ভাগ হয়েছিল, সেই ভাগে সিম্বলঅলা ঘুড়ি তৈরি হবে।

না, তা কেন! ইন দি মিনটাইম আমাদের পার্টির স্ট্রেংথ অনেক বেড়ে গেছে। সেদিনের র‍্যালিই তার প্রমাণ। ফর্টি পার্সেণ্ট ঘুড়িতে আমাদের পার্টির সিম্বল বসাতে হবে।

আস্তে আস্তে। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। মুখ্যমন্ত্রী তো ঘুড়ি ওড়াবেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর জ্ঞান নিয়ে বিদ্যুৎ আসবে কিভাবে একটু ব্যাখ্যা করবেন কি!

প্রতুল ব্যাখ্যা বানাও।

স্যার, ফাঁসি গেলা। আই মিন ফেঁসে গেছি। ঘুড়িটা বিদ্যুতের প্রমাণ মাত্র। শুধু তাই নয় ঘুড়ি দিয়ে বিদ্যুৎ ধরার জন্যে ঝড়বৃষ্টি চাই, বজ্রপাত চাই। ঘুড়ি

পরিকল্পনা বাতিল স্যার।

বাতিল কেন? অত সহজে হেরে যাবে কেন? রোজই ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে আর বজ্রপাতের রেকর্ড তো খারাপ নয়, ভেরি ফেভারেবল! এই তো সেদিন গোটা কতক কুপোকাত হয়ে গেল। প্রয়োজন হলে আমরা আর একটা লেজুড় পরিকল্পনা নিতে পারি। ভুলে যেও না এটা বিজ্ঞানের যুগ। আমরা যদি বঙ্গোপসাগরে অনবরতই একটা নিম্নচাপ তৈরি করে রাখতে পারি তাহলেই তো মার দিয়া কেল্লা।

তা হলেও স্যার ওই ঝটিতি বিদ্যুৎ কিভাবে কাজে লাগাবেন। বই লিখছে, সাহেব শক খেয়ে মাটিতে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর উঠেই ধেই ধেই করে নৃত্য করতে লাগলেন।

তা হলে আমার আর একটা পরিকল্পনা আছে। সেটা করতে পারলে—ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। বন্ধুগণ, আপনারা জোনাকি দেখেছেন?

আপনি কি জোনাকির চাষ করতে বলছেন, তাহলে গোবরের প্রোডাকসান কিন্তু বাড়াতে হবে!

পুরোটা শুনুন তারপর ফ্যাচর ফ্যাচর করবেন। যত থার্ড ক্লাস এম এ আর এম এল এ-তে দেশটার বারটা বাজিয়ে দিলে।

অবজেকসান!

নো অবজেকসান। আমার মুখ খুলে গেলে কারুর তোয়াককা করি না। হ্যাঁ জোনাকি, সে জোনাকি! আমার বেসিক প্রশ্ন হল, জোনাকি যা পারে মানুষ চেষ্টা করলে তা পারবে না কেন?

মানে পেছনে আলো, মানে পেছন দিয়ে আলো বের করা!

এগজ্যাকটলি সো। জোনাকিকে ভাল করে অবজার্ভ করতে হবে। দেখতে হবে তার ফুড হ্যাবিট। বন্ধুগণ, প্রয়োজন হলে আমরা সমস্ত লোককে ধরে ধরে ফসফরাস খাইয়ে দোবো। খুব সোজা কাজ। দেশলাইকাঠিতে ফসফরাস আছে। রোজ লোকে ভিটামিন ক্যাপসুল খেতে পারে, নিজেদের স্বার্থে এক বাকস দেশলাই খেতে পারবে না! খুব পারবে। এটাই হল আমার নিজের বিদ্যুৎ নিজেই উৎপাদন করার পরিকল্পনা। হেলথ, আপনারা চ্যারিটেবল হাসপাতালে এটা পরীক্ষা করে দেখুন ত।

কিন্তু স্যার পেছনে আলো বের করে লাভ কি। মানুষ ত মটরগাড়ি নয় যে ন্যাজে পিকপিক করে লাল আলো জ্বললে সুবিধে হবে! ওই আলোটাকে কোনও ক্রমে সামনে আনা যায় না!

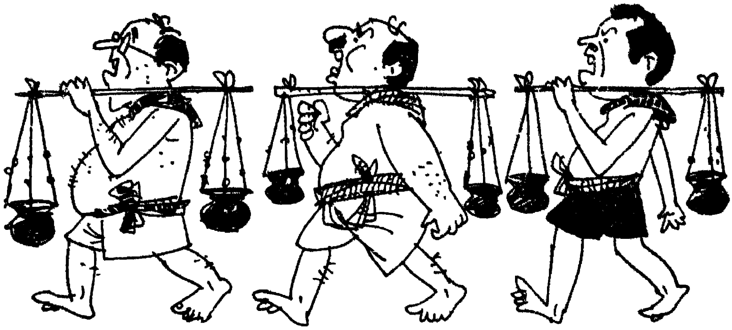
খামোশ! আপনার পেছনটা যদি আমার সামনে থাকে তা হলেই ত আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের টেবল ল্যাম্প! নয় কি! হ্যা হ্যা বাবা, দিস ইজ কমানসেনস!

আমার কাছে আর একটা পরিকল্পনা আছে স্যার!

বলে ফেলুন।

আমরা কিছু ড্রাগন ইমপোর্ট করি। একটাকে চৌরঙ্গির মোড়ে চিৎ করে ফেলি। মুখটা আকাশের দিকে। লোহার স্ট্র্যাপ আর বল্টু দিয়ে রাস্তায় ফিট করে দি। ন্যাজটা জেব্রা লাইনের মত পেতে রাখা হোক। ন্যাজে একটা ট্র্যাফিক পুলিসের ডিউটি ফেলে দিন। অনবরত ন্যাজে পাম্প, মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে আগুন। উঃ আলোয় আলো।

আর একটাকে ফেলি শ্যামবাজারের মোড়ে। ইমপর্টান্ট মোড়ে মোড়ে একটা



ভোলাবাবা পার করেগা নইলে—বাবা ঘেরাও হোগা

করে ড্রাগন।

হবে না, হবে না। ড্রাগন যে দেশের জন্তু সে দেশের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল নেই। ড্রাগন আমরা আনতে পারব না। বাতিল, বাতিল।

কেন বাতিল! আমরা কি কেবল একটা দেশের কাছেই মাথা বিকিয়ে থাকব। নো নেভার। সব সব দেশই আমাদের কামিয়ে যাক।

আই সি। ইউ আর দ্যা কালপ্রিট। আপনিই সেই বিভীষণ, যে এস এ ভি ই-কে এস এইচ এ ভি ই করে দিয়েছেন। এর নাম কৃতজ্ঞতা! তাই না।

একি, একি? কার কুকুর! কুকুরই তো। ক্যাবিনেট মিটিঙে কুকুর? স্ট্রেঞ্জ।

আমার কুকুর! আয় আয় লুসী, লুসী। কেন কি হয়েছে! যুধিষ্ঠির কুকুর নিয়ে স্বর্গে যেতে পারে আর আমি আমার লুসীকে নিয়ে দপ্তরে আসতে পারি না! কী বলে রে লুসী। আমার এই কুকুর গরম একদম সহ্য করতে পারে না। সাইবেরিয়ার মেয়ে। তাই ত আমার কুলার লাগান ঘরে থাকে। মাই ফেথফুল ডগ। কুকুরের ভোটাধিকার থাকলে আমাদের গণতন্ত্রের চেহারাটাই পালটে যেত। প্রতি ইলেকসানের সময় আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বসতে হত না। লুসী, লুউসী।

শেষ প্রস্তাব। মুখ্যমন্ত্রী! আমি হুগলীর লোক। আমার জেলাতেই মহাপীঠ তারকেশ্বর। শ্রাবণ চলে গেল, তা হলেও, চলুন আমরা সকলে বাঁক ঘাড়ে করে কলকাতা থেকে হাঁটাপথে ব্যোম, ব্যোম করতে করতে বাবার কাছে একবার যাই। গিয়ে ধড়াস করে বডি ফেলে দি। কত লোকের গোদ সারল, কার্বাঙ্কুল চুপসে গেল, বন্ধ্যা, মৃতবৎসার সন্তান লাভ হল, আমরা কি এমন পাপ করেছি যে বাবা আমাদের উদ্ধার করবেন না! কিছুই তো তেমন চাইছি না, চাইছি কয়েক শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। বাবার শক্তিই বাবার কাছে ধার চাইছি। বাওয়া সব থেকেও আমাদের কেন এই কাঙালের অবস্থা। ভাই সব একবার হেঁকে বলুন—ভোলাবাবা পার করেগা, ভোলে বোম, তারক বোম, বোম, বোম তারক বোম। কি হল! সব চুপ!

মোস্ট থার্ড ক্লাস সাজেসান! এরপর বলবে তন্ত্রসাধনা কর ভৈরবী নিয়ে। মিটিং শেষ। আমাদের ওই এক শ্লোগানই চলুক নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন কর।

সম্প্রতি এই রকম একটি ক্যাবিনেট মিটিং হয়েছিল কী?

গাছতলায় কিছু লোক

গোটা পঞ্চাশ লোক হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে ওই গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে আছে কেন হে?

ও তো রোজই থাকে স্যার। স্বাধীনতার পর থেকেই আছে। চেহারাটাই যা কেবল পাল্টাচ্ছে। গাছের ডালে থাকে পাখি আর তলায় থাকে বাকি।

তোমার কাছে কবিতা শুনতে চাইনি, কারণ জানতে চেয়েছি। কেন ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে ওইভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে? এটা কি চিড়িয়াখানা!

না স্যার, চিড়িয়াখানা কেন হবে! সে তো আলিপুরে। এটা হল মন্ত্রীখানা—সিট অফ পাওয়ার, না, না, সিটাডেল অফ পাওয়ার। পাওয়ারপ্ল্যাণ্ট স্যার। পাওয়ার প্ল্যাণ্ট।

তোমার কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। গাছের তলায় ক্লান্ত মানুষ আমি বুঝি, কিন্তু হোয়াট ইজ দিস? বিয়েবাড়ির বাইরে কাঙালের মত



তোমার কাছে কবিতা শুনতে চাইনি, কারণ জানতে চেয়েছি

রোজ রোজ এক গাদা লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেন থাকবে, কি জন্যে থাকবে? আমরা কি ফিল্মস্টার না পওহারী-বাবা। হেমা মালিনীর মত এক ঝলক নেচে যাবো, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দুবার হাত ঝেড়ে দোবো! মোস্ট অস্বস্তিকর। যতবার বাথরুমে আসছি যাচ্ছি, একবার করে চোখ পড়ে যাচ্ছে—ফ্যালফ্যালে একসার মুখ রোগা, লম্বা, মোটা, হোঁতকা নানা ডিজাইনের মানুষ।

ভুলে যান না ওদের কথা। সন্ধ্যে হলেই চলে যাবে! আপনার কাজ আপনি করে যান।

তোমরা সব ব্যাপারটাকেই বড় সহজ করে নাও। সবসময় তোমার দিকে যদি জোড়া জোড়া চোখ তাকিয়ে থাকে, একটা অস্বস্তি লাগে না? পারফোরেটেড ঘরে কেউ বসবাস করতে পারে! পারফোরেটেড মশারিতে কোনওদিন শুয়ে দেখেছো!

যদি রাগ না করেন তো একটা কথা বলি।

বলতে আর বাকি রেখেছো কি। তুমি বলছ, কাগজ বলছে, রাম বলছে, শ্যাম বলছে, গরু বলছে, ভেড়া বলছে, স্বজন বলছে, দুর্জন বলছে, চীন বলছে, জাপান বলছে ..।

নিজেকে স্যার ক্যাবারে ড্যানসার ভেবে চুপচাপ বসে থাকুন। জোড়া জোড়া চোখ অবলেহন করে চলেছে, এতটুকু কর্পান, ইয়েতে এটুকু কাপড়, ধিতিং ধিতিং করে নাচছে। আপনি হলে তো স্যার পায়ে-পায়ে জড়িয়ে পড়ে যেতেন।

কী উপদেশই দিলে? কোথায় মন্ত্রী, কোথায় ক্যাবারে ড্যানসার! অর্ধোও-ওলঙ্গ নর্তকী নেচে চলেছে লাস্যলোভী, কামনারঞ্জিত, নেশা ঢুলুঢুলু চোখের সামনে ইন্দ্রিয়কে উসকে দেবার জন্যে। হোয়্যার অ্যাজ মন্ত্রী! মন্ত্রীর ফাংসান কী! দেশকে সুন্দরভাবে শাসন করা। মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা। দেশকে ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে প্রগতির শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া! বাবারে! পড়ে যাবার মত হচ্ছিল। চেয়ারটার স্প্রিংটা একটু কমজোর হয়ে গেছে। আবার বোধহয় ওয়েট গেন করছি হে। মন্ত্রী হলেই দেখবে ওজন বাড়তে থাকবে। এরকম একটা ফ্যাটি প্রফেসান তুমি দ্বিতীয় আর পাবে না। ফ্যাটলেস, লো-কোলেসটোরাল মন্ত্রীত্ব কোথায় পাওয়া যায় বল তো!

রোগা মন্ত্রী খুব কম দেখা যায় স্যার! বিদেশী মন্ত্রীদের যেসব ছবিটবি দেখি, গাল ভাঙা, কণ্ঠা বেরোনো মন্ত্রী বড় একটা দেখা যায় না। আসলে মন্ত্রীত্বটাকে হজম করতে পারলে মোটা হবার ভয় থাকে না। আপনার স্যার বদহজম হচ্ছে। অ্যাসিড হয়ে যাচ্ছে।

যাঃ আমি কী নতুন মন্ত্রী হয়েছি নাকি! আমার রক্তে মন্ত্রী, ঘর্মে মন্ত্রী, মন্ত্রীর "জিন্স" আমার দেহকাণ্ডের কোষে কোষে। তুমি বলছ—বদ হজম?

হ্যাঁ বদহজম। তা না হলে গাছতলায় কটা লোক দেখে আপনার এমন চিত্তবিকার হত না। জাত মন্ত্রী হবে জাতসাপের মত। নিজের খেয়ালে এঁকে-বেঁকে চলবে। লোকে ভয় পেয়ে লাফিয়ে পালাবে। মাঝেমধ্যে ফ্যাঁসফোঁস করে দু একটা ছোবলটোবল মারবে। তা না, দেশ দেশ করে হেদিয়ে পড়লেন। দেশটা কি আপনার পিতার সম্পত্তি!

পিতার কেন হবে? আমার পার্টির সম্পত্তি। আপাতত আমার পার্টির সম্পত্তি। ইজারা সিসটেম। দেশ কত পবিত্র জিনিস! দেবালয়ের মত। মন্দিরের

মত। জানো তো বড় বড় মন্দিরে সেবায়েতদের ঘর ভাগ করা থাকে। এ তরফ একবার সেবার ভার পায় তো, ও তরফ আর একবার পায়। দু তরফে লাঠালাঠি হলে অ্যাডমিনিসস্ট্রেটার বসে যায়। তখন নেপোরা মারে দই।

সেই ভাবেই সেবা করুন। কলাটা মুলোটা, ফলটা ফুলুরিটা যা দিয়ে যাবে তিনের চার ভাগ মেরে দিয়ে সিকি ভাগ সিঁদুর মাখিয়ে ছোপ ছোপ লাল করে একটা জবা দিয়ে ঝেড়ে দিন—উড়ো খই গোবিন্দায় নম।

সেই খই ধরার জন্যে একগাদা গোবিন্দ যদি সত্যি সত্যি রোজ এসে গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে থাকে কেমন লাগে! বল কেমন লাগে! আজ আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। আমি জানতে চাই, দেখতে চাই, কী করলে ওই গাছতলাটা ফাঁকা করা যায়। গাছ থাকবে, ডালে ডালে পাখি থাকবে, তলায় একটা দুটো পাগল কি ভ্যাগাবণ্ড থাকবে থাকুক, কিন্তু ওই খালাসির মত চেহারার লোকগুলো থাকবে না। তুমি একটা স্পেসিমেনকে ওপরে তুলে আন। দেখে শুনে আনবে। যেভাবে মাছ কেনে সেই কায়দায় আনবে—বেশি কাঁটা থাকবে না, বেশি তেল যেন না থাকে। ধাতে সয় এমন জিনিস আনবে। একেবারে টাটকা যুবক আনবে না, ধ্যাড়ধেড়ে বুড়োও আনবে না। বেশ হাবাগোবা মাঝবয়সী পোড়া পোড়া রোস্টেড ধরনের, ওয়েল বেকড একটা জিনিস তুলে আন। সে আমাকে দেখুক, আমি তাকে দেখি। দেখাদেখি করে দেখি দেশটা কোথায় আছে! ওপরে, নিচে, মাঝে না কি রসাতলে?

॥ দৃশ্যান্তর ॥

এই যে স্যার বঙ্কুবাবুকে তুলে এনেছি। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি। স্পেসিমেনে স্পেসিমেন মিলিয়ে। এই দেখুন ওষ্ঠে তাম্বুল রেখা, গণ্ডে ঘর্মবিন্দু, প্যান্টের পাশ পকেটে টিফিনের মোড়ক। শরীরের মধ্যদেশে আলস্যে অর্জিত বদহজমে লালিত চর্বি।

হয়েছে। হয়েছে। আর শুনতে চাই না। তুমি যাও। বসুন আপনি।

কতদূরে বসব স্যার। সারি সারি চেয়ার। কোন্ সারিতে বসব বলেন।

স্কুল কলেজে কোন্ সারিতে বসতেন?

একেবারে লাস্টে স্যার।

হুঁ। কী করেন আপনি?

সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরি।

হুঁ, তার মানে বড়কর্তাদের ঘরে ঢুকলে বসতে বলে না দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়।

রাইট স্যার। দাঁড় করিয়ে রেখে টেলিফোনে অনর্গল কথা বলে যেতে থাকে। একটা ফোন নামিয়ে আর একটা ফোন তোলে। কখনও বাথরুমে চলে যায়। কখনও ফাইফরমাশ খাটায়—অ্যাই ডাইরেক্টরিটা আনুন তো, এই কাগজটা মিত্তিরকে দিয়ে আসুন তো, প্রশান্তকে ডাকুন তো, যত সব অপদার্থ বেহেড, ইডিয়েট!

হুঁ নুন, সুন, কুন বলে না সো, কো নো বলে, ভাল করে অবজার্ভ করেছেন কি? এই যেমন আমি বেশ জোরের সঙ্গেই এন বললাম। ইচ্ছে নেই তবু বললুম। সম্মান দেখাবার জন্যে নয় কিন্তু, জাস্ট ভদ্রতা। এমপ্লয়ার হল প্রভু,

এমপ্লয়ী হল দাস। দাস ব্যবসায় খাতিরফাতির নেই। আমিও সাইকোলোজিক্যাল কিছু লোককে ওইভাবে ছোট করে, ক্রীপল করে দিতে চাই। এর নাম ল অফ ক্রিপলিং।

নিউটনস ল-র মত এরও কি স্যার, ফার্স্ট ল, সেকেণ্ড ল, থার্ড ল আছে?

ওসব আমি পড়িনি ভাই, বলতে পারবো না। আপনি তৃতীয় সারির তিন নম্বর চেয়ারে বসুন। তার আগে এদিকে আসুন, দেখি, জিভ দেখি। হুঁ। দাঁত? হুঁ। চোখের সাদা অংশটা টেনে দেখি। হুঁ। যান বসুন।

কী দেখলেন স্যার? কেমন আছি?

মধ্যবিত্তের যেমন থাকা উচিত। জিভে কোটিং, দাঁতে কেড়িস, চোখের কোণে কালি, সামান্য অ্যানিমিয়া। পেটটা বড়। দেখলে মনে হবে নাদুসনুদুস বাবুটি, ভেতরটা ফোঁপরা। ইন ফ্যাকট আমরা এই ধরনের কিছু ভোটারও চাই।

কেন স্যার? আমরা কিরকম ভোটার?

আর্মপিট ভোটার।

সে আবার কি!

যে ভোটারদের বগলে চেপে রাখা যায়। ময়দানে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের আগে শুধু একবার হেঁকে ডেকে বলব—বন্ধুগণ শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। যাঁরা এখন ক্ষমতায় আছেন তাঁদের ঠেলে ফেলে দেবার শক্তি আমাদের হাতে দিন। মধ্যবিত্ত বাঙালীরা একটু অভিমানী হয়। সেই অভিমানটাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় আমরা জানি। একে বলে দোল দোল নাগরদোলা সেণ্টিমেণ্ট। গণেশ শুধু উল্টে দাও। ও ব্যাটারা ক্ষমতায় আছে, ও খুব আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, ছিলে রকে বসে আমার বৌকে বৌদি বৌদি করতে, চা-চানাচুর ওড়াতে, হঠাৎ এম এল এ হয়ে আর চিনতেই পার না ন্যাপলা! আই সি! অমুক মন্ত্রী হয়ে তমুককে রাজা করে দিয়েছে! তখনই মনুমেণ্টের তলায় কণ্ঠস্বর—বন্ধুগণ, এই দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুণ ধরা প্রশাসনকে পাংচার করে দিন, ফ্যাকচার করে দিন। চলবে না, চলবে হে হে না। জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! ব্যাস ফ্যালার আনন্দে ফেলে দাও। নামিয়ে দে, নামিয়ে দে। যেই যায় গদীতে সেই হয় সম্বন্ধী।

এটা স্যার কি ধরনের রাজনীতি!

একে বলে—মেরি গো রাউণ্ড পলিটিকস। আজ রামুর দল ওপরে, কাল শামুর দল ওপরে। সেই নাগরদোলাটা ঘোরাবার জন্যে আপনাদের প্রয়োজন। আপনাদের মনটাকেও তো সেইভাবে তৈরি করতে হবে--আই মিন করে দিতে হবে—পরশ্রীকাতর, হীনমনা, অনুদার, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, ভীরু, বারফট্টুর সবসময় একটা আনহেলদি লুক, হয় ঢ্যাপসা, না হয় শুঁটকে, হয় লো প্রেসার না হয় হাই প্রেসার, হয় মিনমিনে, না হয় ঘিনঘিনে কলতলার শ্যাওলার মত।

আমরা আর কদিন আছি স্যার!

ক'বছর হল? শ' দুয়েক বছর হল তো! এগজ্যাকট বলতে পারছি না, শুনেছি ছারপোকা বাঁচে অনেকদিন! তাহলে আসি স্যার! যাই গাছতলায় গে দাঁড়াই! আমাদের অনেক কষ্ট স্যার। সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন না টাকের ওপর পাখিতে কতবার হোয়াইটওয়াশ করে দিয়েছে!

তা গাছতলায় দাঁড়ালে দুঃখু চলে যাবে! আন্দোলন ছাড়া কিছু হয়! আন্দোলন করুন।

নেতা নেই স্যার। যেমন তেমন একটা নেতা চাই তো। আমরা অনেক কথা

বলতে আসি। পুলিস বলে চুপ করে গাছতলেমে খাড়া হো যাও। আমরা দাঁড়াতে দাঁড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের তখন নিজেদের ওপর রাগ হতে থাকে। প্রথমে বলি—ধ্যুস শালা। তারপর বলি ধ্যাত শালা। তারপর বলি—শালা বাঙালী। তারপর বলি—জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। তারপর আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন ফিসফিস করে বলে ওঠে—একটা রেভলিউসান না হলে কিছু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ হেসে ওঠে—এদেশে বিপ্লব ভ্যাঃ। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে ওঠেন—অশিক্ষিতদের দেশে ডেমক্রেসী চলে? একজন ডিকটেটার চাই, একজন ডিকটেটার, সব চাবকে ঠিক করে দেবে। তখন কেউ না কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আর ডিকটেটার, ভ্যাঃ শালা ডিকটেটার। কোথায় পাবে ডিকটেটার? একি জার্মানী, না ইতালি, না ইউ এ আর। তারপর আমরা একে একে যে যার জায়গায় চলে যেতে থাকি। তেমন তো যাবার জায়গা নেই, বেশ মনের মত জায়গা। তেমন মাল্‌ পার্টিফার্টি পেলে সেইসব জায়গায় যাওয়া যায়। আর তা না হলে সেই গৃহগণ্ডী! সেই গৃহিণীর তিরস্কার সারা জীবনের পুরস্কার।

মন্ত্রী ক্যাঁক ক্যাঁক করে বেল বাজালেন। পি এ ঘরে এলেন।

শোনো, স্পেসিমেনটা তুমি ভালই তুলে এনেছো হে। মনে হয় পঁচিশ থেকে তিরিশের প্রোডাকট।

কত সালে নেমেছেন?



তোমাব আসন শূন্য আজি

নেমেছেন মানে?

ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

আঠাশ সালে।

তার মানে বুঝেছো আদর্শ মধ্যবিত্ত। ওই ওদের বিপ্লবটিপ্লব কিছু দেখেছে। বাড়ীর দেয়ালে ছেলেবেলায় গান্ধী, বিবেকানন্দ, নেতাজী প্রভৃতির ছবি দেখেছে। মা কালীর ছবি দেখেছে। চক্রধারী নারায়ণ দেখেছে। কী দেখেননি?

আজ্ঞে হ্যাঁ তিন কিসিমের কালী দেখেছি। কালীঘাটের কালী, যশুরে কালী, তার তলায় আবার লেখা আছে—যশোর নগর ধাম, মহারাজ প্রতাপাদিত্য নাম। মা দুর্গা আছেন, পোকায় বিঁধ বিঁধ ফুটো করে দিয়েছে, আর একটা গণেশ আছে। হ্যাঁ রাম, লক্ষ্মণ, সীতার গ্রুপ ফটো আছে। যখন ওঁরা দণ্ডকারণ্যে ছিলেন সেই সময় তোলা।

তোলা নয় আঁকা। রামের আমলে ক্যামেরা ছিল না। সরষের তেল মেখে চান করেন?

হ্যাঁ স্যার!

দেখো তো পি এ জামার কলারটা।

তেলের দাগ, ঘামের দাগ, সাদা সাদা ফাঙ্গাস।

দেশ কোথায় ছিল? এপারে, না ওপারে?

এপারেই ছিল। বিবাহ ওপারে।

তার মানে ডবল মৃত্যু! মধ্যবিত্তের বিয়ে, তার ওপর কালচারে মেলেনি। আপনার তো অভিযোগ থাকবেই। তবু শোনা যাক। পি এ তুমিও বস। আজ এক হাত হয়ে যাক। ধুতি পরেন না কেন?

খরচে কুলোতেও পারবো না, সামলাতেও পারবো না।

বাড়ীতে কি পরা হয়, লুঙ্গি?

হ্যাঁ স্যার!

টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত। ইস্যু কটা?

তিন স্যার। দু মেয়ে, এক ছেলে।

পিতার কটি ছিল?

সাতটি স্যার।

বুঝেছো পি এ, বেপরোয়া ভাবটা কেটে এসেছে, এখন সব বাঁচার ইচ্ছে। হিসেবটিসেব করে সংসার করবে। কত হিসেব করবে মানিক! তোমাদের কাছা-কোঁচা খুলে ছাড়বো। দালাল কো হালাল কর।

আমরা দালাল স্যার? দালাল বললেন?

অফকোর্স! কেন মারবেন নাকি?

না মারবো কেন? বড় দুঃখ হল। শব্দটা তো তেমন ভাল নয়।

হা হা হা, বুঝলে পি এ সেই মধ্যবিত্তের মানসম্মান বোধ! পিক্যুলিয়ার। আপনার বাবা বলতেন না, খাই না খাই, মাথা উঁচু করে থাকতে চাই। কেউ দুটো ছোটোবড় কথা বলে যাবে এ আমি টলারেট করব না।

ঠিক বলেছেন স্যার। শেষ দিন পর্যন্ত ওই এক কথা ছিল—কারুর কাছে মাথা নিচু করিনি, তোমরাও করবে না। তেমনি নিষ্ঠাবানও ছিলেন। দুবেলা সন্ধ্যাহ্নিক।

কী করতেন?

রেলে চাকরি।

বুঝলে পি এ সেই কেস। অফিসে বড় সায়েবের লাথি। হ্যাঁ স্যার ইয়েস স্যার নো স্যার। বাঁধা মাসমাইনে। এদিকটা টানে তো ওদিকটা খুলে যায়। মাথাই নাই তো মাথা উঁচু! যত অসহায় ভাবটা বাড়ছে, ততই সন্তান সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ততই জপতপ, হ্যান্যা ত্যান্যা। হাবুডুবু লোকের ভেসে থাকার চেষ্টা। স্যার স্যার করছেন কেন তখন থেকে? কে বলেছে স্যার বলতে?

ভয়ে বলেছি স্যার!

কিসের ভয়! চাকরি চলে যাবার ভয়! একে বলে মধ্যবিত্তের ভয়। আমরা তো আপনাদের ভয়েই রাখতে চাই। ভয়ে ভয়ে সবসময় আধমরা হয়ে থাকবেন আপনারা। তা না হলে ফাংসানাল ডেমক্রেসী চলবে কি করে। ভয়টা রক্তের সঙ্গে মিশে থাকবে হেমগ্লোবিনের মত। আচ্ছা আসুন মধ্যবিত্তের ভয়ের একটা লিস্টি করা যাক।

রাজাজীকা দো শিং

আসুন তা হলে ভয়ের লিস্টিটা করে ফেলি। পি এ তুমি একটা কাগজ নিয়ে বস। নোট নাও।

কার ভয় স্যার!

আপনার ভয়, আপনার ভয়। কতরকম ভয়ে আপনি আধমরা, জানতে চাই। বেশ ভেবে চিন্তে ধীরে ধীরে বলুন।

কত বছর বয়েস থেকে নিজেকে ধরব স্যার—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়...

যৌবন থেকে ধরুন, ঠিক যে বয়েসে টোপর মাথায় দিয়ে ছাঁদনাতলা হয়ে বাটিতে উথলানো দুধ দেখতে দেখতে সংসার সমবাঙ্গনে টেঁপীর হাত ধরে প্রবেশ করলেন। আপনার হাতে একটি মাকু দিয়ে বলা হল—হাতে দিলাম মাকু ভ্যা কর ত বাপু। সেই ভ্যা করার দিন থেকে কি ভাবে ভ্যা-ভ্যা করতে করতে জীবনের এই পর্যন্ত এলেন তার ওপর একটি রচনা তৈরি করুন।

টেঁপী কে স্যার?

মধ্যবিত্তরা আমাদের চোখে সব ট্যাঁপা আর টেঁপী।

আপনারা কে স্যার?

আমরা ছিলাম মধ্যবিত্ত। নেতা হয়ে হলাম উচ্চবিত্ত। মন্ত্রী হয়ে হলাম বিত্তের বিত্ত। আমরা আসলে 'নেপো ক্লাস'। দই পাতবে তোমরা, চেটেপুটে মেরে দোবো আমরা।

ক্যানো এমন করবেন?

বেশ করব, আমাদের খুশি। আমরা পিঠ বেয়ে উঠি তারপর কাঁধের দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসি। যার শিল যার নোড়া আমরা তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া। আমরা হলুম গে ক্রিয়েশান।



কঠোর শ্রমেব বিকল্প নেই

কার ক্রিয়েশান?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না হরিচরণ ভাই। ভাইয়া আমার, সেইটাই তো মিসট্রি। ওহে বল না রাধেশ্যাম, আমরা কী জনগণের সৃষ্টি! আমরা কী ধনবানের সৃষ্টি! দ্যাখো তো কোঁচার খুঁটে কোথাকার স্ট্যাম্প! মেড ইন, ইউ এস এ! চায়না! ফ্রান্স! জার্মানী! ইতালি!

হরিচরণ তো আমার নাম নয়। আমার নাম বঙ্কুবিহারী।

ওই হল, ওই হল, যে রাম, সেই কৃষ্ণ, দুয়ে মিলে রামকৃষ্ণ। আমাদের ওরিজিন আপনাকে খুঁজতে হবে না। মাথা ঘুলিয়ে যাবে রে হরেক্রেষ্ট। মানুষের ওরিজিন বাঁদর কটা লোক বুঝেছিল! একটি লোক। মাত্র একটি লোক। ডারউইন সায়েব। বাকি সব হ্যাঁ হ্যাঁ করে সায় দিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, বাঁদর প্যাণ্ট জামা পরিয়া দাড়ি গোঁফ কামাইয়া কিঞ্চিৎ ভদ্রস্থ হইয়া মানুষ বলিয়া নিজেদের দাবী করিতে পারে। স্বভাবের সহিত মিলাইয়া লইলে মানুষ আর বাঁদরে মাত্র ফুট কয়েক তফাৎ।

ফুট কয়েক কেন?

ছোট বাঁদর হলে এক মাপ, বড় হলে আর এক; সেই জন্যে সঠিক মাপটা না বলে ফুট কয়েক বলে ছেড়ে দিয়েছি। দুঁদে মন্ত্রীরা ওইরকমই করে— সো অ্যান্ড সো, অ্যাবাউট অ্যাপ্রক্স, অ্যাভারেজ বলে ছেড়ে দেয়। মধ্যবিত্তের যেমন ভয়, আমাদের তেমনি সন্দেহ, ডাওট।

তার মানে স্যার?

মানে, ভেরি সিম্পল। ছোট বাঁদরের ন্যাজের মাপ বড় বাঁদরের চেয়ে ছোটো হবে। আই সি। আচ্ছা পি এ তোমার কি মনে হয়?

কিসের কি মনে হয়?

একই বয়েসের সমস্ত বাঁদরের ন্যাজের মাপ কি সমান হবে? গণিতের ভাষায় বলতে দাও—ডাজ ন্যাজ গ্রোজ ডাইরেকটলি ইন প্রোপোরশান টু দি এজ অফ ইচ অ্যান্ড এভরি বাঁদর অ্যান্ড বাঁদরী।

একটু ব্যাখ্যা করবেন স্যার! এ যেন সার্ভিস কমিশানের ইন্টারভিউয়ের বেকার মারা প্রশ্ন।

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! কেমন ছেড়েচি একখানা! কোনোদিন তোমাদের মাথায় এসেছিল?

নো স্যার।

একেই বলে মগজের সুপ্রিমেসি। ধনবানদের মাথা ধনহীনদের মাথার চেয়ে শার্প হয়। রিসার্চ বলে প্রোটিন ম্যালনিউট্রিশানের ফলে মগজ ডাল হয়ে যায়। লেট মি একসপ্লেন। ধর, রাম, শ্যাম, যদু, মধু, প্রভাত, মুকুল, ষোল বছরের ছটা বাঁদর। প্রশ্নটা হল এই ছটি যুবক বাঁদরের ন্যাজ যদি ফিতে দিয়ে মাপা হয় তাহলে ছজনের ন্যাজের মাপই কী সমান হবে?

ওঃ সাংঘাতিক! ভাবা যায় না স্যার। এটা তো একটা রিসার্চের সাবজেক্ট। ডকটরাল থিসীস লেখার মত বিষয়। এটা তো স্যার কখনও ভেবে দেখি নি। তা ছাড়া ষোড়শ বর্ষীয় বাঁদরের ন্যাজের মাপ আর ষোড়শীর ন্যাজের মাপে কোনও তফাত হবে কি?

কত কি আমরা জানি না। ফানি চ্যাপ। কিসস্যু জানি না অথচ কুটি কুটি লুকের ওপর আমরা লাঠি ঘুরিযে চলেছি।

কুটি কুটি লুক বলে বিকৃত করছেন কেন?

আই লাইক ইট দ্যাট ওয়ে স্যার। জনগণের ভাষা হবে ফোর্স-ফুল, তাতে সবরকম ডায়ালেক্ট থাকবে। দেখি তোমার পেনসিলটা দেখি। এই দ্যাখো কি রকম ফোর্স! পেনসিলটাকে কাঁচের ওপর রাখি, এইবার বলি—কুটি কুটি লুক। আ হা, লুকের তেজ দেখ, ফুঁ দিয়ে আলো নেভাবার মত শব্দ হে! পেনসিলটা গড়গড়, গড়গড় করে গড়িয়ে তোমার দিকে চলে গেল। জাপান কি আবিষ্কার করেছে?

আবার প্রশ্ন স্যার?

ইয়েস প্রশ্ন। প্রশ্নে প্রশ্নে আজ জর্জরিত করে দোবো। জাপান আবিষ্কার করেছে--শব্দ তরঙ্গ দিয়ে অপারেশান। চ্যাচ্চাড় করে ফেঁড়ে ফেলছে, মানুষের পেট, পিঠ, বুক।

মনে পড়েছে স্যার। সুপারসনিক বুম।

খুব পড়েছে! আহা আমার বিস্টুরে! সে তো হল গিয়ে তোমার এরোপ্লেনের ব্যাপার। কোথাকার মাল কোথায় এনে ফেললে হে। একেই বলে পলিটিকস।

অ্যান্ডায় গন্ডা মেলানো। ধেন্না ধরে গেল।

ওই রকমই হবে স্যার। যেমন কর্তা তার তেমন কর্ম। মধ্যবিত্তের ভয় নিয়ে রিসার্চ হচ্ছিল, কি করে চলে গেলেন বাঁদরে।

তা তো বলতে পারবো না ভাই। তা যদি বলতে পারবো তাহলে রাজনীতি করতে আসব কেন?

ওইটা ঠিক ক্লিয়ার হল না স্যার।

কোন্ জিনিসটা ক্লিয়ার হয় ভাই বংকুবিহারী। ধার ক্লিয়ার হয় না। ইনস্টলমেণ্টে জিনিস কিনলে কিস্তি শোধ হয় না, বুকে সর্দি জমলে ক্লিয়ার হয় না, কোটি টাকা ঢেলে দিলেও কলকাতার জঞ্জাল ক্লিয়ার হয় না। কোন-দিকে তাকাবে, ট্যাকস, ভাড়া, স্কুলের মাইনে, ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম, সব সব এক অবস্থা। যা ক্লিয়ার হবার নয় তার জন্যে দুঃখু করে লাভ কি ভাই! তবে জেনে রাখো বাঁদরের ফুটখানেক ন্যাজটি ক্লিয়ার হলেই সে মানুষ হয়ে যায়। কয়েক ফুটের মামলা রে ভাই। তাই নাকি হাজার হাজার বছর লেগে যায়। সব বাঁদরই কালে মানুষ হয়, মানুষ হয়ে আবার বাঁদর হয়ে যায়।

ক্লিয়ার স্যার, এবার বুঝেছি।

আবার ভুলে যাবে। ও বোঝার কোনও দাম নেই রে। আমাদের দেখছো না। বুঝে বুঝে ঝুনো হয়েও সেই একই ভুল বারে বারে। বাঁদরের পিঠে ভাগ। তাই তো আমরা একটা স্লোগান কমিটি করেছি। পি এ ওটা কোন্ দেশ হে যেখানে পোস্টার বিপ্লব হয়েছিল।

সে একটা দেশে হয়েছিল স্যার। নাম বলব না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে চিড় ধরে যাবে।

বেশ বোলো না, কিন্তু আমাদের সেই স্লোগান কমিটির কি হল? বেশ জোরদার নতুন কিছু জিনিস বেরোলো কি? লড়াই, লড়াই, লড়াই, লড়াই। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে। লড়াই, লড়াই, লড়াই।

চমৎকার হয়েছিল জিনিসটা, টেনিসানকেও আমরা হারিয়ে দিয়েছিলুম, কতগুলো ল দেখেছেন! ল-এর অ্যালিটারেশান ভেড়ার পালের মত মুখগহ্বর থেকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

তা আসছে, তবে কি জানো, ওটা শাড়ির ডিজাইনের মত পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন মাল চাই।

কেন, স্যার, আমরা তো নতুন একটা বায়নাক্কা তুলেছিলুম-রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা চাই।

দ্যাটস নট এ স্লোগান, ওটা একটা দাবী। বেশ ঝ্যাম্পোর ঝ্যাম্পোর স্লোগান চাই। শব্দ, সুর, দেহভঙ্গিমা, তাল, লয় সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যাপার, অনেকটা বীর রসাত্মক কীর্তনের মত। কীর্তন মাইনাস মধুর রস। যেমন ধর—নিতাই এনেছে নাম গৌর হরি, হরি বোল, নিতাই এনেছে নাম .

চেয়ারের স্প্রিংটা স্যার কম জোর আছে অত ধড়ফড় করবেন না, এখুনি একপাশে কেতরে পড়বেন।

চেয়ারটা পাল্টাচ্ছ না কেন বল ত?

স্যার যে কম্পানীর চেয়ার সেখানে লাস্ট থ্রি মান্থস লক আউট চলছে।

তাহলে টেবিলে উঠে বসি।

না না, চেয়ারে বসেই কীর্তন করুন তবে চেয়ারের অবস্থাটা মনে রেখে। চেয়ার বড় বিশ্বাসঘাতক, এর আগেও আপনাকে বারকয়েক ফেলেছে।

ঠিক বলেছো। আই মাস্ট বি এ বিট কেয়ারফুল। জনগণের স্প্রিং তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ একজন মন্ত্রীর দুটো জিনিস থাকা চাই—ভার্বাল ল্যাঙ্গোয়েজ আর বডি ল্যাঙ্গোয়েজ। গফম্যান পড়েছো?

নো স্যার!

বডি ল্যাঙ্গোয়েজটা পড়ে দেখো। যা বলছিলুম, মাইনাস মধুর রস, নিতাই আমার মাতা হাতি হুঙ্কার দিয়ে বল দাঁতে দাঁত চেপে—মাতা হাতি।

আমরা একটা স্লোগান নিয়ে রিসার্চ করতে করতে মোটামুটি একটা ফাইনাল চেহারা দিতে পেরেছি।

কোনটা, কোনটা!

এবার স্যার একেবারে নতুন অ্যাপ্রোচ। ওই গানের সুরটা মনে করুন—বোম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত, দোস্ত কো সেলাম কর।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু হুঁ হুঁ করে নি—বোম্বাই সে, হাঁ হাঁ বোম্বাই সে আয়া মেরা হা—বাঃ ফাইন রিদম্‌। তা এই দোস্তকে কি করব?

দোস্ত নয় স্যার ওখানে দালাল বসবে, সুর আর ছন্দটা কেবল মনে রাখুন, একটু তাল দিন ওই ছোটো পেপার ওয়েটটাকে ওই মোটা ফাইলটার ওপর ফ্ল্যাট করে ঠুকে। নিন ওয়ান টু, ওয়ান টু...বোম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত... দালাল কো হালাল করোও ও ওঃ (এখানে সম) আর একবার, দালাল কো হালাল করো, ও ও ওঃ ওই যে দালাল পালায়, ওই যে দালাল পালায়ায়ায়, দালাল কো হালাল কর। গুফ গুফ গুফ দালাল কো হালাল করোওঃ। স্টপ। কেমন?

ফাইন! মালটা বাজারে ছাড়চো কবে?

এই স্যার বন্যাটন্যাগুলো সরে যাক। রিলিফ নিয়ে ক্যাডাররা বড় ব্যস্ত। জিনিসটা রেডি। আর একটা স্লোগান—কায়েমী স্বার্থের বুর্জোয়া দালালদের কালো হাত ভেঙে দাও (খাদে) গুঁড়িয়ে দাও। ভেঙে দাও (খাদে) গুঁড়িয়ে দাও।

ওসব তোমাদের অর্ডিনারি মাল। বরং পপ্যুলার হিন্দি টিউনের সঙ্গে পাঞ্চ করে...যেমন ওই একটা হিটগান আছে না—গীতা গাতা চল, ওইটাতে একটা কিছু ফিট করা যায় কি না দ্যাখো।

অ্যা ই ইল।

কি হল হে?

এই বাইরের মালটার সামনে ভেতরের সব কথা ফাঁস হয়ে গেল। এ শালা বাইরে গিয়ে বলে বলে বেড়াবে—এই ভাবে মিনস্ট্রী চলছে।

র‍্যান্ডাম ভয় দেখিয়ে বাইরে ছেড়ে দিয়ে এস, কিস্যু করবে না, শেষে বোবা হয়ে যাবে। বাঙালীর আর ভয়েস কোথায়! শেষ বাঙালী যার ভয়েস শোনা গিয়েছিল হি ওয়াজ বোস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। এখন তো বাঙালী মানেই প্যান্টোমাইম।

না স্যার, সেই বভ্যম হাজামকেও তো রাজা ভয় দেখিয়েছিলেন। হলটা কী?

সে আবার কে!

সেই যে লোকটা, রাজার চুল কাটতে এসে, রাজার মাথায় দুটো শিং দেখেছিল। কিছুতেই কথাটা পেটে রাখতে পারল না। শেষমেষ গভীর জঙ্গলে ঢুকে একটা নিম না তুঁত গাছের সামনে দাঁড়িয়ে চেপে রাখা কথাটা বলে

খোলসা হয়ে এল। আর তারপর! তারপর সেই গাছ কেটে ঢোল হল, সেতার হল, আরও কি কি যন্ত্র তৈরি হল। সেই মাল গিয়ে পড়ল এক ওস্তাদের হাতে। সেই ওস্তাদ আবার দলবল নিয়ে সেই শিংঅলা রাজার আসরেই গেল মিউজিক শোনাতে। সেতারে আঙুল পড়তেই বেজে উঠল—রাজাজীকা দো শিং, দো শিং, কাঁসর বেজে উঠল, কিস্নে কহা, কিস্নে কহা? ঢোলে চাঁটি পড়তেই মাল ফাঁস—বভ্যম হাজাম নে কহা, বভ্যম হাজাম নে কহা। ব্যস, হাজামের গর্দান গেল।

ওহে বঙ্কু শুনলে গল্পটা। আমাদের শিং দেখেছো, খবরদার এ জিনিস যেন লিক না করে, বৌকে বলবে না, সেলুনে বসে কি চায়ের দোকানে বসে বলবে না, এমন কি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস না পেয়ে কিম্বা বাসের ভেতর জনগণের ডেমোক্রেসির চাপে গলদঘর্ম হয়ে বিরক্তির চরম মুহূর্তেও বলা চলবে না—ধ্যাৎ শালা মিনিস্ট্রী, বুঝলে হরেন, সেদিন যা দেখেছি...এইসব যখন বলতে খুব ইচ্ছে করবে, তখন খৈনী খেয়ে যেভাবে থুতু ফেলে সেইভাবে পিচ পিচ থুতু ছিটোতে পারো কিম্বা রেগে ঘোড়া যেভাবে আস্তাবলে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠোকে সেইভাবে পা ঠুকতে পারো। বাট নট মোর দ্যান দ্যাট।

মার্কোপোলোর কলকাতা পর্যটন

(প্রথম পর্ব)

মার্কোপোলো বললেন, অবিশ্বাস কোরো না, ভূত ভেবে ভয়ও পেও না, মানুষ ইন ফ্যাকট মরে না, মরলে কিম্বা মারতে পারলে এতদিনে বাঙালী মরে একসটিংকট হয়ে যেতো। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। ইহাদের ভেজালে মারা যায় না, কুপথ্যে ইহারা কাবু নয়, বোমা পাইপ, পটকা ইহাদের কিছু করিতে পারে না, বুট জুতার লাথি ইহারা সহজে হজম করতে পারে, খাইয়া না খাইয়া ইহারা মহানন্দে বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে, ইহারা দাস হইতে জানে, প্রভু হইতেও জানে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও ইহাদের শেষ করিতে পারে না। ইহারা ফিরে ফিরে আসে কত কাঁদে হাসে, কোথা যায় সদা ভাবে গো তাই। শুনে রাখো বৎস সব ফোর্থ ডাইমেনসানে গিয়ে জমা হয়। আমিও সেইখান থেকেই আসছি, কুবলাই খানের নির্দেশে।

কেনো দাদা? দাদা নয়রে ব্যাটা দাদু দাদু, তোর চে আমি সাড়ে সাতশো কি আটশো বছর বয়েসে বড়। মার্কো বললেন, আমি একটা ডাকসাইটে ভূপর্যটক। ইতিহাস যদি পড়ে থাকো নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। আমি কিভাবে ভারতে এসেছিলুম! কোনো বিপদ, কোনো বাধা, কোনো ভয় আমাকে কাবু করতে পারেনি। সে সময় বিমান ছিল না, লাকসারী লাইনার ছিল না, ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল না। তবু, তবু আমার আসন টলে'গেছে।

কে টলিয়েছে দাদু? তোমরা, তোমাদের কলকাতার ব্রেভ ম্যানেরা। তোমরা

প্রতিদিন যা কর আমি যদি একবার তাহা করিতে না পারি, তাহলে ফোর্থ ডাই-মেনসানে আমাকে সাহসী পর্যটক বলে কেউ আর স্বীকার করবে না। কুবলাই খানের নির্দেশে সেই কারণেই আমার কলকাতা আগমন, মিশন, অফিস টাইমে কলকাতার যে কোনো প্রান্ত থেকে বিবাদিবাগ গমন, সরকারী বাস, ট্রাম কিম্বা বে-সরকারী বাসে। শর্ত—নিজেকে পর্যটক ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে নিম্ন-পদস্থ কর্মচারী। ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দেবার জন্যে ভেতরটা আকুলি বিকুলি করবে। হাতে থাকবে একটা ব্রিফ কেস, সেটার ওজন হবে মিনিমাম পাঁচ থেকে সাত কেজি। প্যান্টের পাশ পকেটে থাকবে মানিব্যাগ। সেই ব্যাগে থাকবে ভাড়া দেবার খুচরো পয়সা কিম্বা টাকা, পাট করা রুমাল, দু এক কুঁচি সুপুরি। পায়ে থাকবে, সামনে খোলা, আঙুল বের করা জুতো, চোখে থাকবে চশমা। পরনে থাকবে পা-ফুলো ট্রাউজার, বুশ শার্ট। আজকে আমি তোমার সঙ্গে রেকনেসেনসে বেরোবো, কাল বেরোবো একা একা।

সকাল ন'টার সাইরেন বেজে গেল। মারকো অবাক হয়ে বললেন, এয়ার রেড চলছিল নাকি, অল ক্লিয়ার বাজছে! আজ্ঞে না, এটার মানে অন্য ক্লিয়ার আওট, ক্লিয়ার আওট। কলকাতা শহরের চাকুরিজীবী পরিবারে অল ক্লিয়ার হল। হাসি-খুশি কত্তা, খিটখিটে কত্তা, ত্রিভঙ্গ মুরারি কত্তা, কান্নিক মারা কত্তা সব বেরিয়ে পড় রাস্তায়। গৃহ এখন গৃহিণীদের জন্যে। কর্তা ক্লিয়ার, কর্ম ক্লিয়ার, কারক ক্লিয়ার।

রাস্তায় নেমে মার্কো বললেন, রোজই যখন এই সময়ে বেরোতেই হয় তখন সেইভাবে আর একটু আগে থেকে প্রস্তুত হতে পারো না। শেষ সময়ের এই তাড়াহুড়ো। তা তোমার হাতে ওটা কি! ভেটিরিনারি হসপিটেল হয়ে যাবে বুঝি! না তো! তাই তো! দেখেছেন, কি কাণ্ড! দুটো চেয়ারে দুটো জিনিস ছিল, একটা ফোলিওব্যাগ, আর একটা গুটিসুটি বেড়াল। তাড়াতাড়িতে বেড়ালটা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি, যাই রেখে আসি। বেড়ালটাকে সিঁড়ির মুখে ছেড়ে দিলেই জানি ঠিক ওপরে চলে যাবে। কিন্তু ফোলিও ব্যাগ না হলে আমি অচল। ব্যাগে আমার সেক্রেটারিয়েট, ড্রয়ারের চাবি, লণ্ড্রির বিল, ইলেকট্রিক বিল, দাঁতের, চোখের, নাকের, কানের, পেটের প্রেসক্রিপসান, হজমের, মাথা ধরার ওষুধ, অ্যান্টাসিড, অ্যান্টি-অ্যামিবিক পিল, টিফিনের কৌটো, কাছে দেখার চশমা, কেনাকাটার ফর্দ, উত্তর দেবার চিঠির ডাঁই, রোজকার খরচের হিসেব লেখা স্লিপ, ফেরার পথে বাজার করার গাটফর্মা নরম ব্যাগ, গোটাকতক আরশোলার ডিম, একটা দুটো ছোটো আরশোলা যার অপর নাম চ্যালা, বাস আর ট্রামের অজস্র টিকিট। কি নেই ওই পেটমোটা ব্যাগে!

ব্যাগ নিয়ে ফিরে আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্বই হল। মার্কো বললেন, তোমরা ওরিয়েণ্টাল পিপলরা ভেরি স্লো, শ্লাগিস লেথারজিক। আজ্ঞে না সাহেব! সমীক্ষায় প্রকাশ, কলকাতার অধিকাংশ মানুষ খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বড় বাইরের জন্যে উসখুস করে। তলপেটে জিয়ার্ডিয়া, অ্যামিবায়োসিসের কমবাইনড পাণ্ড। সেই কাজটি সেরে এলুম সাহেব। বেশ করেছো এখন ওইটাকে ভেতরে ঢোকাও, তোমার ইনসাইড আউট হয়ে আছে। আ, ওটা আমার সেক্রেড থ্রেড, পৈতে, অনেকদিন ধোলাই করা হয়নি সাহেব। জামার বোতাম ঠিক করে লাগাও, ওলট-পালট হয়ে আছে, বি ডিসেণ্ট মাই বয়। কাল থেকে সব কাজ ঠিক সময়ে করার চেষ্টা করবে। জেনে রেখো একপেট খেয়ে যে দৌড়োয় মৃত্যুও তার পেছনে



আমি চলেছি গণ্ডারের মত, প্যাটন ট্যাঙ্কের মত, মার্কো আসছেন পালতোলা মহাজনী নৌকোর মত

দৌড়োয়। সব জানি সাহেব, ক্যালকেসিয়ানরা সব জ্ঞানপাপী। সমীক্ষায় প্রকাশ—কলকাতায় হাই প্রেসার আর লো প্রেসার পাশাপাশি চলেছে। হ্যাংওভার আর মর্নিং সিকনেসের সহ অবস্থান। কোষ্ঠকাঠিন্য আর তারল্য যেন যমজ দুটি ভাই। সকালে চায়ের ফার্স্ট এডিসান, সেকেণ্ড এডিসান, খবরের কাগজ, মুভমেণ্ট খুঁত খুঁত, অ্যাগেন চা, ফিন অ্যাগেন মুভমেণ্ড স্ত্রীর ফাইফরমাশ, ছেলের অংক, মেয়ের মহাভারত, বাড়িওলার সঙ্গে জল নিয়ে খ্যাচাখেচি, প্রতিবেশীর গিন্নি পাংচার, শ্বশুর মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ, নিজস্ব জিনিসপত্রের হারানো, প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ, এর পর সময় থাকে! টাইম অ্যাণ্ড টাইড মার্কোপোলো! কি আর বলব! এখন চল ট্রাম ডিপোয় যাই।

বিশ বাইশ বছর ধরে নিত্য অফিস করা মানুষের হাঁটার বেগ আর ফোর্থ ডাইমেনসান থেকে উঠে আসা সাড়ে সাতশো বছর আগের ভূপর্যটকের বেগে তফাত থাকবেই। আমি চলেছি গণ্ডারের মত, প্যাটন ট্যাঙ্কের মত। মার্কো আসছেন পেছনে পাল তোলা মহাজনী নৌকোর মত। এ হে হে দেখো তো হে ব্রহ্মতালুতে গরম মত কি খানিকটা পড়ল! মার্কো মাথা নিচু করে এগিয়ে এলেন। মাথার মধ্যবিন্দুতে যেন হোয়াইটওয়াশ! কি বলো তো! আজ্ঞে ক্যালকাটার ক্রো বৈদ্যুতিক তারে বসে পেছন ঝুলিয়ে একটু করে দিয়েছে। কি

করেছে। কাকস্য প্রাতঃ বহু কৃত্য। মার্কো মাথা তুলে বললেন, ছি, ছি। ছি ছি কি! ওসব আমরা মাইণ্ড করি না। সয়ে গেছে। আরে সেজন্যে ছি ছি করছি না হে, করছি তোমার সংস্কৃত শুনে। বিদ্যাসাগর, রামমোহনকে আমি কিভাবে বোঝাবো। তোমাদের তৈরী ফাউণ্ডেশানের ওপর দাঁড়িয়ে নাতি আমার বহু কৃত্য বলছে। ধাতুরূপ, শব্দরূপ ভুলে বসে আছো হে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উপক্রমণিকাটা তো মাঝে মাঝে ওল্টাতে পারো! ধ্যাস কি যে বলেন! ওনার লেখা অমন ভাল বই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগই বাতিল করে দিয়েছি আমরা। অ এ অজগর আর তেড়ে আসে না। এখন অফসেটে ছাপা অ এ অটোমেশান তেড়ে আসে। আপনি বলছেন উপক্রমণিকা! ও বই এখন হয়তো গুটেনবার্গের ছেলে মেয়েরা উল্টে দেখবে! মার্কো বললেন, তা হলেও জেনে রাখো বহু, বহু, বহব—বহবকৃত্য।

সাত সকালেই সাহেবের সঙ্গে ইণ্ডোলজি করছ না কি হে! সুটেড-বুটেড হাতে একতাড়া মুলো, হন হন করে বৃন্দাবন পাশ দিয়ে সাঁত করে বেরিয়ে যেতে যেতে প্রশ্নটা রেখে গেল। আজ বেরোবে না? মুলো হাতে চললে কোথায়! একটু জোর কদমে হেঁটে বৃন্দাবনের পাশাপাশি এসে গেছি, একতাড়া মুলো সহ শ্রীবৃন্দাবন। মুলো কি করবে! ঘুষ দেবো হে ঘুষ! মুলো ঘুষ! মাসের শেষে অন্য মাল পাবো কোথায়! মুলো ঘুষে পৌষ কালীও খিল খিল করে হেসে ওঠেন, দপ্তরের কেরানি একটু নড়ে বসবে না! কি বল হে! এই রইলো ভাই তোমার টেবিলে একতাড়া চাষের মুলো, ফাইলটা একটু ঠেলে দাও পাশের টেবিলে। পাশের টেবিলে পড়বে এইটা। বৃন্দাবনের হিপ পকেট থেকে বেরোলো



মুলোধারী শ্রীবৃন্দাবন

একটা মেয়েদের চিরুনি। বৌয়ের চিরুনিটা হাতিয়ে এনেছি। যশোরের শেষ মাল বলে চালিয়ে দেবো। একটু ঠেলে দাও ভাই ওপরে। এইভাবে ফাইল উঠবে আমিও উঠবো, স্টেপ বাই স্টেপ, সব শেষে বিলিতির বোতল। বুড়োকে কি করে শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

মার্কো পেছনেই ছিলেন। খুশি হয়ে বললেন, ভেরি গুড ভেরি গুড, তুমি দেখছি শুদ্ধ সংস্কৃত জানো। বুড়োকে কি করে বোঝাই সারা কলকাতায় প্রভাত-বাবুর আই ডোন্ট নো চলেছে। তুমি তো খুব ফানি ম্যান হে। মার্কো বৃন্দাবনের প্রেমে পড়েছেন। বৃন্দাবন গাঙ্গুলীদের মত চালু লোকেরাই কলকাতার চল ও বল। তোমার কথা আমি ত্রৈলোক্যকে বলব। কে ত্রৈলোক্য? তুমি ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের নাম শোন নি। ফোর্থ ডাইমেনসানে এলে পরিচয় করিয়ে দেবো। বৃন্দাবন ইশারায় বুঝতে চাইল সাহেবের মাথার গোলমাল কিনা! ফিস ফিস করে বললুম, পাগলা সাহেব। করছ কি তুমি, বৃন্দাবন মুলোর খোঁচা মারল। হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও যা পাও, ফরেন কারেন্সি, টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিসটার ক্যামেরা, কসমেটিকস, ফরেন লিকার, গোলড বিসকিট, হাসিস, মারিযুয়ানা। তুমি না পারো আমার হাতে ছেড়ে দাও।

মার্কো পেছিয়ে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ভেলভেট মোড়া খাতায় লিখছেন, কি লিখছেন গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ওলড ম্যান! আমি যা দেখি, আমি যা শুনি, একটু একটু নোট করে নি। এই দেখো নোট ওয়ান, এটা আমি ওয়ারেন হেস্টিংসকে বলব, কলকাতার রাইটারবাবুদের স্বভাব তোমার সময়ে যা ছিল এখনো তাই আছে। কলাটা, মুলোটা না দিলে লাল ফিতের বাঁধন খোলে না। রেফারেনস, মুলোধারী বৃন্দাবন। সময়, ন'টা প'য়তাল্লিশ। ডেট, আজকের তারিখ। দ্বিতীয় নোট, ফর বিদ্যাসাগর ফর রামমোহন, ফর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এট আল। বই লিখলে কিস্যু হয় না, ছবি চাই, ভাল ছাপা চাই, বই চালাবার জন্যে ধরাবার জন্যে বৃন্দাবন গাঙ্গুলী অ্যান্ড হিজ মুলো প্রেসক্রিপশান চাই। ক্লিপ। খাতা বন্ধ হল। পায়ে পায়ে ট্রাম ডিপো।

(দ্বিতীয় পর্ব)

মার্কো বললেন, ডিপো থেকে ট্রামে বসে জানালা দিয়ে চাঁদপানা মুখ বের করে হাওয়া খেতে খেতে বিবাদি বাগ যে কোনো শিশুও যেতে পারে। এর মধ্যে সেই থ্রিল কোথায়! যে থ্রিল আমি ইংলণ্ডে দেখেছি, মধ্যযুগে গ্ল্যাডিয়েটারদের লড়াইয়ে। তুমি পড়েছো স্কটের বইয়ে। যে থ্রিল দেখেছি স্পেনে বুল ফাইটারদের মধ্যে। রোমে রথের দৌড়ে। এই তো সেদিন আমাদের ফোর্থ ডাইমেনশানে তোমাদের কলকাতার একটি ইয়ং ছেলে বিবাদিবাগ থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোজা চলে এল, তখনো তার মুখে সেই বীরের সংগীত—হাতল ধরে ঝুলবো তবু ভেতরে তো যাবো না। আমি সেই হিম উত্তেজনা চাই, অভিজ্ঞতা চাই, গুঁতোগুঁতি চাই, ঠাসাঠাসি চাই, এই পড়ে যাই, এই মরে যাই অভিজ্ঞতা নিয়ে পতাকার মত উড়তে উড়তে যেতে চাই। ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

॥ অভিমানীর অভিমানী ট্রাম ॥

সারি সারি ট্রাম ঠ্যাং উঁচু করে পর পর দাঁড়িয়ে আছে। 'হল্ট' বলে সৈন্য-বাহিনীকে স্থানু করে দিয়ে জেনারেল যেন ব্যাটেল ফিল্ড থেকে সরে পড়েছেন। বিভিন্ন বয়সের, মাপের, মেজাজের স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রী চারদিকে ভাঙা ডিমের কুসুমের মত পোচের প্যানে গ্রীজের ওপর হড়কে হড়কে বেড়াচ্ছেন। আলতো হাতের আদরের স্পর্শ পড়ছে হাতলে, শরীরের চাদরে। যেন ট্রামের জ্বর দেখা হচ্ছে, প্রেসার মাপা হচ্ছে, তোয়াজ হচ্ছে নানাভাবে। কেন অমন কচ্চিস মাইরি! সাতসকালে কেন তোর এই ভিটকেমি! চল বাবা সুন্দরী, চল বাবা বোঁচানাকি অসুন্দরী। কানের কাছে বেজে উঠলো -গড সেভ দি কিং। মার্কো মহাখুশী। ট্রাম তোমাদের চলবে না। চলো যাই হাতল ধরে উপচে পড়া বাসে।

কি হয়েচে ভাই! যাবে না, যাচ্ছে না! সবাই প্রশ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছেন। উত্তর দেনেওলা, ইউনিফর্মধারী ফলক লাগানো সেই মহামানবরা কই। ওই একজন আসছেন। ওই মহামানব আসে। কি হয়েচে ভাই? আমার অফ ডিউটি। জিজ্ঞেস করুন ওই গাছতলার টুপিওলাকে। টুপিদা, ট্রাম! জানি না, জিজ্ঞেস করুন, ওই টুপি দাড়িওলাকে। টুপি-দাড়িদা কি হয়েছে ভাই, এই তো সারি সারি ট্রামের। জানি না, আমি খুচরো দেবার অফিসার। আমি টাকার চেঞ্জ দিয়ে থাকি, আদার বেপারি জাহাজের..., জিজ্ঞেস করুন ওই ডান্ডাধারীকে। হে ত্রিশূলধারী কি হয়েচে ভাই! অমন করে আকাশের দিকে চোখ তুললে কি বুঝবো বাপী, মু সে তো কুছ বোল, সেঁইয়া মু সে তো কুচ্‌ বলো। পক্ষাঘাত, প্যারালিসিস। বিদ্যুৎ নেই। তবে একটা সিগ্রেট পেলে ধোঁয়া ছেড়ে বলতে পারি, তিনি কখন আসবেন। কখন তুমি গেলে প্রিয় কখন তুমি এলে।

তোর কোনো ফান্ডা নেই বে। মেয়েরা প্রেমে পড়লে ওই রকম একটু করে। কিছুই জানিস না বে প্রেম করচিস। আমার পাঠশালে পড়, ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দেবো, ইউ হিউ হিউ, সব বাজার ক্যাপচার, সব দিল ফ্যাকচার। হোয়াট ইজ দিস। এ কি ল্যাঙ্গোয়েজ। এরা কারা! খালি ট্রামেই এঁদের বাসা। এঁরা প্যারা-ডাইসের নতুন পাখি। কলকাতার প্রেমিক যুবক সম্প্রদায়ের দুটি স্পেসিমেন। ভাস্কোডাগামার মত চুল, ইউকালিপটাসের মত শীর্ণ সবল। আমাদের ভবিষ্যতের ঝুলঝাড়ু!

এইবার তোকে খুব মারবো বলে দিচ্ছি অনিন্দ্য। তখন থেকে তুই আমাকে টিজ করচিস। কেন করব না মাকু। শাড়ি দিচ্ছে, কবরেজী খাওয়াচ্ছে, ভিকটো-রিয়ার সবুজ মাঠে ঘাসের চারা লাগাচ্ছে, বাড়ির সামনে বাঁকা শ্যাম হচ্ছে, ঝুলে পড় মাইরি বাপের একছেলে। ওষুধের দোকান আছে, আমাদের মত ফাঁকা মাঠের কাকতাড়ুয়া নয় ইয়ার। ওকি, ওকি! পাবলিক প্লেসে সাতসকালে। ও কিছু না, দেখেও দেখো না সাহেব, উত্তেজিতা, প্রেমিকা যুবতী, যুবকটির লম্বা চুল চাঁপার কলির মত আঙুলে খামচে ধরে হেঁইসো হেঁইসো করে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে। তা বলে এই ট্রামে! তাতে কি হয়েচে, যে ট্রাম চলে না সেই ট্রাম আর বৈঠকখানায় তফাত কি! মিনিবাসে কিস দেখেচো! সে আবার কি? দেখবে দেখবে, সব দেখবে, এসেচো যখন সব তোমাকে দেখাবো। গড়ের মাঠের গোলকুন্ডা দেখাবো। ভূতঘাটের নৌকোয় ব্রজবিলাস দেখাবো। জাতীয় গ্রন্থাগারে লুকোচুরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে হা-ডু-ডু দেখাবো।

নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোই না! তুমি ভাব আমি কিছু টের পাই না! ডুবে ডুবে জল খাই শিবের বাবাও টের পায় না! সব জানি সব জানি আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দেবে মিঞা! কি টের পেয়েচো! নোংরা মেয়েমানুষ! মুখ সামলে। তুমি মুখ সামলে মুউখ সামালকে। এটা কি ব্যাপার! সায়েব, এ'রা স্বামী স্ত্রী, ঝগড়ার স্টক ক্লিয়ারেনস হচ্ছে। সময় নষ্ট করে লাভ কি! ট্রাম চলুক না চলুক ঝগড়া চলুক।

কি লিখছেন! দাঁড়াও একটু নোট করে নি--অভিমানীর অভিমানী ট্রাম। ট্রামের অভিমান, কামরায় কামরায় অভিমানী যাত্রী। সময় চলে যায় ট্রাম অচল। কলকাতার ল্যাঙ্গোয়েজ—ফান্ডা এনথু বে, মিঞা, মাকু হেভি গরম, ক্যালি। নেসফিলড, রো আর ওয়েব সাহেবকে জানাতে হবে, গঙ্গাধরবাবুকেও জানাবো। কোন নেসফিলড! সেই গ্রামার লেখা নেসফিলড। সর্বনাশ তাঁকে আবার নাড়া দিয়ে জাগাবেন কেন! এক গ্রামারেই কুপোকাত আবার যদি একটা ছাড়েন। বেশ তো চলচে গ্রামার ছাঁটা ইংলিশ।

এটা কি ব্যাপার হে! সোয়েটার। জানলার ধারে শীতের রোদ গায়ে মেখে জোড়া পা সামনের আসনের পিঠে উঁচু করে ঠেসিয়ে, দিদি আমার বুনছেন। খেয়াল নেই উলের গোলাটা জানলার বাইরে পড়ে গেছে। দাঁড়ান তুলে দি। আপনার নোটবুকে লিখে নিন, ক্যালকাটার হ্যাবিট—এক, চলতে চলতে রাইট অ্যান্ড লেফট থুতু ফেলা; দুই, যে কোনো দেয়ালে নেচারস লিকুইড কল, কল কল করে ছেড়ে দেওয়া; তিন, ছুটির দিন বই দেখে চীনে খাবার রান্না করা, চাউমিন চাউচাউ; চার, ট্রামে, বাসে, হাসপাতালের আউটডোরে, এমন কি শ্মশানেও সোয়েটার বোনা, খুলে বোনা, বুনে খোলা। দেখবেন? এই যে আপনার বল, এ বছর কটা হবে? বেশি না গোটা তিরিশ, বোন-পো, বোন-ঝি, ভাসুরপো, গীতার ছোটো ছেলের ঠাকুরপোর, জেসমিনের। বুঝেচি বুঝেচি। কি বুঝলেন মার্কো! মাস্ট বি ভেরি রিচ! রিচ, পুওরের ব্যাপার নয়। রেস, নস্যি, সিগারেট, জর্দা সোয়েটার, জপের মালা, দাদের চুলকুনি সব এক ক্যাটিগোরির জিনিস।

॥ হৃদয়হীন সরকারী বাস ॥

ভালোই, কি বলো! কি ভালো! ট্রাম যদি একেবারেই বসে যায় তাহলে তোমাদের এই হাউসিং প্রবলেম, স্পেস-প্রবলেমের কেমন সহজ সমাধান! এক একটা কামরা, এক একটা ফ্ল্যাট। লাইন দিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে দাও, উত্তর থেকে দক্ষিণ পুব'থেকে পশ্চিম। ছোটো ছোটা ফ্যামিলি ছোটো ছোটো কামরা। ট্রাম প্লাস হাউসিং, তোমাদের নতুন গ্রামারের নিয়মে সন্ধি করলে, অকারের পর আকার থাকিলে উভয় মিলিয়া নিরাকার মানে ট্রামাউসিং। ম্যালথাস সায়েব সাধে তোমাদের গাল দিয়েচে। মাউসের মত বংশ বৃদ্ধি করলে ট্রামাউসিংই হবে।

বক বক সাহেবকে নিযে ডিপোর বাইরে। এই দেখো সায়েব দোতলা পোড়ো বাড়ি, এর নাম হাউজ খাস। পরিকল্পনা—রাজ্য সরকার, পরিকল্পনা—রাজ্য পরিবহন করপোরেশান, ব্যবস্থাপনা—আমরা। পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায় করতে কর'তে প্রচুর ধূম আর প্রচন্ড শব্দ নির্গত করতে করতে এই গর্ভ-ধারিণী অবশেষে মাঝরাস্তায় গর্ভমোচন করে এলিয়ে পড়েছেন। জঠরের মালেরা সদ্য ডিম ফোটা চিকেনের মত ইতস্তত খেলে বেড়াচ্ছেন। বিবাদিবাগে ভূমিষ্ঠ



হে হৃদয়হীনা! হে হৃদয়হীনা!

না হয়ে যদুবাবুর বাজারের কাছে প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি। জননী পাষাণী।

কর্কপিট থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন পাইলট। কি হয়েচে ড্রাইভার? এই ড্রাইভার না, ড্রাইভার না। কি চাষারে! হি ইজ এ পাইলট। কি হোলো, আমাদের পাইলটদা! উত্তর পাবে না বৎস। কি হল কণ্ডাকটার! আবার! বলুন, পার্টনারদা। উত্তর পাবে না বৎস। ওই দেখো ত্রিমূর্তি কাঁধে কাঁধে হাত রেখে দূর থেকে দূরে ঝাপসা হয়ে গেল, আপনার আমার কাছে ওরা ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব। শূকরশাবকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই, আমরা অন হিজ ম্যাজেসটিস সার্ভিসে রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করে মাইনে নি। কমিশান মারি, একমাত্র আললাহ কিংবা ঈশ্বরের এক আধটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারি।

পোস্ট মর্টেম করছেন যাত্রীরাই, বোধহয় মা-জননীর অ্যাকসেল ভাঙিয়া গিয়াছে। ধুর মশাই, টাই রড কেটে গেচে। কিস্যু জানেন না, টাই রড কাটলে আর নাক নাড়তে হোতো না, ডিজেল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেচে। আজ্ঞে না, তাহলে ফোঁটা ফোঁটা, গিয়ার জ্যাম হয়ে গেচে। ঘোড়ার ডিম জানেন, ভেঁপু লিক করেচে, ঘণ্টির দড়ি ছিঁড়েচে। কিস্যু হয়নি দাদা। দোতলার জানলায় একটি হাসি হাসি মুখ। কে এ এ তুমি বসি জানালার ধারে একেলা আ আ। ছলনা করি, ছলনা কোওরি। আমি স্টার্টার। টার্মিনাসে আমি টাইট দিয়েচি আমাদের টাইট দিয়ে গেলো। কিস্যু কবার নেই দাদা। জমানা বদল গিয়া, ডাণ্ডা উঁচা রহে উসলোগোঁকো। ইউনিয়ান, ইউনিয়ান।

মইটা লগো। মই! ইয়েস স্যার, বউ ডাল বেঁটেচে, ছাদ পাচ্ছিলুম না বড়ি দেবার, ভগবান ছাদ এনে দিয়েছেন ঝট করে, কয়েকটা ঝালের বড়ি দিয়ে দিক। নাও নাও উঠে পড়ো, পড়ো উঠে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক পারবে। পূর্বদেশের মেয়ে। চাবটেএর সময় চাআটা দিয়েএ যাআস বাআবা। আপনি লাঠি ঠুকে ঠুকে কোথায় উঠছেন দাদু! অ্যাই বৃঅন্ধ বয়ওসে গৃহএ'এ' বড়োওও গঅণ্ডগোওল তাইই

এমোওন দোওতলায় একটু সংবাদপত্রটা শাআন্তিতে।

কি লিখছেন মার্কো! লিখছি—সহৃদয়হীন সরকারী বাস, গতিরঅগতি, অগতিরগতি। স্টপ।

(তৃতীয় পর্ব)

॥ দাম্ভিক ট্যাকসি ॥

পঞ্চম ট্যাকসির ড্রাইভার যখন হাত নেড়ে, সুর্মা টানা ঢুলু ঢুলু চোখে ফিচকে হাসির ঢেউ তুলে, গায়ের ওপর আধখাওয়া সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে বৃহন্নলার মত এদিকে ওদিকে এঁকে বেঁকে সরে পড়ল, মার্কো তখন বললেন, কোনোদিন যদি কলকাতা কোন ট্যাকসিচালককে একান্তে পাই তাহলে হিপ্নো-টিক কোনো ওষুধ খাইয়ে প্রশ্ন করব, মাই লর্ড, কিসের জন্যে তোমরা স্টিয়ারিং ধরে রাস্তায় নামো! একি খেলা সারা বেলা! সায়েব, হায় সায়েব, তুমি জানো না। গুরু এদের বিহেভিয়ার ব্রহ্মের মতই প্রশ্নাতীত, তর্কাতীত। যমরাজের মত এরা কখন কাকে নেবে একমাত্র এরাই জানে। উত্তরে যেতে চাইলে দক্ষিণে যাবার বাহানা করবে, পুবে যেতে চাইলে পশ্চিমে। আমরা অভ্যস্ত। তবু মার্জার স্বভাব! চেষ্টা করে দেখা সিকে যদি ছেঁড়ে! গোবর্ধনবাবুর স্ত্রীর লেবার পেন উঠেছিল সকাল দশটার সময়। তিনটে অবধি তোলপাড় করেও ট্যাকসি মিলল না। তারপর কি হল, তারপর! হোলোই না। বছরের পর বছর ঘুরে গেল, হেভি কর্নাস্টিপেসান। 'হেভি কনস্টিপেসান' কি ধরনের ইংরেজী! এটা হল বাংলা ইংরেজী—বাংরেজী। ভাষায় প্রেজেণ্ট জেনারেশানের ব্যাকগিয়ার। ইংরেজী করুন তো—তুমি একটি মাল। ইউ আর এ লাগেজ। আজ্ঞে না, হোলো না। কলকাতার মালেরা সকাল থেকেই মাল খায়। দি লাগেজেস অফ ক্যালকাটা টেক লাগেজেস ফ্রম মর্নিং। হবে না স্যার, হবে না। ডেভিড হেযারও হার মেনে যাবেন!

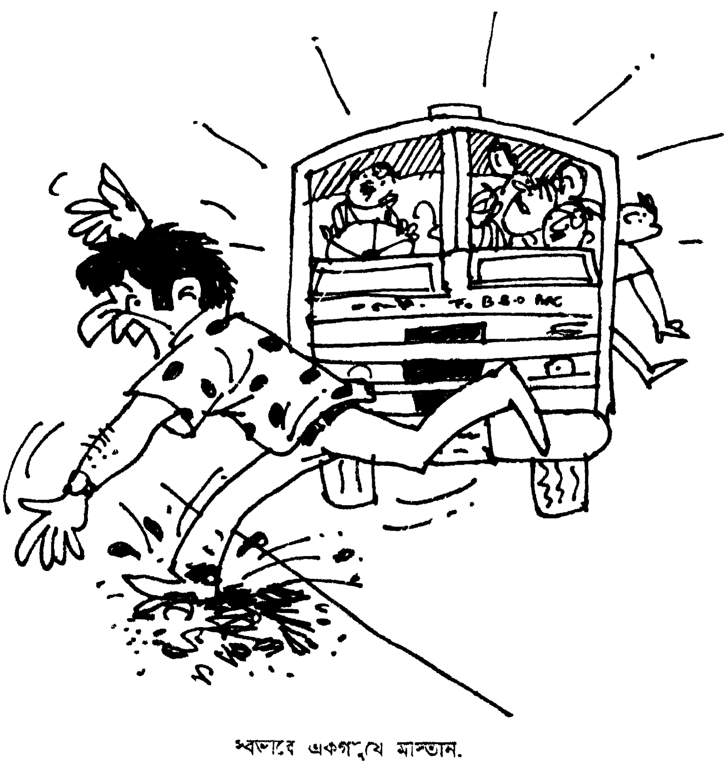
মার্কো নোট বুকে লিখলেন—কলকাতায় দু রকমের ট্যাকসি আছে—কালো আর হলদে। তিন জাতের ড্রাইভার—বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী। আচার-আচরণে এঁরা কিন্তু এক জাতি এক প্রাণ, একতা। বড়ই দাম্ভিক। যাত্রীর ইচ্ছায় গাড়ি চলে না, গাড়ির ইচ্ছায় যাত্রী চলে। কলকাতার লোকের স্বভাব যদিও বাড়িয়ে বলা তবু আজ আমি নিজে প্রত্যক্ষ করলাম উদ্দেশ্যহীন ট্যাকসি কার উদ্দেশে রাজপথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে কে জানে!

॥ খুনী মিনি ॥

মার্কো তন্ময় তাঁর লেখা নিয়ে। আমি কিন্তু ঠিক দেখেছি। রক্তবর্ণা, থ্যাবড়া নাক চার চৌকো চেহারা, প্রান লেগা তেরা জান লেগা করে তেড়ে আসছে। তিড়িং লাফ ফুটপাথে। আর এক লাফে লক্ষ্মীবাবুর আসলি সোনা চাঁদির দোকানের রকে। বলা কি যায় সহজে! রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথ, ফুটপাথ ছেড়ে সেখানেও ঢুকে পড়তে পারে। আমাকে একবার সবাতে সরাতে খানায় ফেলে দিয়েছিল। সি এম ডি এ-র তৈরি সরোবরে, বর্ষার জলে সারা রাত গলা পর্যন্ত

শরীর ডুবিয়ে উপুড় করা তারাভরা আকাশ দেখেছিলুম, বিশাল বিশাল স্কাই স্ক্যাপারের মাথায় লাল আলোর হুঁসিয়ারি লক্ষ করেছিলুম। বিমানের হোঁচট খাওয়ার ভাবনায় সিটি ফাদাররা শঙ্কিত কিন্তু ফাদার অফ ম্যানের জন্যে একটা টিমটিমে টেমিও সে রাতে জোটেনি। সেই অচেনা জলাশয়ে পকেটে পড়ে থাকা ক্যারামের ঘুটির মত সারা রাত মজা করে পড়ে রইলুম। রাত একটা পর্যন্ত অবিরাম চিৎকার করেও ধারে কাছে কেউ এলো না। ধরিত্রীর আর্তনাদে সাড়া দেবার মত মানব সন্তান এ শহরে নেই। ভোরবেলা ঠিকাদারের লোক কপিকলে করে টেনে তুলে পকেটে যা ছিল সব হাতিয়ে নিলে। বললে, সুরাপান আর কোরো না গুরু, সুধা খেও জয় মা কালী বলে।

আমার লাফালাফি দেখে মার্কো বললেন, পালালে কেন হে! পালাবো না! মিনি আসছে যে! মিনিতেই এই, হুলো দেখলে কি করবে! শুনে রাখো সায়েব, কলকাতার পথ-পরিবহন হিন্দি ছবির ধাঁচে সাজানো, রাষ্ট্রীয় পরিবহন ফ্লপ-নায়ক, ট্যাকসি খেয়ালী প্রযোজক, মিনি হল ভিলেন। নিন লিখুন, মিনির অংশটা আমিই বলি—স্বভাবে একগুঁয়ে মাস্তান, বেগবতী, ধ্বংসপ্রবণ, আত্মঘাতী হবার ইচ্ছাও প্রবল। আমাদের জীবনে ইহা এক ধরনের পরীক্ষা। যাঁহারা যোগের চর্চা করিয়াছেন তাঁহারা ধনুরাসন, কুর্মাসন প্রভৃতি শুনিয়াছেন, মিনি সেই আসনের তালিকায় বঁড়শি মুদ্রা বা হুকমুদ্রার সংযোজন ঘটাইয়াছে। এই চলমান ক্ষুদ্র



স্বভাবে একগুঁয়ে মাস্তান.

প্রকোষ্ঠে যাঁহারা গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া দিনের পর দিন দাঁড়াইয়া যাওয়া-আসা করেন তাঁহারা অচিরেই হেঁট মুণ্ড হুক বা বঁড়শির আকৃতি প্রাপ্ত হন। শুধু তাই নয় ইহারা যে প্রজাতি সৃষ্টি করিবেন তাহারাও হেঁটমুণ্ড হইবে। হেঁট মুণ্ড হইবার সুবিধা অনেক যেমন (এক) ক্ষমতাশালী মানুষের সামনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার খেসারত দিতে হইবে না, (দুই) পথ চলিবার সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মত দৃষ্টি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নিবদ্ধ থাকিবার ফলে সুন্দরী মহিলাদের দেখিয়া প্রাণ আঁকুপাঁকু করিবে না, (তিন) কেশ কর্তনের সময় নরসুন্দরের হাতের চাপে মাথা নিচু করিয়া থাকিবার ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, (চার) সংসারের নিচের দিকটিই ইহাদের নজরে আসিবে, কড়িকাঠের ঝুল দেখিয়া রবিবার ঝুলঝাড়ু লইয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কসরত করিতে হইবে না। স্ত্রী কেন ঝুল ঝাড়িতে পারে না বলিয়া স্ত্রীকে ঝাড়িতে পারিবে না। পারস্পরিক ঝাড়াঝাড়ি বন্ধ হইবার ফলে ঝুলঝাড়ু ছুটি পাইবে, মাকড়সাদের সাধনা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না। গৃহ কলহমুক্ত হইয়া গীর্জার প্রশান্তি পাইবে। (পাঁচ) বিবাহের জন্য পাত্রী পছন্দের সময় মুখশ্রী দেখিবার প্রয়োজন হইবে না, শুধুমাত্র পদযুগল দেখাইয়াই আইবুড়রা বিবাহের বাজারে পার হইয়া যাইবে। (ছয়) সন্তানের বখাটে মুখ কি স্ত্রীর তোলো হাঁড়ির মত মুখ দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতে হইবে না। কিছু অসুবিধা মানিয়া লইতে পারিলে হেঁট মুণ্ড হইবার সুবিধা অনেক। অসুবিধার মধ্যে চলমান বাস বা ট্রামে যাঁহারা নিদ্রামগ্ন হন তাঁদের ঠোঁটের ফাঁক দিয়া লালা পড়িবার সম্ভাবনা। জলসহযোগে ক্যাপসুল গিলিবার অসুবিধা। ডাক্তারকে জিভ দেখাইবার অসুবিধা। দেয়াল ঘড়ি দেখিবার অসুবিধা, ফলে এদেশের প্রধান ঘড়ি শিল্প দেয়াল ঘড়ির বিক্রয় বন্ধ হইবে। কিছু শিল্পী বেকার হইবে। অবশ্য সৌর ঘড়ির মত ওয়ালক্লকের পরিবর্তে ফ্লোরক্লক চালু করিয়া সমস্যার সমাধান করা যাইতে পাবে। পাদুকার মূল্য আরো বাড়িবে। হেতু, সকলের দৃষ্টিই পায়ে পায়ে ঘুরিবে সুতরাং পদমর্যাদা বাড়াইবার জন্য পাদুকার মর্যাদাও বাড়াইতে হইবে।

॥ কলকাতা তাল তাল একতা ॥

আমি মার্কোপোলো, একটি চলন্ত অফিস টাইমের বাসের প্রবেশ পথের কাছে দাঁড়িয়ে রিলে করছি। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। পাদানির কাছে একটি মনুষ্য আকর্ষণী বলয় তৈরি হয়। সেই বলয়ে নিজেকে ছেড়ে দিতেই আমি আটকে গেছি। কোথায় আমার হাত, কোথায় আমার পা, মাথা দেহকাণ্ড আমি বলতে পারব না। আমি অখণ্ড, কি খণ্ড খণ্ড তাও জানি না। ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমার কোনো অনুভূতি ছিল না। মনে হয় এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট মিল আছে। দুটি বিশাল ভুঁড়ির মাঝখানে আমার শরীর আটকে আছে। ঘাড় থেকে মাথা কর্কস্ক্রুর মত পেঁচিয়ে গেছে। ডান-পায়ের গোড়ালির কাছটা মনে হচ্ছে কেউ হ্যাক-সঅ দিয়ে কাটছে। একটু প্রতিবাদ মত করতে গিয়েছিলাম। বাসসুদ্ধ সকলে কোরাসে জানালেন, বাসে মশাই ওরকম একটু হবেই। অসহ্য লাগলে ট্যাক্সি করে যান। শুনলাম, কলকাতার বাসযাত্রীদের এইটাই নাকি সাধারণ উত্তর। ইতিমধ্যে সামনের দরজা দিয়ে এক ভদ্রমহিলা নামবার চেষ্টা করলেন। নেমেছেন, তিনি তেড়েফুঁড়ে নেমেছেন। কিন্তু একি!

এ যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ। শাড়ির আঁচল বাসে, মহিলা রাস্তায়। বাস ছেড়ে দিয়েছে। নাইলন শাড়ি লাট্টু ঘোরাবার লেত্তির মত ফড়ফড় করে খুলে গেল। মহিলা লাট্টুর মত রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। আমার নাকের কাছে একটা গামছা এসেছে। সমগ্র কোলন শহরের নির্যাসে এই বস্তুকে চোবালেও দুর্গন্ধ যাবে না। শুনলাম কলকাতা শহরে এই ধরনের লক্ষ লক্ষ গামছা আছে। মানুষের গায়ের, জামা কাপড়ের, মাথার চুলের, চুলের তেলের ডিজেলের মিশ্রিত গন্ধকে ছাপিয়ে এই গন্ধ সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে যেন সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনি খোলা হয়েছে। সকলেই একটু উঁ উঁ করলেন। জনৈক ভদ্রলোক বললেন, স্যানেটারি ইনসপেকটারকে খবর দাও। একেবারে সামনের মাথা থেকে কে একজন উত্তর দিলেন, বলুন। উত্তর প্রত্যুত্তরের টানাপোড়েন চলল। তোমার কি হোলো? সিজারিয়ান। স্টিচ কটা? ষোলটা। মানুমাসির মেয়ের অম্বলের অসুখ কমেছে? ভুবন কোথায়? কাশ্মীরে।

পেছনের গেটে নামতে গিয়ে একজনের ব্রিফ কেস আটকে গেছে। খুব টানাটানি চলছে। রাস্তায় ভদ্রলোক, ডান হাত সমেত ব্রিফকেস ভেতরে। বাস চলেছে, ভদ্রলোক চলেছেন। চিৎকার—ছেড়ে দিন, ছাড়ুন না মশাই, ছেড়ে দিন। প্রচণ্ড উত্তেজনা, কে হারে কে জেতে!

কে বলেছে, অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচে না। এখানকার আবহাওয়ায় আগ্নেয়-গিরির উত্তাপ, হাওয়ায় নব্বই ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই বাসের আধকাটা জানলা দিয়ে হাওয়া ঢোকেও না বেরোয়ও না। যিনি ডিজাইনার তাঁর মাথায় হয় সিরাজউদ্দৌলার কোনো ইঞ্জিনিয়ারের ভূত, নয়তো আইখম্যানের ভূত চেপেছিল। কোথায় লাগে নাজি কনসেনট্রেসান ক্যাম্প, গ্যাস চেম্বার, ব্ল্যাক হোল!

আমরা পায়ে পায়ে পেঁচিয়ে, হাতে হাতে জড়াজড়ি করে, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করতে করতে, সমষ্টির মধ্যে ব্যাষ্টিকে নিমজ্জিত করে দলা পাকিয়ে, কখন আস্ফালন, কখন আলাপন করতে করতে বিশাল একটি মণ্ডের মত ধপাস করে মার্টিন বার্নের সামনে রাস্তায় পড়লাম। তারপর সেই মনুষ্য পিণ্ড থেকে, রাম, রহিম, যদু, মধু, শ্যাম, শ্যামল নিজেদের গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে হনহন করে গন্তব্যের দিকে দৌড়োলেন।

গাঁটকাটায় আমার পকেটটি কেটে নিয়ে গেছে। কলকাতার মানুষ বাইরে বিচ্ছিন্ন কিন্তু বাসে বা ট্রামে তাল তাল একতা।

সামলে চলি, সামলে রাখি

কিছু জিনিস আমি খুব সামলে চলি। রাস্তায় কিংবা বাসে মাঝে মাঝেই সবার অলক্ষে বুকপকেটের কাছে একবার করে হাত বুলোই। আমার সুশীল দাদু বলেছিলেন–ওটারও একটা কায়দা আছে হে। হাত বুলোতে হবে এমন-ভাবে কেউ যেন দেখে না ফেলে। তাহলেই মরেছ। ফুঁসকি ফাঁস! পকেটমাররা সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক। আমি ওই কারণে খুব ক্যাজুয়েলি হাত বুলোই।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! বুকপকেটের তলাতেই হার্ট। মধ্যবয়সী লোকের ভীড়—বাসে হার্টটা একটু উসখুস করতেই পারে। উফ্! দীর্ঘ নিশ্বাস! একটু অধৈর্যের ভাব! নীচু হয়ে দেখার চেষ্টা—আর কতটা মনে মনে—হ্যাঁ ঠিক আছে, বুক-পকেটের পেছন পকেটে কিছু টাকা, সামনে পেন। থাক, ঠিক থাক, আবার একটু পরে দেখব। রিয়েল পকেটমার কখনও দেখিনি। পকেটমার সন্দেহে বেদম মারা হচ্ছে, এমন লোককে চকিতে উঁকি মেরে দু-একবার দেখিনি তা নয়। সে সব লোক মনে তেমন দাগ কাটেনি। বিশেষত ছাত্রজীবনে আমাদের বাঙলার মাস্টার মশাইকে পকেটমার সন্দেহে মার খেতে দেখে আমার বদ্ধমূল ধারণা, কি জন-সাধারণ, কি পুলিস, কি পুলিসের কুকুর, কারুরই রিয়েল অপরাধীকে সনাক্ত-করণের ক্ষমতা নেই। ইনভেরিয়েবলি একটা নিরীহ লোককে ধরবে ধরে র‍্যান্ডাম ধোলাই দেবে। ওদিকে আসল মাল বসে বসে মাল খাচ্ছে—উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে।

কত রকমের ছবি ছাপা হয়! চিত্রতারকা টৌরি বাগাচ্ছে। খেলোয়াড় কঠোর মুখে বলছে—এবারের লড়াই বাঁচার লড়াই। বিশাল প্রতিষ্ঠানের টাক-মাথা চেয়ারম্যান দুঃখ দুঃখ মুখ করে বলছেন—ডিয়ার শেয়ার হোলডারস, এবারে নো ডিভিডেণ্ড। নেপোজ হ্যাভ স্টোলেন দি কার্ডস। পুলিশ-চিফ দফতরে বসে বড়-বড় চোখ করে বলছেন—ঠেঙিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দোবো। নেতাদেরও চেনা যায়। সব সময় ছবিতে মুখ দেখছি—এ দেশ, এই আমাদের দেশ, পাতাল রেল, না, না, না, চক্রবেড় রেল, উঁহু মোনো-রেল, ফ্লাই-ওভার, হাম্প, ডাম্প, বিদ্যুৎ, চাকরি, পাত্তা, নিরাপত্তা, কত কথাই বলতে চায় ওইসব ছবির মুখ। যাঁরা ভেজাল দিয়ে মানুষ মারেন তাঁদেরও হয়ত চিনতে পারব। ল্যাম্পপোস্টে রঙীন পোস্টার পড়েছে, ওইসব প্রাণীর। স্পিসিজটাকে হয়ত চিনতে পারব। কুতকুতে চোখ, চোয়ালটা চওড়া, ঠোঁট দুটো পুরু, থুতনিটা ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। কত সুবিধে, বাঘ দেখলে চিনতে পারব, সিংহ, শেয়াল পারব, সাপ পারব, ভিলেন পারব কারণ সিনেমা পোস্টারে প্রাণ, প্রেম চোপরা দেখেছি, ডাকাত পারব, গব্বর সিংকে দেখেছি, ছিঁচকে চোরও চিনতে পারব, পাড়ার পটলদাকে দেখেছি, পটলদা রিয়েল চোর, বলে বলে চুরি করে, বিদেশী স্মাগলাব চিনতে পারব, ইংরেজী ফিল্মে দেখেছি, দিশী স্মাগলার হয়ত পারব না, যেমন দিশী কুকুর চিনব, বিদেশী কুকুর চিনলেও কি নাম কি জাত বলতে পারব না। পকেটমার তো একদমই চিনতে পারবো না। তারা ঈশ্বরের মত। তাদের কৃতকর্মের ফলটিই আমরা ভোগ করি! চর্মচক্ষে তাদের কখনও দেখিনি। দেখা থাকলে চিনতে আর কি! আর চিনলে ব্যাঙ্ক থেকে তোলা মেয়ের বিয়ের টাকা তাকে নিতে দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে মরবই বা কেন আর বেয়াই মশাইয়ের পায়ের তলায় কান ধরে নিল-ডাউন হয়ে বসবই বা কেন, আব শেষ পর্যন্ত ইনস্টলমেণ্টে মেয়ে পার করার চুক্তিই বা হবে কেন! প্রেসার কুকার, ফ্রীজ, ফার্নিচার সবই যখন ইনস্টলমেণ্টে যায় বেয়াইমশাই, আমার মেয়েই বা যাবে না কেন? জেনে রাখ, মেয়ের পিতা, পকেটমার দেখিয়ে আমার মত ভালমানুষের ছেলের হাতে বড়টিকে পার করলেন, এখনও আর একটি মাথায় মাথায় হয়ে আছে, দুটো ইনস্টলমেণ্ট একসঙ্গে চালু হলে নিজেই মরবেন, সামলাতে পারবেন না। মাসের দুই কি তিন তারিখের মধ্যে সীলকরা খামে ক্যাশ দিয়ে যাবেন! মনে রাখবেন পকেট একবারই মারা যায়। বাঘ একবারই পালে পড়ে।

ফেল করলে মেয়ে ফিরিয়ে দোবো। ওইসব ট্রেডিং কোম্পানীর নিয়ম মনে আছে তো, ইনস্টলমেণ্ট শোধ না হওয়া পর্যন্ত স্বত্ব জন্মাবে না। মেয়ে আপনার থাকবে ঠিকই, ঘুরবে ফিরবে তবে পুত্রবধূ হবে যখন আমি নগদের পুরো টাকাটি বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে, গুনেগেথে তুলে রাখব—অ্যা-জুস। চুস্। বেয়াইমশায়ের দাঁতের ফাঁকে ঢেঁড়সের ছিবড়ে ঢুকেছিল। দেশলাই কাঠি দিয়ে শব্দ করে বের করতে করতে স্ত্রীকে অর্থাৎ বেয়ানকে বলেছিলেন—পুসু মাংস আর চলে না। যে বয়সের যা, এখন ওই দুধ, সন্দেশ, মালাই, মালপো! হরি হে, মধুসূদন!

ও তুমি যতই সামলাও হে, কলকাতার পকেটমারকে তুমি চেন না ভাই। নৃপেনের কেস জান? জামাইষষ্ঠীর দিন বাবু শ্বশুরবাড়ি চলেছেন, ল্যাজে বউ বেঁধে। জানই তো সারাটা জন্ম ব্যাটা প্যাণ্ট আর হাফ হাতা জামা পরে কাটাল, সেদিন মাঞ্জা কি! চুনট করা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, শ্বশুরের দেওয়া সোনার বোতাম, নিউকাট জুতো! কিপটের মরণ! যাচ্ছিস যা, ট্যাক্সি করে যা। উঠেছে বত্রিশ নম্বর বাসে। আমেজ কত? কানে আতর, ঘাড়ে পাউডার। বউকে বসিয়েছে লেডিজ সিটে, আর নিজে দাঁড়িয়েছে রড ধরে সামনে। কি খেয়ালে ছিল কে জানে। বিডন স্ট্রিটে রোককে, রোককে করে নামল। ততক্ষণে কম্ম ক্লিয়ার! বুক খোলা, হাওদাখানা! বোতাম নেই, সোনার বোতাম খুলে নিয়ে গেছে। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে, এ বলে,—সে কি গো! ও বলে—সে কি গো! বোতাম-মার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—হয় গো হয়, আজকাল এও হয়! ভেবে দেখো, নৃপেন ব্যাটাছেলে বলে তবু বেঁচে গেল, বুক খোলা থাকল তো কি আর হল, খোলা রাখাটাই তো এখনকার ফ্যাশান। মেয়েছেলে হলে কি হত? ছি ছি চোখের সামনে বুক খোলা ইয়ে, কোনো মানে হয়?

কলমটা তুমি বাপু বুকপকেটে রেখ না! কি দরকার! পার্কার ফিফটি ওয়ান কলমটা আমার কিভাবে গেল! কত বড় একটা মেমারি! ছুইট মেমারি! ছুইট না সুইট। হ্যাঁ হ্যাঁ ছুইট মেমারি। ফিফটিওয়ান নিয়ে কেউ বাসে ওঠে? আপনি তো একটা রিয়েল গাড়ল। গাড়ল তুমি, না শুনেই আমাকে বাসে উঠিয়ে দিলে সাত তাড়াতাড়ি। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ফুটপাথ ধরে হেঁটে



সাবধান! ভগবান পাশেই আছেন।

চলেছি, উলটো দিক থেকে আসছে একটা গামছা বিক্রিঅলা। দেখেছ নিশ্চয়, থাক-থাক গামছা কাঁধে আর একটা গামছা হাতে, সেটাকে দু-হাত দিয়ে ধরে মাঝে-মাঝে দোলাতে থাকে। কোণাটা আমার বুকের ওপর দিয়ে সামান্য ঝাপটা মেরে চলে গেল। গেল তো গেল কি হল! নতুন গামছা বুকে লাগলে মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হয়ে গেল? এক মেয়েদের আঁচল গায়ে লাগলে শুনেছি রোগা হয়ে যায়! হাঁটছি হাঁটছি, ওমা লালবাজারের মোড়ে এসে বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখি—কি দেখি? তোমাকে কি বলব মানিক, মেঘলা দিনে বিধবা হলে মেয়েদের মনের অবস্থা যা হয়, আমার ঠিক সেই রকম হল।

আরে! সেম কেস তাহলে আমারও হয়েছিল, গামছা দিয়ে পেন তোলা। শ্যামবাজারে পুরনো রাইমারের সামনে ফুটপাথে। আমারটা অবশ্য পার্কার নয়, সামান্য রাইটার। গ্রাহ্য করিনি তাই। আমার একটা পার্কার আছে, সেফার্স আছে, মঁ-ব্লাঁ আছে। তারা সব বড়লোকের বউদের মত। হাঁড়ি ঠেলার কাজে লাগাই না। তোয়াজে থাকে। রববার, রববার ক্লিনিং পলিশিং।

শুনে রাখ, ওই যে গামছা, ওটাকে নিরীহ গামছা ভেবো না। ওরা হল গামছা-পকেটমার। এর ওপর আছে সুন্দরী-আঁচল-পকেটমার, চুল পকেটমার। তোমাকে তো আমি চিনি সেই ঘেঁষ্টে ঘেঁষ্টে লেডিজ সিটের সামনেটিতে ধনুক হয়ে দাঁড়াবে। কিস্যু না, মহিলা ওঠার সময় মাথাটিকে জাস্ট একটু পকেট ঘেঁষে তুলবেন, তুমি টেরটি পাবে না, পেনটা ক্লিয়ার বুক পকেট থেকে চুলের সঙ্গে উঠে চলে যাবে। যায় যাবে, কলকাতায় এখন মানুষ আর কলম দুটোই ভেরি চিপ। ফুটপাথে কিলবিল কিলবিল করছে মানুষ আর কলম। কিন্তু বাবা! বাসে, ট্রামে লেডিজ সিটের সামনে দাঁড়ানর চার্মটা একবার ভাব। সব কষ্ট গলে জল হয়ে যায়। তুমি ভাব, পকেটমার যদি সুন্দরী হয়, সে যদি কিছু নেয়, তাকে আমি পকেটমারা বলব না, ওটা আমার দেওয়া উপহার। প্রীতি উপহার। কিন্তু একটা গুঁফো লোক জানলুম না শুনলুম না, বুঝলুম না, ঝট করে পকেটটা হাতিয়ে নেমে গেল, সহ্য করা যায়!

হ্যাঁ, যা বলছিলুম, ওইভাবে মাঝে মাঝে, বুকপকেটের ওপর দিয়ে হালকা হাত চালিয়ে সামলাতে সামলাতে যাই। আর তারপর বাড়ি এসে ভাই, আবার সামলাই, আরও ভালভাবে সামলাই। নোটগুলোকে ভাঁজ খুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একদিন এক একটা বইয়ের মধ্যে রাখি, আর পয়সার ব্যাগটাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় লুকুই। পেপার পাল্পের একটা ফাঁপা প্যাঁচা আছে, কোনদিন তার মধ্যে রাখি। কোনদিন আলমারি আর দেয়ালের মাঝখানে বঁড়শি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখি। কখনও দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামটা যেখানে টিক-টিক করে সেখানে কায়দা করে রাখি। কখনও হান্টারশুর ভেতরে রাখি তবু ভাই কেমন যেন মনে হয়, নেই, নেই। দু টাকার একটা নোট নেই, চকচকে একটা আধুলি নেই। গোল ঝকঝকে কাঁচা টাকাটা কি হল রে? পাঁচটা দশ টাকার নোট ছিল না! চারটে কেন!

—জানো কিছু?

—কি করে জানব? পাছে তোমার ব্যাগে, পকেটে হাত দি তাই আজকাল লুকিয়ে রাখা হয়! কত টাকা ছিল আমি জানব কি করে! তোমরা পাঁঠা, তুমি বোঝো!

—যাকগে, যাকগে, এখন বল তো, নোটগুলো কিসের মধ্যে রেখেছি—

টলস্টয়ের মধ্যে, শেকসপিয়ারে, ওয়েবস্টারে, না প্রেম কথায়!

—এখন ধার নাও, দুপুরে খুঁজে রাখব।

তাহলে আর একটা কাজও কোরো, ওই ভেণ্টিলেটারে পয়সার ব্যাগটা গত রবিবারে লুকিয়ে রেখেছিলাম। হে, হে, তোমার চোখ এড়িয়ে আর ইয়ে করতে পারছিলুম না. .ওঠাও তাহলে...।

সহবাস

খাঁ সাহেব গান ধরেছেন, দমদমের বাগান বাড়িতে। সেকালের কালে খাঁ, একালের আমীর খাঁ সাহেব নন। বাঙালী ক্ল্যাসিক্যাল খাঁ। মার্গ সংগীতের শুকনো বাগানে শেষ কয়েকটি বুলবুলের একটি। ভাল তালিম, শ্লেষ্মাহীন গলা, সঠিক লয়কারি, শুদ্ধ সরগম, বিশুদ্ধ পাঞ্জাবি, শাস্ত্রীয় পাজামা। সন্ধ্যের মুখটায় শিল্পী পুরিয়া ধরেছেন। শ্রোতা, কিছু প্রাচীন অ্যারিস্টোক্র্যাট, কিছু আধুনিক, দলছাড়া বাছুর (ড্রপ আউটস), গৃহস্বামী ও তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যা।

শিল্পী বেশ জমিয়ে বসেছেন। তানপুরা মিঠিমিঠি বাজছে। হারমোনিয়ামে আঙটি পরা আঙুল, নর্তকীর চপল পায়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। তবলচির হাত তবলার ওপর নিসপিস নিসপিস করছে। এক ঝলক সুর ঘরে লুটিয়ে দিয়ে, ওস্তাদ পরের ঝলকটি গলা ঝেড়ে বের করার জন্যে বেশ বড় সাইজের একটি হাঁ করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ। সুর নয়, অসুর। দমফাটানো ঘর-ফাটানো কাশি, কাশির পর কাশি। একটা বেরোলো, দুটো বেরোলো। এক ব্যাটেলিয়ান ঢুকেছিল। সব কি আর বেরোলো! কিছু সোজ ফুসফুসে গিয়ে আটকে রইল।

এক গেলাস জল খান ওস্তাদজী। আর না না, জল খাবেন কি! মশা তো আর ভিটামিন ক্যাপসুল নয়, জল দিয়ে গিলে ফেলবেন! মসকুইটো ভয়ানক ডেনজারাস জিনিস, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া এনকেফেলাইটিস। কেশে কেশেই বের করে ফেলতে হবে বাবাজি। বাইরে গিয়ে সেই চেষ্টাই কর। ওরে বাপরে, বুকটা ভীষণ ঝাঁ ঝাঁ করছে! মশার কি রকম টেস্ট মশাই! একটু নোনতা, ঈষৎ টকটক। মানে, র‍্যাসপবেরী, স্ট্রবেরীর মত কি। বলতে পারবো না, আজ্ঞে ওসব বিদেশী ফল চেখে দেখাব সৌভাগ্য হয়নি। তবে ট্যাঁপারিব মত হতে পারে। ও ইয়েস গুজবেরী, গুজবেরী। আমি যখন ফ্রানসে ছিলুম, তখন স্ট্র, র‍্যাসপ গুজ। আরে রাখো তোমার ফ্রানস, বসে আছো দমদমে চুলকে চুলকে পশ্চাদ্দেশ ফুলে গেল, র‍্যাসপ বেরী, স্ট্রবেরী।

গৃহস্বামী বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ওস্তাদকে কাশিয়ে নিয়ে এলেন—ছি ছি কি লজ্জা বলুন তো। মানুষ চাঁদে চলে গেল, আব আমরা, আমরা এই মশার উৎপাত কমাতে পারলুম না। একটু কাশির ওষুধ খাবেন ওস্তাদজি! কাশির ওষুধে কি হবে, খেতে হলে মশা মারা ওষুধ খেতে হয়। গৃহস্বামী সবিনয়ে

বললেন, বাড়িতে একটি মাত্র বড় মশারি, সেইটাই খাটিয়ে দি, ওস্তাদজি দলবল নিয়ে ভেতরে বসুন, ওনার তো মুখ খোলার কাজ, আমরা বরং মুখ বুজিয়ে বাইরেই বসি, তালে তালে হাত-পা নাড়ি, শরীর চাবড়াই।

ত্রৈলোক্যবাবুর ডমরুধর, সুন্দরবনের আবাদে গিয়ে চড়াই পাখির মত বড়, ঝাঁক ঝাঁক মশা দেখেছিলেন। মশাদের পরস্পরের কথাও শুনেছিলেন। মশারা সব বাবু ভাগাভাগি করে নিচ্ছে, ও আমার বাবু, ও তোমার বাবু। খাস কলকাতার মানুষ এখন মশাদের প্রজা। মসকুইটো কিংডামে কত সুখ! মশার কামড় একটু সহ্য হয়ে গেলে, মন্দ লাগে না। লংকা ঝাল বলেই তো তার আদর। নারী মুখরা বলেই না এত প্রেম! ভ্রমরের হুল বলেই না চাকে এত মধু। দংশনের একটা স্বাদ আছে, তার আছে, অ্যালকহলের মত। মশা কামড়ালেই চুলকোতে থাকি, জায়গাটা আস্তে আস্তে ফুলতে থাকে। তারপর। যে কোনো ফুলো জায়গায় হাত বুলোতে ভীষণ মজা লাগে।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম মধ্য কলকাতার সর্বত্রই মশক বাহিনী মার্চ করছে। কলকাতা করপোরেশানের স্বাস্থ্য দপ্তরের সৈনিকরা, সরকারের ম্যালেরিয়া দমনের ডি ডি টি বাহিনী বিনাযুদ্ধে এই শহর 'মসকুইটো স্কোয়াড্রনের' হাতে তুলে দিয়েছেন। দংশনহীন সন্ধ্যা মশারিহীন মধুচন্দ্রিমা আর তো ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

গত বিশ বছরে মশাদের হালচাল স্ট্র্যাটেজি সব পালটে গেছে। মশাদের সৈন্য বাহিনীতে দু-রকমের সৈনিক পাওয়া যাবে। একদল ফিনফিনে গাইয়ে ধরনের, যাদের আক্রমণের ধরনটাই হল—"হিট অ্যান্ড রান।" এরা বোধ হয় স্ত্রী মশা। কিছু কিছু মহিলার চেহারা ছিপছিপে, রুক্ষ রুক্ষ, সূক্ষ্ম মিহি গলা, আর কথা বলার সময় কখন যে ঠুসঠাস চড় মেরে চিমটি কেটে বসবেন, সাবধান হবার সময়ই দেন না। স্বভাবের মিল দেখেই সিদ্ধান্ত।

আর এক শ্রেণীর মশা হল, গাবদা-গোবদা, কালচে, হাইপোডার্মিক নিডলের মত হুল। মশারির বাইরে বসে, টেনে টেনে জাল ফাঁক করে সটাসট্ ঢুকে পড়তে পারে। আন্ডারওয়্যার, মোটা প্যান্ট, জামা আর গেঞ্জির স্যান্ডউইচ ভেদ করে নিমেষে হুল চালিয়ে শরীরের নরম জায়গা থেকে উষ্ণ তাজা রক্ত তুলে নিতে পারে। যেমন একগুঁয়ে, তেমনি বলিষ্ঠ। লুকোচুরির ধার ধারে না। কানের কাছে অন্ধকারে পিন পিন, পিন পিন করে গান গেয়ে বলে না, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ঘুমিয়ে পড় শুষতে থাকি। চড় চাপড় চালালে দু-একটাকে ঘায়েলও করা যায়।

ডি ডি টি, মবিল ইনসেকটিসাইডের, অপ্রচুর খামখেয়ালী প্রয়োগে ভেজাল-খেকো বাঙালীর মত একরোখা, কৌশলী হয়ে উঠেছে। প্রখরবুদ্ধি প্যারাসাইট। যে মানুষটি আহারে ব্যস্ত, মশা জানে, ব্যাটার ডান হাত কাবু, বুদ্ধি করে শরীরের বাঁ দিকে কামড়াতে থাকি। শিরদাঁড়া ধরে পিঠের বাঁ দিকে এমন একটা স্থান বেছেনি, যেখানে এঁটো ডান হাত পৌঁছোবে না। অহংকারী মানব, তুমি কি অসহায়! মিহি গলায় স্ত্রীকে ডাকো, মিনু মিনু, উ হু হু হু, একটু চুলকে দাও প্লিজ!

চুলকে দাও প্লিইজ! দাঁত খিঁচোবার সময় মনে থাকে না। পারবো না, যাও।

মিনু, প্লিইজ! কোন্ খানটা বল। আর একটু নিচে, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে, উঁ হুঁ হুঁ হুঁ একটু ওপরে, ধ্যাত্ তেরি, ইডিয়েট। সরি! ইডিয়েট তুমি নয় আমি, আমি ইডিয়েট, আমার চোদ্দপুরুষ ইডিয়েট! হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই জায়গাটা।

আস্তে আস্তে। চুলকোচ্ছো! না আঁচড়াচ্ছো, নখটাও কাটতে পারো না জানোয়ার, না না, তুমি না, আমি আমি।

অপেক্ষা করে থাকি সেই জায়গায় যেখানে মানুষকে নগ্ন হতেই হবে। তারপর তীরের মত দংশন। বড় সায়েব, ছোটো সায়েব, হালকা সায়েব, পাতলা সায়েব, রেহাই নেই, মুক্তি নেই। কামড়ে যাই, কামড়ে যাই।

নবারুণ গুপ্ত জার্মানী থেকে বিয়ে করে এনেছে জার্মান বউ। সঙ্গে বছর তিনেক বয়সের ইন্দোজার্মান সন্তান তৈরি করেই এনেছে। কলকাতার প্রথম রাতেই জার্মান ললনা নাইলেকস মশারি দেখেই লাফিয়ে উঠলো, ডাসেল ডার্ফ ভন গুটেনবার্গ। হোয়াট ইজ দিস। তিন বছরের ছেলে ভয়ে সারা বাড়িতে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। জীবনে মশা দেখেনি, কামড়ও খায়নি। চিৎকার করে কাঁদছে আর বলছে—মেফিসটোফিলিস, ড্রাকুলা, ড্রাকুলা। পরের দিনই লুত-হানসা। নবারুণের বউ পালিয়েছে। সে এখন মসকুইটো প্রুফ বউ খুঁজছে। আইনজ্ঞের পরামর্শ নেবে কিনা ভাবছে। করপোরেশানের বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণের মামলা করবে।

হৃদয়বাবুর ইদানীং এমন অভ্যাস হয়েছে, বসলেই কদম কদম পা নাচাতে থাকেন। ভদ্র সমাজে আর মিশতে পারেন না। পংক্তি ভোজনের টেবিলে বসে পা নাচাচ্ছেন? মাটির নড়বড়ে জলের গেলাস টাল খেয়ে উলটে পড়ল। কি করছেন মশাই! বাসের আসনে বসে পা নাচাচ্ছেন। সহযাত্রী বিরক্ত হলেন, কি হচ্ছে মশাই! ব্যাড হ্যাবিট। ইঞ্জেকসান নিতে গিয়ে পা নাচাচ্ছেন। কমপাউন্ডার বললেন, ছুঁচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেলে আমি দায়ী নই। কেন এমন করেন হৃদয়বাবু! সাধে করি ভাই। রাতে টেবিলে বসে লেখাপড়া করতে হয়। অনেক দিনের অভ্যাস। ছুঁচ ফোটানো মশা। পা নাচিয়ে তাড়াতে তাড়াতে এই রকম নাচন-পা হয়ে গেছি।

বৃন্দাবনবাবু প্যারালিসিসে ছ' বছর শয্যাশায়ী। প্রথম প্রথম সংসারের সেবা পেতেন। এখন আর তেমন আদর নেই। যে গরু দুধ দেয় না তার আবার আদর কিসের। এক পাশে পড়ে থাকেন। সন্ধ্যের অন্ধকার যত গাঢ় হতে থাকে, ঘরে মশার কীর্তন পার্টি তত জমে উঠতে থাকে। প্রথমে মশাদের নর্তন কুর্দন, পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ওড়া, তারপর অসহায় বৃদ্ধের শরীর থেকে যেটুকু রক্ত পড়ে আছে, সেটুকু দিন দিন শুষে নেবার উল্লাস। বৃদ্ধ হাত পা নাড়তে পারেন না। অসাড় অংশে তেমন টের পান না। যেটুকু অংশে সাড় আছে লঙ্কাবাটার মত জ্বলতে থাকে। ক্ষীণ গলায় ডাকতে থাকেন—বউমা, বউমা মশারিটা। বউমা শুনেও শোনে না। থাকো ব্যাটা বুড়ো, খোলা পড়ে থাকো, রৌরব নামক নরকে। সুস্থ অবস্থায় বউমার পেছনে লাগবার শাস্তি! ছেলে এসে মশারি ফেলবে। কি আশ্চর্য! বৃদ্ধ ইদানীং একটু একটু হাত পা নাড়তে পারছেন। ডাক্তার বলছেন—আকু-পাংচারে কাজ হচ্ছে। বউমার মহা আপসোস। মন্দ করতে গিয়ে ভাল হয়ে গেল যে বে বাবা! এখন সারা দিনই মশারির ভেতর রাখে। বৃদ্ধ আগের চেয়ে জোর গলায় চিৎকার করেন—বউমা মশারিটা তুলে দিয়ে যাও। বউমা শুনেও শোনে না। ও ভুল আর করছি না বাছাধন। তুমি খাড়া হলেই আগের মূর্তি ধরবে।

চিত্রার কাজ বেড়েছে। শোবার আগে, মশারির ভেতর হাঁটু গেড়ে বসে লাফিয়ে লাফিয়ে মশা মারে একটা একটা করে। চিত্রা বলে, কামড তবু সহ্য করা যায় কিন্তু কানের কাছে সারা রাত কালোয়াতি অসহ্য। রবির খুব মজা। শুয়ে শুয়ে চিত্রার হাঁটুমোড়া হাত তোলা নৃত্য দেখে, আলো নেবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত

করে।

অব্যর্থ ধূপ বের করেছেন, ভেষজ শাস্ত্র মন্থন করে অবিনাশবাবু। এক হাত লম্বা, মোটা কাণ্ডর মত মিশমিশে কালো বস্তু। বাল্যবন্ধু সুধাসিন্ধুকে একটি উপহার দিয়ে বললেন—জ্বালিয়ে দেখো, মশারা সব গুলিলাগা প্লেনের মত ঘুরপাক খেতে খেতে পড়বে। এক প্যাকেট দেশলাই ফাঁক, ধূপ আর জ্বলে না। সুধাবাবুর স্ত্রী বললেন, কেরোসিনে আগে চুবিয়ে নাও তবে যদি জ্বলে। অবশেষে ধূপ জ্বলল। এ ধূপ বসবে কিসে? সাধারণ ধূপদানীতে তো হবে না। আধখানা লাউ ছিল ঘরে, তাইতেই গোঁজা হল। ধূপের যেমন আকৃতি তেমনি ধোঁয়া, তেমনি উৎকট গন্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুধাসিন্ধু সপরিবারে রাস্তার খোলা হাওয়ায়। অবিনাশ বললেন, মাই পারপাস ইজ সার্ভড। মশা কিন্তু ভাই একটাও মরেনি। ঘরের মধ্যে যেমন ভ্যান ভ্যান করে তেমনি করেছে মহা উল্লাসে। তাতে কি! মশা থেকে তোমাকে দূরে রাখতে পেরেছি, সেইটাই তো আমার সাকসেস হে!

মেয়র সাহেব! কলকাতার মশা যে আপনার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কলকাতাবাসীকে এই ত্রাসের হাত থেকে রক্ষার কোনো উপায় আপনার জানা নেই?

আছে। আছে! নিশ্চয়ই আছে। কি উপায় স্যার! প্রাকৃতিক উপায়। ঘরে ঘরে কোলাব্যাঙের চাষ করান। জানেন নিশ্চই ব্যাঙ মশা খায়। সারা ঘরে কেঁদো কেঁদো ব্যাঙ থপ থপ করে ঘুরবে আর কপাক কপাক করে মশা ধরবে। ব্যাঙ একটু পোষ মেনে গেলে মশারির মধ্যে নিয়েও শুতে পারেন।

সেকি মশাই! আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই। মোটা বউ নিয়ে শুতে পারেন, কোলা ব্যাঙ নিয়ে শুতে পারবেন না! ব্যাঙ এমন কিছু খারাপ শয্যাসঙ্গী নয়, মাঝে মাঝে একটু জলত্যাগ করে এই যা, আর বর্ষাকালে একটু ডাকাডাকি করে। তা মশাই, আপনার স্ত্রীর হাঁকডাকেরও কি কিছু কমতি আছে!

"নিজের মশা নিজের মার"

টেসটিং! হ্যালো। হ্যালো। মাইক টেসটিং। ওয়ান, টু, থ্রি, এইট, নাইন, জিরো। টেসটিং। ঠাস ঠাস ঠাস তিনবার টুসকি। মাইক রেডি। চেয়ারম্যান আগে বলবেন। চেয়ারম্যান চেয়ারে বসে থেকেই ভেঙচি কেটে বললেন—চেয়ারম্যান আগে বলবেন! কোনো সভায় চেয়ারম্যানকে আগে বলতে শুনেছেন! চেয়ারম্যান বলেন সবশেষে। আগে অন্যান্যরা বলবেন। মিঃ ঢোলাকিয়া, মুখ থেকে পান ফেলুন। যান আগে আপনি বলুন, আপনার এলাকা। হাঁ হাঁ সো বাততো ঠিকই আছে। ঢোলাকিয়া তিনবার চেষ্টা করে, চেয়ার থেকে পিপের মত শরীরটা তুললেন। মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। যাবার সময়, পায়ের চাপে, মঞ্চের পাটাতন, অধস্তন কর্মচারীদের বিক্ষোভের মত মৃদু মৃদু আর্তনাদ করে উঠল। ভেঙে পড়ল না।

ঢোলাকিয়া পরেছেন, টেরিসিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি। পঞ্চান্ন ইঞ্চি বহরের টেরিকটন ধুতি। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, গলায় সোনার হার। হাতে সোনালী ব্যাণ্ডের হাত ঘড়ি। ঢোলাকিয়া পানখাওয়া দাঁত মেলে, সভাস্থ সকলের দিকে তাকিয়ে স্বর্গীয় হাসি বিতরণ করলেন, তারপর মাইক্রোফোনের গলাটা আততায়ীর হাতে চেপে ধরলেন। চেয়ারম্যান চিৎকার করলেন, গণেশ, গণেশ, অ্যানাউন্‌সমেণ্ট, অ্যানাউন্‌সমেণ্ট। রোগামত এক ভদ্রলোক, পর্বতের মত ঢোলাকিয়ার পেছন থেকে মূষিকের মত লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন। ডান পাশ, বাঁ পাশ কোনো পাশ থেকেই, চেষ্টা করেও মাইকের নাগাল না পেয়ে বলে উঠলেন, ধ্যাত্‌তেরিকা! ঢোলাকিয়াও আশেপাশে কি একটা সুড় সুড় করছে টের পেয়ে, হ্যাত্‌তেরিকা বলে হাত ঝাড়ছেন। ভেবেছেন, মাছি অথবা পিঁপড়ে। কিছুক্ষণ, ধ্যাত্‌তেরিকা, হ্যাত্‌তেরিকা হতে লাগল। চেয়ারম্যান হেঁকে বললেন, ঢোলাকিয়া, আগে অ্যানাউন্‌সমেণ্ট।

গণেশবাবু মাইকের সামনে দাঁড়িয়েই, দম না নিয়ে বলতে শুরু করলেন—বন্ধুগণ, আপনারা কাগজে পড়েছেন মশা মাবার মশা নিয়ে ঘর-সংসার করার কায়দা শেখাবার জন্যে একটা কমিটি হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই রকম শত শত কমিটি হবে। এই কমিটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অগণতান্ত্রিক। মশা মারার নামে রাজনীতি হোক, এ আমরা গোড়া থেকেই চাই না। অগণতান্ত্রিক, কারণ গণতন্ত্রে সমস্ত মানুষই একটি ভোট ছাড়া কিছুই নয়। মশাকে শুধুমাত্র একটি ভোট ভেবে বসে থাকলে, কোনো দিনই এই ক্ষুদ্র শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। মশা মারতে কামান দাগা চলে না। মানুষ মারতে কামান দাগলে, কেউ হাসবে না, কেউ আমাদের মূর্খ বলবে না। মশাদের উদ্বাস্তু করা যায় না। তারা মানুষ নয়। উদ্বাস্তু করতে পারলে, তাদের নিয়ে রাজনীতি করা যেত, গণতান্ত্রিক উপায়ে ধীরে ধীরে উৎখাত করা যেত। মশারা অতি প্রবল প্রাণী। এদের চিৎ করে ফেলে, গলায় গামছা দিয়ে, হাতে কিম্বা ভাতে মারা যায় না। ভয় দেখিয়ে, কিম্বা লোভ দেখিয়েও এদের বশে রাখা সম্ভব নয়। এরা সরষের তেল খায় না, গুঁড়ো মশলা খায় না যে ক্যানসারে মরবে। এদের ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া হয় না, এনকেফেলাইটিস হয় না, কারণ এরা ওই সব হয়ে বসে আছে। এই সব একরোখা, অরাজনৈতিক, অভাবতীয় মশাদের নিয়ে মহা জ্বালা। বাঙালী মরতে ভয় পায় না। ভয় যদি পেত তা হলে বাঙালী হয়ে জন্মাত না। বাঙালী মরাব জন্যে, মাব খাবাব জন্যেই জন্মেছে। বাঙালী সব সহ্য করতে পাবে, পাবে না তিনটে জিনিস—এক বাঙালী বাঙালীকে সহ্য কবতে পারে না, দুই, গবমে পাখা বন্ধ সহ্য করতে পারে না, তিন মশার দংশন সহ্য কবতে পারে না। স্পর্শকাতব এই বাঙালীকে তাই আমবা মশার সঙ্গে ঘব করতে শেখাবো। নিন শ্রীঢোলাকিয়া বলুন। শ্রীঢোলাকিয়া এই অঞ্চলের একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। এই মুল্লুকেব মসকুইটো মিনেস কমিটিব কনভেনার।

ঢোলাকিয়া আবাব হাসলেন। পিচ করে ডান দিকে থুতু ফেললেন, তারপব মাইক্রোফোনেব গলা চেপে ধরলেন। চাব আঙুলে, চারটে আঙটি। ভাই সোব! এ মাবপিটকা বাত নেহি। এ বাঙ্গালী নন-বাঙ্গালীকা হিসসা না আছে। দুনিয়ামে বাত এক হি আছে—মহববত প্রেম। প্রেম সে সভ কছু কোরতে হোবে। মানষকে আপনি হোত্যা করুন, কোই কুছু বোলবেনা। মানুষের বুদ্ধি আছে, শক্তি ভি আছে। বাঁচনেকা মরনেকা, মারনেকা ভি ক্ষমতা আছে।

যো মারতা হায়, যো মরতা হায় দোনোই ভগবানের উলল্ আছে। উসকো ফয়সালা উস শালেকো করনে দো। পেয়ারমে বাঁচো তো বাঁচো, নেহি তো মরো। লেকিন বাত হয় না ভাই, জীবে দোয়া কেরে যো যোন, সো যোন সেবিছে ঈশ্বর। মচ্ছর জীব হ্যায় ভাই। উসকো, বুদ্ধিউদ্ধি কুচ্ নেই, শিশুকো মাফিক। উসকো মারনেকা বাত আতা ক্যায়সে। উয়ো মারে, যা মরে। উসকো প্রেম দিলাতে হবে, উসকো অন্দর মে প্রেম ঘুষাতে হবে। বিলকুল শক্ত কাম আছে। ইস লিয়ে লিডর্‌র্‌র্ চাই, লিডর্‌র্‌র্, যো উসকো সমঝাবে, কাটনে মে কেয়া হায় ভাই! ক্যা ফয়দা হায় উসমে। হামার বুকে এসে যাও ভাই চুমাউমা দাও। ফিন্ উড়ে যাও। হামি সবকোইকো প্রেমকা আঁখসে দেখি, এ জীবন হায় স্বপ্না।

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে, কে একজন ব্যাঙ্গ করে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার প্রেম জানা আছে, ভেজাল খাইয়ে খাইয়ে সব মেরে ফেললে, এখন সভায় দাঁড়িয়ে পেয়ার শেখাচ্ছে।

ঢোলাকিয়া যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন—হাঁ মশাই, ও বাত তো ঠিক আছে, হামি ভেজাল দিচ্ছে লেকিন তুমি কেন খাচ্ছে! এক গানা তো শুনেছে—জেনে



হামার বুকে এসে যাও ভাই চুমাউমা দিয়ে যাও

শুনে বিষ করিয়েছে পান। তুমহার বউ যোখোন বোলে, হাঁ গো সরসুন্দু তেল লিয়ে এসো, মছ্‌লি হোবে, তুমি তোখোন টিন লিয়ে ঢোলাকিয়ার পাশ আসে কেনো। তুমহার বউ যোখোন মোশলা পিষতে না চায়, তোখোন গঁড়া মশলা আন কেনো! বোলো, বাঙালীবাবু! ঢোলাকিয়া তুমহার কি কোরবে ভাই, বাঙালী শিউশঙ্কর ভগবান হোয়ে গেছে—নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ।

চেয়ারম্যান খুব চটে গেলেন। চটে গিয়ে বললেন—আমরা মশা মারার সেল্‌ফ হেল্‌প শেখাতে এসেছি। আমাদের এই প্রকল্পের নাম—নিজের মশা নিজে মার। আপনারা যদি মন দিয়ে না শোনেন, হাজার হাজার মশার খপপরে ফেলে রেখে আমরা সরে পড়ব। সরে পড়াই আমাদের চিরকালের অভ্যাস। যেচে ধরা দিতে এসেছি। এর পর আর সেধে আসব না। তখন সাধ্য সাধনা করলেও আর আমাদের পাবেন না।

বলুন, বলুন, শব্দ উঠল সভা মণ্ডপে।

ঢোলাকিয়াকে যে ভদ্রলোক আক্রমণ করেছিলেন, পাশে বসেছিলেন তাঁর স্ত্রী। স্বামীকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে বললেন, তোমার আর কি, সারাদিন অফিসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকো, মাঝরাতে, এলেলেলে করে টাল খেতে খেতে বাড়ি ফিরে দরজা গোড়াতেই উল্টে পড়, মাতালের মরণ। চুপ করে বোসো না। আমাকে শুনতে দাও।

মশা বিশেষজ্ঞ, শ্রীহিমাংশু গুপ্ত এখন কিছু বলবেন।

মশা জলে জন্মায়। বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না। জল জমলেই ছেঁচে ফেলে দেবেন। এমন জায়গায় ফেলবেন, যেখানে আবার যেন জমতে না পায়।

জল ছেঁচে ফেলবো কি মশাই! কি দিয়ে ছেঁচবো কে ছেঁচবে! বড় বড় মুখ খোলা নর্দমা, সারা বছর জল জমে ভ্যাট ভ্যাট করছে। সেই নর্দমা আমরা ছেঁচে ফেলবো! মামার বাড়ি! মামদোবাজি! এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তেরিয়া হয়ে উঠলেন।

বক্তা বললেন, শুনুন, শুনুন, নর্দমা থেকে সব সময় এক মাইল দূরে বাসা করবেন। মশাদের জন্যে নর্দমা ছেড়ে দিন, আর ছেড়ে দিন মাঝরাতের মাতালদের জন্যে। নর্দমার পাশে বসবাস কে আপনাকে করতে বলেছে। মশা মাইলখানেক উড়তে পারে। অতএব এক মাইল দূরে থাকাই নিরাপদ। হয় একেবারে নর্দমার ভেতরে থাকুন, না হলে এক মাইল দূরে থাকুন। আমি যা পড়েছি, তাই বলছি। করতে পারেন ভাল, না পারেন, আমি কি জানি।

আর এক বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন, এই যে, 'বুকাভিজ্ঞ', মশা আজকাল খাটের তলায়, জামার পকেটে, মেয়েদের মাথার ঘন চুলে জন্মায়। দিনের পর দিন আমি লক্ষ করে দেখেছি।

ধ্যাত মশাই! লক্ষ করে দেখেছি! আমি মশা-পণ্ডিত, মসকুইটো একসপার্ট, আমাকে আপনি মশার জন্মবৃত্তান্ত শেখাবেন না। মশা জন্মায় জলে, আশ্রয় নেয় ঘরে, মরে মানুষের চড়ে চাপড়ে।

ধোব মশাই, দেখছি খাটের তলায় মশার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, পিল পিল করে বেরোচ্ছে। তবু বলবেন, মশা জলে জন্মায়!

সে তো ফুটপাথে মানুষের ছেলে হচ্ছে, তার আমি করব কি! ঘর থেকে খাট বিদায় করে মেঝেতে শোবার অভ্যাস করুন। জামার পকেট উল্টে রাখুন,



মেরেছ কলসির কানা তা বলে কি

যেভাবে ঘট উল্টে রাখে। কিম্বা মেঝেতে আগে একটা বিছানা পাতুন, তার ওপর খাট রাখুন, তার ওপর ঝুলে বড় মেঝে পর্যন্ত একটা মশারি ফেলে বিছানার সঙ্গে চারপাশ গুঁজে দিন। আপনার মশার জন্মস্থান বন্ধ হল। আমার মাথায় এই মুহূর্তে আর কোনো প্ল্যান আসছে না। পরে এলে শোনাবো!

এই বার, কমিটির চেয়ারম্যান কিছু প্ল্যান বাতলাবেন। মাইক, মাইক। মাইকটা টেবিলের সামনে দাও।

বন্ধুগণ, আমি বিপ্লবী মানুষ, আমার মাথায় যা আসে, তা হল আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। আমি চাই প্রতিটি মানুষের রক্তে আগুন জ্বলে উঠুক। মশা রক্তবিলাসী। ছেলেবেলার কথা মনে করুন, রান্না ঘরে চুরি করে কিছু খেয়ে ধরা পড়ে গেলেই, মা বলতেন, আর একবার চুরি দেখি, ওই নোলায় ছেঁকা দিয়ে দোবো। হায়, হায়, কোথায় গেল সেই সব মায়েরা!

চেয়ারম্যান জামার হাতায় চোখ মুছলেন। ধরা ধরা গলায় বললেন, মশাদের নোলায় ছেঁকা দিতে হবে। রক্তের উত্তাপ বাড়াতে হবে। খোওব ঝাল খান, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, মরীচ, আদা, সব সময় রেগে লাল হয়ে থাকুন, সব সময় মারদাঙ্গা খ্যাচাখেচি ছেলেকে ধরে পেটান। প্রতিবেশীকে ধরে ঘুষোঘুষি করুন, সব সময় হট টেম্পার, মিলিট্রি মেজাজ। দেখি মশা কি করে রক্তে মুখ দেয়! হে হে বাওবাঃ! মা লক্ষ্মীদের জিজ্ঞেস করি, তোমরা মা আজকাল, রাস্তায় যেভাবে চারদিক খুলে উদোম হয়ে বেরোও, বাড়িতেও কি সেই ভাবে থাকো! হে হে, তাহলে কিন্তু মায়েরা, মশা যে কামড়াবেই! একে লোভী, তার ওপর প্রলোভনা। একটু ঢেকেঢুকে চাপাচুপি দিয়ে থেকো। একটু ধুপধুনো দিও, শাঁখটাঁখ বাজিও। ঘরের কোণে কোণে মাটির সরায় একটু বেশী করে চিটে গুড় রেখে দিও, মশাদের গুড়কলে ফেলে কাবু করে রাখা। আর একটা, যাদের গায়ের রঙ গৌর কিম্বা কটা, তারা এক পোঁছ করে আলকাতরা মেখে বসে থাকো। কালোদের মশা একটু কম কামড়ায়।

ওয়ার্ক এডুকেশান

চারদিকে চারটে টেলিফোন সাজিয়ে দ্বীপেশবাবু গম্ভীর মুখে বসে আছেন। যে ভরাট মুখে সদা সর্বদাই হাসি দেখি, আজ সে হাসি কে ইরেজ করে দিলে! একটা টেলিফোনের চাকতি অনবরতই ঘুরিয়ে চলেছেন। নন-স্টপ, লাগাতার। অবশেষে দুম্। শালা। সিগারেট। ঘূর্ণায়মান চেয়ারে চেতল মাছের মত চেতিয়ে পড়লেন। পেটটা একটু টান টান হল। পট্ করে একটা প্যাণ্টের বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে টেবিলের তলায় চলে গেল। বন্ধুর এমত ছিলেছেঁড়া অবস্থা উল্টো দিকের চেয়ারে বসে চুপ করে দেখা যায় না। রাজদ্বারে আর শ্মশানেই তো বন্ধুর পরিচয়! এটা শ্মশান নয় রাজদ্বার। বাজার দর যে রকম বেড়েছে তাতে শাঁসালো বন্ধুবান্ধবদের একটু খবরটবর রাখতেই হয়। চা, সিগারেট ইত্যাদি ন্যূনতম ভদ্রতা। বোকা আত্মীয়স্বজন খুঁজে পেতে বের করতে হয়। ছুটির দিন সকালে, বেশ সপরিবারে, রাজা রাণী, সারি সারি বোড়ে গুটি গুটি হাজির হয়ে যাও। ফ্রায়েড রাইস হেঁ, হেঁ, একটু নতুন গুড়ের পায়েস, নিদেন প্রেসার কুকারে ঝুরঝুরে খিচুড়ি। দু টাকার কমলালেবু ইনভেস্ট করে টু ইণ্টু টেন কি টুয়েলভ ?

খুব জরুরি ফোন মনে হচ্ছে! প্রায় আধ ঘণ্টা হল এসেছি, এখনো চায়ের অর্ডার গেলো না। কোন্ একসচেঞ্জ! ডবল সেভেন! দিন একবার চেষ্টা করে দেখি। সম্প্রতি আমি টেলিফোন মাদুলি ধারণ করেছি। ভূতঘাটের কাছে এক সিদ্ধ যোগীকে পেয়ে একটু খরচ করে একসেট মাদুলি করিয়ে সর্বাঙ্গে ধারণ করে বসে আছি। টেলিফোন মাদুলি—একবার চাকা ঘোরালেই যাতে লাইন পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক বিল মাদুলি—দুম করে পিলে চমকানো বিল যাতে না আসে। বাস মাদুলি—স্টপেজে দাঁড়ালেই যাতে মোটামুটি খালি একটা স্টেট বাস আসে এবং সে বাস যেন ব্রেকডাউন না হয়ে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত যায়। জল মাদুলি, সকালে কলে যেন স্নানের জল থাকে।

দ্বীপেশবাবু মাদুলি-ফাদুলি তেমন বিশ্বাস করেন না। পুরুষকার! বোম্বেটেদের মত গোঁফ। রিসিভারটা হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন চেষ্টা করে। পাবেন বলে মনে হয় না। বাড়ির লাইন। অফিসে এসে তক চেষ্টা করছি। আমার মাদুলি যশ, দ্বীপেশের কপাল ! টাক্ করে লাইনটা পাওয়া গেল। দ্বীপেশ বলছেন, কে মহুয়া ' কেমন আছে! অ্যাঁ! ফুটো বন্ধ হয়েছে। ঘিলু বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে না। কি করছে। শুয়ে আছে! বেশ বেশ। ফোন শেষ হল। ব্যাপারটা কি!

ওয়ার্ক এডুকেশান। তার মানে! মানে, কর্মশিক্ষা। কাকে আমার পুত্রের ব্রহ্মতালু ঠুকরে ছেঁদা করে দিয়েছে। সেই ছেঁদা কিছুক্ষণ আগে মোম দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। ওয়ার্ক এডুকেশানের সঙ্গে কাগের কি সম্পর্ক! আছে ভাই আছে। কর্মের সঙ্গে কর্মফলের সম্পর্ক নেই? বলেন কি। কর্মফলে মানুষ কলকাতায় আসে, তারপর সংসারী হয়, ছেলেপুলে হয়। মাতার গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ভর্তির ফর্মের জন্যে লম্বা লাইন লাগাতে হয়। তারপর মহাভারত করতে হয়। মহাভারত করতে

হয় মানে! মানে! সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অ্যাডমিশান টেস্টের ব্যূহ ভেদের কৌশল শেখাতে হবে অভিমন্যুকে। রোজ রাতে গর্ভস্থ সন্তানকে অর্জুন অবজেকটিভ টেস্টের তালিম দিয়ে চলে। পাঁচ হাজারে পাঁচ জন হয়তো অ্যাডমিশান পাবে। পঞ্চাশখানা বই। একশো খাতা। সবার ওপরে ওয়ার্ক এডুকেশান। তা এর মধ্যে কাক আসে কি করে? বাঃ আসবে না! কাক আসবে, কোকিল আসবে, চন্দনা, টিয়া আসবে, পেঙ্গুইন আসবে, পেলিকেন আসবে, হরেক রকম প্রজাপতি আসবে, লক্ষ রকম গাছের পাতা আসবে, পাখির বাসা আসবে, বাঘের দুধ আসবে, গন্ডারের নাক আসবে সিংহের কেশর আসবে, গুষ্ঠির পিন্ডি আসবে।

রেগে গেছেন মনে হচ্ছে! রাগলে চলবে কেন ভাই। সবে তো কলির সন্ধ্যে! রাগ নয় ভাবনা। বছর দশেক বয়েসের ছেলে। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবল। হাত পা লিকলিকে। শরীরের সব পুষ্টি মাথা টেনে নিচ্ছে। মাথায় বুদ্ধির আগুন ঠিক রাখতে উনুনের তলায় গুঁজছি—ছানা, ডিম, মাখম, কড়াপাক, নরম পাক, হোয়াইট মিট, গাজর, বিট। খাদ্যের তালিকায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা। শীতের ভোরে বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েই চোখে এক থাবড়া ঠান্ডা জল, এক গেলাস গরম দুধ সঙ্গে কৌটোর প্রোটিন, 'মেলো এগ', দুটো বিস্কুটের মাঝখানে মাখমের প্যাচ, মাল্টি ভিটামিন। তারপর একপাশে মা. তার পাশে গ্যাসের উনুন, দুটো বার্নারে দুটো প্রেসার কুকার, হাতে ছুরি, কোলে ফুল কপি, ডান চোখ কপির দিকে, বাঁ চোখ ছেলের অঙ্কের খাতার দিকে। আর এক পাশে বাবা। একগালে সাবান, হাতে সেফটি রেজার, একটা চোখ আয়নার দিকে, আর একটা চোখ খোলা খাতার দিকে। করুন তো মশাই একটা অঙ্ক—দুটো সংখ্যার বিয়োগ ফল ১৪০, সংখ্যা দুটোর লসাগু ৭০৯৫, সংখ্যা দুটো কি! নাওয়া-খাওয়া আমাদের মাথায় উঠে গেছে মশাই। গত সাত দিন ধরে পেছন উলটে ওই সংখ্যা দুটো ধরার চেষ্টা করছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ওয়ার্ক এডুকে-শানের পাখি ধরা। চল্লিশ রকমের পাখির পালক সংগ্রহ করে আঠা দিয়ে খাতার পাতায় সাঁটতে হবে। চা খেতে খেতে চল্লিশ রকমের পাখির একটা লিস্ট তৈরি করে দিন তো, তারপর দেখি, স্বামী স্ত্রী, কিরাত কিরাতী হয়ে আঠা কাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পাখি ধরতে। চড়াই, শালিক, গানশালিক, ছাতারে, দোয়েল, কোয়েল, টিয়া, বাবুই, কাক, মাছরাঙা, বক, চিল, শকুন। চড়াই বাড়িতে পাবো, ঘুঘু ভিটেয় পাবো, শকুন ধাপার মাঠে পাবো। কাক ক্যানসেল। সাংঘাতিক পাখি মশাই। বাড়ির পাশে একটা গাছ। গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে ছাদে। ডালে কাকের বাসা। সাত সকালে ছেলে আঁকশি দিয়ে কি কেরামতি করতে গিয়েছিল কত্তা গিন্নি দুজনেই এসে ব্রহ্মতালুতে ঠকাঠক। ক্লিন ছেঁদা। ছেঁদা দিয়ে ব্রেন লিক করছে। পুরোনো কলকাতায় হুতোমের আমলের কোনো ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় কিনা দেখি, তাহলে হয়তো বুলবুলি আর পায়রা পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা মুরগি কি পাখির মধ্যে পড়বে।

দ্বীপেশের ফোন আবার খুর খুর করে উঠল। কথা বলতে বলতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাল-ভাঙা-নাবিক যেন সবুজ দারুচিনির দ্বীপ দেখেছেন। বড়ই সুখবর! কি খবর! চিড়িয়াখানার ডিরেকটর এক প্যাকেট পালক রেডি রেখেছেন। যাই পেট্রল পুড়িয়ে নিয়ে আসি। তাহলে চলুন আমিও যাই। আমারও ওয়ার্ক এডুকেশান। আমার অবশ্য পালক নয়। প্রাণীদের দেহ

আবরণ যেমন, কচ্ছপের খোল, কাঁকড়া, সাপের খোলোস, মানুষের মুখোস।

ওঠার মুখে দ্বীপেশের অধস্তন কর্মচারী গোবেচারা নন্দবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার! কোনো মৃত্যু সংবাদ! তার চেয়েও খারাপ। আমার স্ত্রী হাজতে। কারণ! সরকারী উদ্যানে ঢুকে গাছের পাতা ছেঁড়ার অপরাধে। কেন মাথা খারাপ নাকি। আজ্ঞে না। মেয়ের ওয়ার্ক এডুকেশানের গাছের পাতা। আমাকে বলেছিল পালক, কাল অফিসের ফেদার ডাস্টারটা পেট-কাপড়ে করে নিয়ে গেছি! পাতার কথায় মিষ্টির দোকান থেকে শালপাতা আর ছাদের কার্নিস থেকে বটপাতা যোগাড় করে দিয়েছিলুম। এখন বুঝেছি স্বামীজী কেন বলেছিলেন চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না।

আজ্ঞে হ্যাঁ, চালাকির দ্বারা আর যাই হোক ওয়ার্ক এডুকেশান হয় না। পাপিয়ার মা পুতুল তৈরি করবেন, সুনন্দর বাবা নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে আরশোলার অন্ত্রের ছবি আঁকবেন, অলকার দিদি ডিমের খোলে মোম ঢেলে মোম ডিম বানাবে, পটলবাবু পাকা চুল দিয়ে নাগা মুখোস তৈরি করবেন, দিদিমণিরা পরীক্ষা করে ঘরকাটা কাগজে নম্বর বসাবেন। ছাত্রছাত্রীরা ডিভিসান পাবে। এডুকেশান ইজ দি মেনিফেস্টেসান অফ পারফেকসান অলরেডি ইন ম্যান।

ছাতা বিষয়ক প্রবন্ধ

ছাতা বলতে আপত্তি নেই, ছাতি বললেও ভুল হবে না। অভিধান দুটি ব্যবহারই সমর্থন করছে। ছাতি থাকে বুকে। যার আড়ালে হৃদয়, মান-অভিমান, প্রেম-ভালবাসা, ক্রোধ-হিংসা, ত্যাগ-লালসা। ছাতা থাকে মাথায়, যার তলায় মগজ, বুদ্ধি, বোকামি দেবত্ব শয়তানী। সায়েবদের হাতে আমব্রেলা—ল্যাটিন আমব্রাতে একটু রেলা যোগ করে আমব্রেলা। আমব্রা মানে ছায়া। হাতে ধরা হাতলের মাথায় চাঁদি বাঁচাবার গোল ছায়া! সায়েবদের দেশে রোদই ওঠে না তবু আমব্রা-দায়ী আমব্রেলার ব্যবস্থা। ছায়ার জন্যে নয় বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যেই ছাতার প্রয়োজন! ছাতা একটু ছোট হয়ে বেশ চিকনচিকন, সরু মত হলেই সায়েবরা বলবেন--প্যারেসোল। সেই ল্যাটিন! ল্যাটিন ছাড়া নাম জমে না। ল্যাটিন 'প্যারার' ইংরেজীর কুলে উঠে—'প্রিপেয়ার'—তৈরি করে দেওয়া, কি তৈরি! 'সল' মানে সূর্য, সূর্যকে যে তৈরি করে দেয় তিনিই প্যারেসোল।

ছাতা বড় মেয়েলী জিনিস। গ্রীস আর রোমের সুন্দর সুন্দর মেয়েরা, সেই কথের দৌড়ের কালে, সক্রেটিসের কালে ছাতা মাথায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, অলিভ-পাকান-রোদে ফুরফুর করে ঘুরতেন। ছাতা তখন প্রয়োজনের চেয়ে ফ্যাশানের অঙ্গ। রোমের সুদিন যেই চলে গেল ছাতার জনপ্রিয়তাও কমতে কমতে, মাথা ছাতাহারা হল। ছাতা আবার ফিরে এল রেনেসাঁর রোদবৃষ্টি থেকে সংস্কৃতিবানদের মাথা বাঁচাতে। উত্তর আর দক্ষিণ ইউরোপে 'ছাতার' মত ছাতা দেখা দিল। হাতে হাতে আমব্রেলা, প্যারেসোল। ইংরেজ শিল্পীদের আঁকা ছবিতে প্রথম ছাতা দেখা গেল ১৫৯৬ সালে। ছাতার মত ছাতা এল সপ্তদশ, অষ্টাদশ



ছাতার মত ছাতা

শতকের রাজপথে। ছাতা তখন আর ছাতা নয়, মহিলাদের পোশাকের অংশ। যার যত পয়সা তার ছাতার তত গরব। গর্বিনী তোমাকে দেখি না তোমার ছাতা দেখি। হাড়ের হাতলে কত কারুকার্য। মণিমাণিক্য বসানো। কালো ঝকঝকে সিল্কের কাপড়ের চার পাশে ঝালরের বাহার। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন খানদানি ইউরোপীয় মহিলা গ্রীষ্মকালে ছাতা না নিয়ে রাস্তায় নামতেন না।

বিলিতি ভার্সাস দিশী ছাতা

বাঁশ কিংবা বেতের বাঁকানো হাতল। সিকের ওপর চাপানো মোটা পুরু কাপড়। কুচকুচে কালো নয় সাদাটে কালো। তলার দিকে একটা সাঁপি লাগানো। ছাতাটা মুড়লেও ফুলে থাকবে, হাত-পা ছড়িয়ে থাকবে। বন্ধ করার সময় ঝপাত্ করে বন্ধ হবে, মাঝে মাঝে আঙুল চিমটে যাবে। ওজন-দার বিবর্ণ ত্রিভঙ্গ-মুরারী, এমত একটি আকৃতির নাম দিশী ছাতা। নেটিভদের ঘেমো বগলে এই বস্তু ঘোরাফেরা করত। এই ধরনের ছাতার হাতলকে বলে—ছাতার বাঁট।

দিশী ছাতার বহুমুখী প্রয়োগ। এই ছাতা মাথায় দিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে জোতদার চাষের মাঠে মজুর খাটান। কনট্র্যাকটার বাড়ি তৈরি তদারকি করেন। নায়েব চলেন খাজনা আদায়ে। গুরু চলেন শিষ্যবাড়িতে। হেড পণ্ডিত অবাধ্য ছেলেকে ছাতাপেটা করেন। পাওনাদার ছাতার বাঁট দিয়ে গলা টেনে ধরেন। ক্লান্ত পথিক ছাতা দিয়ে রক পরিষ্কার করে মোড়া ছাতা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েন। গঙ্গার পৈঠেতে ব্রাহ্মণ বসে থাকেন ছাতা মাথায়, যুবতী মহিলারা কপালে চন্দনের

নকশা করে দেবার জন্যে। রাস্তার পাশে তালিমারা ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকে চর্মকার। জুতো পেলেই সেলাই ফোঁড়াই, চামড়া জোড়া, পেরেক পেটানো।

যত সব দিশী কাজে, দিশী ছাতার সাবেক ব্যবহার। এই সব কাজের লোকের কাজের ছাতা তৈরি হত জেলখানায়। মোটাসোটা। শক্ত সমর্থ। শৌখীন নয় টেঁকসই।

ছাতা যদি নিতেই হয়

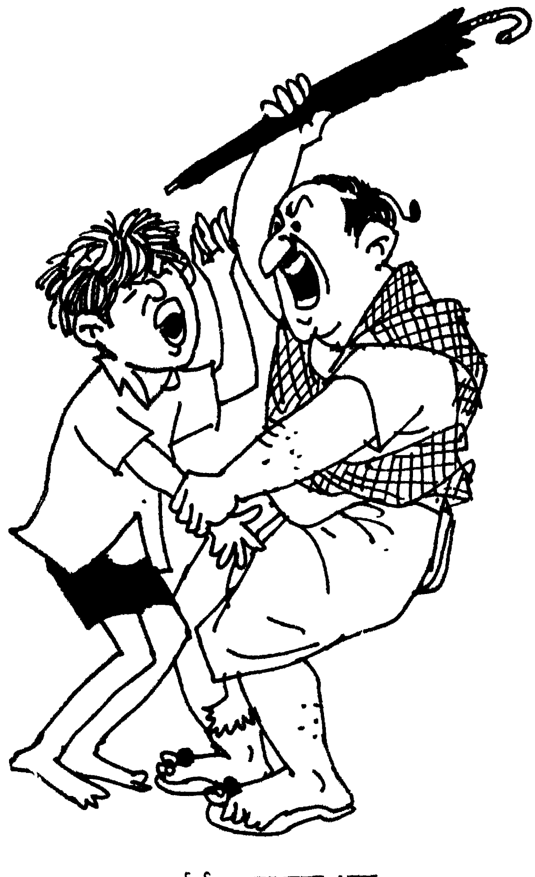
ছাতা যদি নিতেই হয় তাহলে কম দামের ছাতা নিয়েই ছাতাভ্যাস করা ভাল। একশো রোগী মেরে যেমন বৈদ্য হয়। বেশ কিছু ছাতা হারিয়ে তবেই ভেটারেন ছত্রধারী হওয়া যায়। প্রবীণ মানুষেরা নবীনকে এই উপদেশ দেবেন—ছাতা যদি মাথার ওপর মেলা থাকে ভয় নেই। ধর, রোদ নেই, বৃষ্টিও হচ্ছে না, তখন তুমি ছাতাটিকে মুড়ে ফেলবে। দু হাতেই মুড়বে, কারণ তুমি নভিস। অভ্যাস হয়ে গেলে এক হাতেই মুড়তে পারবে। সেটা অবশ্য সময়সাপেক্ষ। ফুটপাথ থেকে মোটা রবারের একটা গোল রিং কিনবে দশ পয়সা দিয়ে। হাঁসের গলায় গোল আংটা পরাবার কায়দায়, ছাতার গলাতেও ওটিকে পরিয়ে দেবে। জেনে রেখো, এটি বড় উপকারী জিনিস। ছাতার ছ্যাতরানো সিক, অবাধ্য সিক, গলাবন্ধ পরে একান্নবর্তী হয়ে থাকবে। ছাতারও চরিত্র আছে জানবে, যেমনঃ সিক যত মত তত পথের মত কিংবা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইয়ের মত অথবা মন্ত্রিসভার সদস্যদের মত, রাজনৈতিক দলের মত, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে, গলাগলি করে থাকতে চায় না। ওরা ছ্যাতরাবেই, আর সুযোগ পেলেই বস্ত্র ত্যাগ করে নিজের খোঁচা মারা স্বভাবটিকে উলঙ্গ করে রাখতে চাইবে। সিকের ধর্মই হল পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির মাথার চাঁদিতে ঠোক্কর মারা পরিপাটি চুল অবিন্যস্ত করে দেওয়া, হাত বাড়িয়ে কাছা টেনে ধরা, পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকে পড়ে রুমাল টেনে আনা, যে কোনো জায়গায় সুযোগ পেলেই আটকে বসে থাকা। মেয়েদের ছাতার সিক চোখ থেকে চশমা খুলে দেবার জন্যে তাক করেই থাকে। শাস্ত্রের নির্দেশ—মহিলাদের মুখের দিকে তাকাবে না, খুব ইচ্ছে হলে পায়ের দিকে তাকাতে পার এবং মনে মনে ভাববে মা জননীর পায়ে আমার চক্ষু দুটি লুটিয়ে আছে ভ্রমর হয়ে। শাস্ত্রকে আরও একটু প্রসারিত করে দেবে ছত্রধারিণীর বেলায়। এঁদের ছাতা খোলা অবস্থায় চোখের লেভেলে থাকে। মহিলাদের বাঁধিয়ে হাতে ছাতা খেলে হাতার মত। বাবাজীবন খুব সন্নিকটে নাই-বা গেলে! চশমা কিংবা চোখ দুটোই বাঁচবে। মনে রাখবে ছাতার এক একটি সিক এক একটি দুর্দান্ত সন্তানের মত। অভিভাবক হিসেবে তোমার কর্তব্য সিক সামলে চলা।

ছাতার গায়ে ইল্যাস্টিকের যে সুদৃশ্য ফিতেটি ঝোলে, জেনে রাখো ব্যবহারকারীর হাতে তার জীবন নাবীর যৌবনের মত, প্রভাতের শিশিরের মত। গলাবন্ধের গোল বস্তুটিই একমাত্র ভরসা। ওটা যদি হারায় তা হলে কলাবউ চান করানোর মত, নিজের ছাতাকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নাচতে নাচতে রাস্তায়।

ছাতার বাঁট

বিভিন্ন স্বভাবের বাঁট আছে। কারুকার্য করা, সুদৃশ্য প্ল্যাস্টিকের বাঁট, সুন্দরী রমণীর মতই অনির্ভরযোগ্য। যে কোন মুহূর্তেই তিনি ছাতাকে ডিভোর্স

করে সরে পড়তে পারেন। একবার বিচ্ছিন্ন হলে ইনি আর সংযুক্ত হতে চান না। বেতের বাঁট সাবেককালের মহিলাদের মত ভারি নমনীয়। একবার লেগে গেলে আর ছাড়তে চান না। যেমন চালাবে তেমনি চলবে। যেদিকে চাপ দেবে সেদিকেই নুয়ে পড়বে। ছেড়ে দিলে সোজা হবে। ছাতার কাপড় তোমাকে ত্যাগ করবে, সিক কংকালের মত হয়ে পরিত্যক্ত হবে বেতের ওই ছত্রকান্ডটি কিন্তু তোমার বার্ধক্যের ছড়ি হয়ে হাতে হাতে পায়ে পায়ে ঘুরবে। ব্রাহ্মণীকে পেটাতে পারবে, রাস্তার নেড়ী-কুকুরকে ভয় দেখাতে পারবে, কাছা খুলে দিলে নাতিকে তাড়া করতে পারবে। এটি তোমার তৃতীয়পদ বিশেষ। বাঁশের বাঁট অল্পস্বল্প অত্যাচার সহ্য করতে পারবে, তবে যাঁরা দাঁড়িয়ে আড্ডা মারেন তাঁদের হাতে এর পরমায়ু অত্যাচারী স্বামীর হাতে স্ত্রীর আয়ুর মত। কারণ, আড্ডাধারীদের ভঙ্গিটা সাধারণত এই রকম হয়—ছাতাটা সামনে, তার ওপর দুটো হাত, গল্প চলছে, মাঝে মাঝেই হাতের চাপে ছাতাটাকে বাঁকাতে ইচ্ছে করছে। করবেই। হাতের ধর্মই হল নিশপিশ করা।



বিভিন্ন স্বভাবের ছাতা

পা ধরে গেলে ছাতাটাকে পশ্চাদ্দেশে লাগিয়ে ক্যামেরার স্ট্যাণ্ডের মত একটু আরাম করার ইচ্ছে হবেই। আর বাঁশের ধর্মই হল বাঁশ দেওয়া। সে বাঁশ পাকাই হোক, কাঁচাই হোক, তলতা হোক কি মুংলি হোক। মড়াৎ করে মটকে যাবেই তখন হয় সামনে হুমড়ি না হয় পেছনে ধপাস। বাঁশকে ধারণ করা যায়, বাঁশ কাউকে তেমনভাবে ধারণ করে না।

সাঁপি

ছাতার তলার দিকে যে অংশটা পায়ে হাঁটে সেইখানে লাগানো থাকে লোহার একটি টুপি। এই অংশটি অতি বিপজ্জনক। ছাতা, ছাতার মালিকের সঙ্গে দুলে দুলে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সামনের মানুষটির গোড়ালির পেছনে পা তুলে দেয়। ঘোড়ার পা আর ছাতার পায়ে তফাত কেবল ওজন আর আয়তনের। ফল কিন্তু এক। ধনুষ্টঙ্কার হলেই হল।

ল্যাংমারা ছাতা

তুমি যদি সামনের হাতে ছাতাটি ঝুলিয়ে, সেই হাতটিকে শরীরের পাশে রেখে রাস্তা হাঁটায় অভ্যস্ত হয়ে থাক তাহলে বলে রাখি ছাতা জাতির চরিত্র মহিলাদের মতই—দেবতাই জানেন না মানুষে কা কথা! ওই পাশে ঝুলতে থাকা নিরীহ ছাতা অবশ্যই তোমাকে ল্যাং মারবে। আজ না মারুক কাল মারবেই! যেমন মেরেছিল আমাকে। চৌরঙ্গীর চার মাথায়। লুক টু দি লেফ্‌ট অ্যাণ্ড টু দি রাইট দেন ক্রস। তাই করছিলুম। বেআইনী কিছু করিনি। রাস্তা পার হবার সময় যতটা দ্রুত পা চালান উচিত সেইভাবেই চালিয়েছিলুম। ডান দিক থেকে তেড়ে আসছে এক সার, পালের গোদা ডবল ডেকার, বাঁদিক থেকে আর এক সার, নেতা একটি লরি। পাশে দুলতে দুলতে হাঁটছে আমার ছাতা। হঠাৎ কি হল জানি না, পেছন দিক থেকে কে মেরে দিয়েছে ল্যাং। রাস্তায় ফ্ল্যাট। পুলিসের বাঁশি। নানা রকম ব্রেকের ক্রীচ, ক্র্যাচ শব্দ। নড়া ধরে তুলে দিলে পুলিস। পশ্চাদ্দেশে দুটো ঝাপ্‌পর মেরে বললে, উজবুক কাঁহাকা। কাঁপতে কাঁপতে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠে ছলছলে চোখে হাতের ছাতাকে জিজ্ঞেস করলুম—তোর এই কাজ, মাঝ রাস্তায় মারলি ল্যাং! কি কায়দায় মারলি! ও! চট করে পেছন দিক থেকে পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়েছিস। বেশ করেছিস! আপনার লোকের মতই কাজ করেছিস রে!

বগলের ছাতা

যে ছাতা বগলে থাকে সাবধান! বগলধৃত ছাতা কখন কি করবে বলা শক্ত। ‘অ্যাই ল্যাংড়া কত করে’—সামনে ঝুঁকলেন মালিক, বগল থেকে বেরিয়ে থাকা সঙিনের মত ছাতা ওপর দিকে ঠেলে উঠল, তিনটে লোক খুন। ‘আরে জনার্দন যে’, ছাতার মালিক বৃত্তাকারে ঘুরলেন, ছটা লোক হাসপাতালে চলে গেল। দৌড়ে বাসে ওঠে বগলের ছাতাটাকে দুবার নাচিয়ে দিলেন, দুটো লোক চাকার তলায় চলে গেল। বগলে যার ছাতা সে কি না পারে। ‘হ্যাভক’ করে দিতে পারে।

ছাতার বাঁটের প্রয়োগ

বাদুড়-ঝোলা বাসে ফুটবোর্ডে একটু স্থান চাই। পাকা পেয়ারার মত

বাঁট দিয়ে টেনে টেনে গোটা চারেককে ফেলে দিয়ে, উঠে পড়। উঠে কিছু করতে করতেই বাস ছেড়ে দেবে।

এই শহরে তিন প্রকার ছাতা আছে—সবল ছাতা, দুর্বল ছাতা, ডবল ছাতা। আগে ছিল, সামনাসামনি ছাতা পড়লে যে কোন একটি উঁচু হত অন্যটি বেরিয়ে যেত তলা দিয়ে। এখন রীতিটা অন্য। হামভী মিলিটারি, তোমভী মিলিটারি, ছাতায় ছাতায় গুঁতো-গুঁতি, খোঁচাখুঁচি, ফাঁসাফাঁসি। সবলের ছাতা নয়, সবল ছাতার জয়। দুর্বল ছাতা ভয়ে ভয়ে একপাশ দিয়ে হাঁটে। সুন্দরী হাঁটছেন ততোধিক সুন্দর ফোল্ডিং ছাতা মাথায় দিয়ে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। একটু জোর হাওয়া। ছাতা উল্টে গেল। কষ্টে সোজা হল। একবার, দুবার, বারবার। সাক্ষী যুবক এগিয়ে এলেন। দাঁড়ান দাঁড়ান ছাতার ওপর ছাতা ধরি। ইটস্ অ্যা প্লেঝার।

আবহাওয়ার পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার খবর—কৃষকদের জন্যে, মৎস্যজীবীদের জন্যে, আর ফোল্ডিং ছাতাধারীদের জন্যে—বিকেলে বৃষ্টি হবে। সকাল থেকেই ছাতা খোলার তোড়জোড় করুন। নইলে খুলতে খুলতেই মনসুন চলে যাবে।

স্বর্গে যাবার সময় সংক্ষেপ

স্বর্গে যাবার সময় পনের ঘণ্টা কমে গেল। মর্তের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেলেও স্বর্গে যাবার সময় সংক্ষেপ করে দিয়েছেন রেল কম্পানী। হিমগিরি লাইনে নেমেছে—ষষ্ঠতম সুপার-ফাস্ট ক্লাস-লেস ট্রেন। কলকাতা থেকে কাশ্মীর এখন মাত্র ২৮ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের পথ। ছ'টি রাজ্যকে মালায় গেঁথে এই সুপার-ফাস্ট ট্রেন ২০৪৭ কিলোমিটার পথ রাতারাতি অতিক্রম করে জম্মুতে স্বর্গযাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে উল্লেখযোগ্য কম সময়ে। গীতাঞ্জলি দিয়ে শুরু করে রেল কম্পানী এখন হিমগিরিতে এসে ঠেকেছেন।

হিমগিরি হল বাই-উইকলি ট্রেন। হাওড়া থেকে ছাড়ছে সকাল ছ'টায়, জম্মু-তাওয়াইতে পোঁছোচ্ছে পরের দিন সকাল সাড়ে দশটায়। পাঠানকোট বা জম্মু-তাওয়াই একসপ্রেস ছাড়ছে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। জম্মু পোঁছোচ্ছে পরের পরের দিন সকাল সাতটা দশ মিনিটে। হিমগিরি প্রকৃতই সুপার-ফাস্ট ট্রেন। রেলকমের ঝমাঝম ট্রেন। রেলের ভাষায়—সকালে এক কাপ চা মেরে উঠে বস, পাটনায় মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রাখো কিংবা লক্ষ্ণৌতে ফিরদৌসী ডিনার। এমত একটি বস্তু পেয়ে আমরা অসীম আহ্লাদিত। কলকাতা থেকে বারাসত যেতে রাত ভোর হয়ে গেলেও কলকাতা থেকে কাশ্মীর এখন কত কাছে!

এখন তা হলে কাশ্মীর যাওয়া যাক। বুধবার সকাল ছ'টায় ট্রেন। প্রথম দিনের যাত্রার যাত্রী আমি। ছমাস আগে দেড় মাইল লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে ঠুকতে আমাকে টিকিট কাটতে হয়নি। আমি রেলেরই অতিথি। যাব কি যাব না করে হিমগিরির প্রথম যাত্রার দিন অক্টোবরের প্রথম থেকে সরতে সরতে ২৫ তারিখে এসে স্থির হয়েছে। ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষ টিকিট কেটেছেন, ক্যানসেল করিয়েছেন, টাকা ফেরত নিয়েছেন আবার কেটেছেন। এই কসরতে

তাঁদের যে সময় লেগেছে তাতে দুবার কাশ্মীর ঘুরে আসা যায়। যস্মিন দেশে যদাচার।

ওসব দুর্ভাবনা আমার ছিল না। আমার কেবল একটাই ভাবনা ছিল—কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে ভোর ছ'টার ট্রেন ধরা। নিজেকে সময় মত বিছানা থেকে টেনে তোলার জন্য বিবিধ প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছিলাম যেমন—বড় বড় তিন গেলাস জলে পেটটিকে টইটম্বুর, প্রতিবেশী বিধানবাবুকে অনুরোধ—তাঁর শেষরাতের ব্রঙকাইটিসের কাশির কালোয়াতিটাকে আমার জানালা মুখো করে দেওয়া, পা দুটোকে চুল বাঁধার ফিতে দিয়ে বেঁধে শোওয়া, ইত্যাদি প্রিমিটিভ ব্যবস্থা। শেষে ঘুমিয়ে পড়ার দুশ্চিন্তাতেই ঘুম আর হল না। একটু করে ঘুম আসে আর স্বপ্ন দেখি হিমগিরি চলে যাচ্ছে, শেষ স্বপ্নটা আরও মারাত্মক—ইস্টিশানটাই চলে গেছে।

চরাচর যখন শেষ রাতের মিঠে ঘুমে আচ্ছন্ন সেই সময় একটি মাত্র প্রাণী চড়া বৈদ্যুতিক আলোয় ব্রাহ্ম মুহূর্তের সমস্ত গম্ভীর আয়োজনকে তছনছ করে নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত। মাইল দশেক পথ নিজেকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে না। গাড়ি তো একটা চাই। সে ব্যবস্থাও হয়েছিল। একটু বেশীই হয়েছিল। সবিশেষ খাতিরের সম্পর্ক না থাকলে রাত চারটের সময় গাড়ি পাওয়া সহজ নয়। দুজন এজেন্টের ওপর দায়িত্ব ছিল একটি ভালবাসার ট্যাকসি সদরে হাজির করে দেবার। যেমন করেই হোক একটি গাড়ি চাই ভাই, হিমগিরি ধরতে হবে। দুজনেই এত সক্রিয় হবেন বুঝিনি। তাক লেগে গেল যখন দেখলাম তিন মিনিটের ব্যবধানে একটি কালো আর একটি হলুদ ট্যাকসি সদরে দাঁড়িয়ে হাঁচছে আর কাশছে। দুটি গাড়ির সামনের সিটে আমার দুই এজেন্ট। সহাস্যে নিবেদন—জামাইবাবু সাসকাসফুল।

সাসকাসফুল নয় হে শ্যালক সাকসাসফুল। ওই হলো, নিন উঠে পড়ুন। কোনটায় উঠব ভাই? যেটায় খুশি। দুটোই তো আপনার মাল—টোয়েণ্টি, টোয়েণ্টি, ফর্টি। একটা গাড়ি বিলকুল কেন খালি যাবে! গোটা পরিবারটাই ঘুম জড়ানো চোখে গো অ্যাজ ইউ লাইকের কায়দায় উঠে বসল, কুকুরটাও বাদ গেল না। চলো আমরাও একটু মজা করে আসি--হার্টি সি-অফ। ঘেউ ঘেউ শব্দে আমাদের যাত্রা হল শুরু।

রেল কোম্পানী শুধু কাশ্মীর দেখালেন না ভোরের কলকাতাও দেখালেন। জানাই যেত না কত ভোবে কত মানুষ ওঠে। কত কাজ তখন থেকেই শুরু হয়ে যায়! কেমন করে পুবের আকাশ লালচে হতে থাকে! নটিক্যাল অ্যালম্যানাকের দেখান তারাটা সত্যিই দেখা যায়। বিশ্বাসই করা যায় না পুলিস কিভাবে হাতে পাঁচসেলের টর্চ নিয়ে মোড়ে মোড়ে জটলা করে থাকে। মালবাহী গাড়িকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। খোদ কলকাতায় কত ভক্ত মহিলা আছেন। হাতে কমণ্ডলু আর ফুলের সাজি নিয়ে পবিত্র পায়ে কিভাবে এগিয়ে চলেন গঙ্গাস্নানে! কলকাতার সেই দোকানগুলো এখনও আছে যেখানে ভোররাতে টাকা-সাইজের গরম গরম কচুরি ভাজা হয়, কড়ায় ধোঁয়া ছাড়ে গরম হালুয়া। জগন্নাথ ঘাটের কাছে বুকে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছেন জনৈক অবাঙালী ব্যবসায়ী, গোল করে ঘিরে ধরেছে একদল হা-ঘরে বালক। শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ধনী মানুষটির ঠোঁট নড়ে চলেছে অবিরাম। মুখে লেগে আছে লাখোপতির তৃপ্তি। বোধ হয় ত্যাগের কথা কিম্বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা শোনাচ্ছেন

যাদের কিছুই নেই তাদের। সারমন শেষ হবার পর হয়তো কিছু কুঁচো পয়সা ছড়িয়ে দেবেন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে। ফ্লাইওভারের তলাকার নিদ্রাবিলাসী জনগণ আগেভাগেই উঠে পড়েছেন কলকাতার অতি ব্যস্ত সকালকে পথ করে নিতে।

হঠাৎ মনে হল হিমগিরিকে নিভাবনায় ধরতে আগের রাতে ফ্লাইওভারের তলায় শোবার জায়গা বুক করতে পারলে মন্দ হয় না। যতই হোক জনতা ট্রেন--সুপার-ফাস্ট ক্লাসলেস।

একটা ভুল ধারণা কেটে গেল। রেলের মানুষও কত ভদ্র হন! এখন পুলিস সম্পর্কে ধারণাটা পাল্টালে বেঁচে যাই। একবারও জিজ্ঞেস করতে হল না—হিমগিরি কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, কিম্বা ছটার ট্রেন কটায় ছাড়বে। কেউ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বেল সম্পর্কে আমার অজ্ঞতায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। টিকেট বলে প্যান্টের বগলস টেনে ধরলেন না। ট্রেন উদ্‌গীর্ণ ডেলিপ্যাসেঞ্জারের দল আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন না। মুখ নীচু



বেড়ালের ভাগ্যে

কোনো লোহার ঠ্যালাগাড়ি আমাকে তেড়ে এল না। সারা প্ল্যাটফর্ম যেন সবে চোখ মেলে চাইছে। সানাই ধরেছে ভৈরবী—রাই জাগো, রাই জাগো বলে ডাকে শুক-শারিইই। মনে হচ্ছে, আমার বিবাহের পরের দিনের সকাল।

অশান্তিটা অবশ্য তৈরি হচ্ছিল অন্য জায়গায়। টের পাওয়া গেল কিছু পরে। পপাত হলাম, মমার হবার আগেই হিমগিরির নিভৃত আশ্রয়ে। বেশ ঝাঁঝালো প্যান্ডেল হয়েছে প্ল্যাটফর্মে। নবজাতক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝকঝকে সরীসৃপ দেহ নিয়ে। অল্পস্বল্প বক্তৃতার শব্দ আসছে কানে। কে যেন বললেন—সাংবাদিকদের সামনের সারিতে প্যাক করে দি স্যার। আর তখনই কানে এল—মানতে ওবে, মানতে ওবে, চলবে না, চলবে না। সেই সালুময় লাল দৃশ্য। উভয় তরফের কিঞ্চিৎ আস্ফালনের পরই বাঁশ পেটাপিটির শব্দ এল কানে, ঘেরা-টোপের মধ্যে বসে থাকা জনতা ট্রেনের মতই এঁকে বেঁকে দুলতে লাগলেন। হিমগিরি আনুষ্ঠানিকভাবে দুলে ওঠার আগেই, প্ল্যাটফর্ম নড়েচড়ে উঠল। আতঙ্কের গলায় কে যেন বললেন—স্যার চেয়ার উলটে পড়ে গেছেন। আমার কানের কাছে কে আবার বলে উঠলেন—মার শালা চামচাকে। হিমগিরি আর প্ল্যাটফর্মের মাঝের খাঁজে পড়ে যাবার আগে নিজেকে উঠিয়ে নিলুম গিরিরাজের গহ্বরে। দৃপ্ত একটি কণ্ঠ ভেসে এল মাইক্রোফোনে, খুব দাবড়াচ্ছেন মানতে ওবেদের। সব কুছ হো জায়গা ভাই, সব কুছ মিল জায়গা থোড়া থোড়া। বাস সঙ্গে সঙ্গে প্যাটা প্যাট হাততালি। এই প্যান্ডিমোনিয়ামের মধ্যেই গার্ডসায়েব ফিরুরু করে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন, সেই লাল ফ্ল্যাগ দুলে উঠল, পিলপিল করে শাঁখ বেজে উঠল। হিমগিরি সকলকে তাক লাগিয়ে সাঁই সাঁই করে দৌড়ল। ভয় হল সামনে লাইনটাইন ঠিকঠাক আছে তো, না শেষে কেরদানি দেখাতে গিয়ে কেতরে পড়বে?

সেই প্রথম দেখলুম ছেলেরাও শাঁখ বাজাতে পারেন।

ইতিমধ্যে লোয়ার বার্থ, আপার বার্থ জানালার ধার প্রভৃতি তুচ্ছ অথচ একান্তই মানবিক সমস্যাসমূহ আমাদের খুবই বিব্রত করে তোলার চেষ্টা করল। পাকা চুল, কাঁচা চুল, বেশ কিছুক্ষণ চুলোচুলি। চা, চা করে প্রাণটা প্রায় চাতাল হয়ে পড়েছে এমত সময়ে আমাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটি করে খাবার বাক্স। বেশ ওজনদার। মলাটে লেখা—হিমগিরির সৌজন্যে, জনতা প্যাকেট। অল্পস্বল্প ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কত আশা করে . । খুলতেই বেরিয়ে পড়ল—বক্তচক্ষু, মানুষ খেকো কয়েকটি পুরি এবং অত্যন্ত উগ্রস্বভাবের একনাদা আলুব তরকারি। একটা কোণ ভেঙে মুখে পুরেই বুঝলাম, এ বস্তু হজম করার জন্যে প্রয়োজন গ্রাইন্ডিং হুইল। বাঙালীর দুর্বল লিভার একে সহজে কাবু করতে পারবে না।

পরের আইটেম ব্লটিং পেপারের ল্যাতপ্যাতে গেলাসে জনতা চা। সে এক অভিজ্ঞতা। গেলাস ফেঁসে গরম চা কোলে পড়ে যাবার আগেই পান করতে হবে। পতনোন্মুখ গরম পানীয়ের সঙ্গে জিভের প্রতিযোগিতা। একমাত্র কোকেন-চাটা জিভই সেই গরম চা চোঁ চোঁ করে খেতে পারে। আমার জিভই হেরে গেল। কোম্পানীর চা থ্যাস করে মেঝেতেই পড়ে গেল।

যাক যেতে দাও গেল যারা। বরং ট্রেনটাকে এইবার একটু ভাল করে দেখা যাক। মন্দ না। সদ্য সদ্য ইন্টেগর‍্যাল কোচ ফ্যাকটরি থেকে বেরিয়েছে, জনতার স্নেহের হাত তেমন করে গায়ে পড়েনি। পাখা পাখার জায়গাতেই আছে, এবং চলছে। আলো তাও জ্বলে। সিট তেমন তুলতুলে নরম না হলেও দাঁত বের করে

মস্করা করছে না। মেঝে তখনও পরিষ্কার। এতক্ষণ যেটাকে বইয়ের দোকান মনে করছিলুম, সেটা আসলে একটি মিনি লেণ্ডিং লাইব্রেরী। বইয়ের দাম জমা রেখে একটি বই নেওয়া যেতে পারে এবং মনের মত রিডিং চার্জ দিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখা যেতে পারে। অধিকাংশই পেপার ব্যাক। মোরারজীর জীবনী হার্ড ব্যাকে। পাশেই কিছু থ্রিলার। ইলিয়াকাজানও চোখে পড়ল। হিন্দী পেপার ব্যাক। চটকদার কিছু ম্যাগাজিন।

যেটাকে ডাইনিংকার মনে হচ্ছিল—সেটা আসলে প্যানট্রি। ট্রেনের এ মাথা থেকে ও মাথা অনবরতই লোক চলাচল। শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে একটি রাজপথ চালিয়ে দিলে যে অবস্থা হয় ঠিক সেই অবস্থা। কোনও সাধারণ হাসপাতালের এমার্জেনসি ওয়ার্ডটিকে চাকায় তুলে দিলে যা হয় ভেতরের অবস্থা সর্বক্ষণই সেই রকম। রেল কোম্পানী চিত্র সহযোগে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কবিতাটিকে সতীর ছিন্ন ভিন্ন দেহের মত সারা ট্রেনে ছড়িয়ে না দিয়ে লিখতে পারতেন আসা-যাওয়ার পথের ধারে।

৮২৫টি স্লিপার এবং ৮০টি বসার আসন নিয়ে হিমগিরি হই হই করে ছুটছে। টানছে শক্তিশালী একটি ডিজেল ইঞ্জিন। সহযাত্রী ক্ষুণ্ণ মনে বললেন—বাইরেটা যে দেখা যাচ্ছে! তার মানে? শুনেছিলুম ট্রেনটার নাকি এমনই স্পিড যে, বাইরেটা মনে হবে ঝাপসা ঝুউসস। মানে ভেতর থেকে বাইরেটাকে যেমন ঝাপসা দেখবো, বাইরে থেকে ট্রেনটাকেও লোকে তেমনি ঝাপসা দেখবে—ঝ্যাস করে কি যেন একটা বেরিয়ে গেল।

তবে যাই বলুন জাস্ট ওয়ান আওয়ার ফাইভ মিনিটসে বারাডোয়ান, ভাবা যায় না। নো স্টপেজ। ইয়ার্কি। সেই প্রথম দেখলুম রেলের মানুষ রেল দেখতে আউট সিগন্যালে জমায়েত হয়েছেন। একজন ফায়ারম্যান হেসে হেসে মাথার নীল টুপি খুলে সদ্যোজাত রেল তনয়াকে অভিনন্দন জানালেন। মুখের হাসি চোখের ভাষা কি বলতে চাইছে? যাচ্ছো যাও বাছা, ভালয় ভালয় পৌঁছতে পার কি না দ্যাখো—সামনেটায় আবার চলবে না চলবে না করে রাখেনি তো?

প্রথম স্টপেজ আসানসোলে। মিথ্যে বলব না, দু এক জায়গায় গতিবেগ একটু মন্থর হলেও হিমগিরি প্রথম থামল আসানসোলেই। ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে আসানসোল। ভেরি গুড। আসানসোল থেকে ২১ জন উঠতে পারবেন। পাটনা থেকে ৭৫ জন। লখনৌ থেকে ১৫০ জন। বারাণসী থেকে ৭৫ জন। এর পর আর কোন বুকিং নেই। সীমায়িত স্টপেজ। হাওড়া আসানসোল, পাটনা, বারাণসী, লখনৌ, মোরাদাবাদ আম্বালা লুধিয়ানা, জলন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্ট, চাকীক ব্যাঙ্ক, জম্মু তাওয়াই। ওই পাঁচ, দশ মিনিটের জন্যে থেমে আবার চলা।

এই প্রথম দেখলুম ট্রেনও ধুলো ওড়ায়। ডিজেল ইঞ্জিনের মিহি ভুসো আর প্রান্তরের সূক্ষ্ম ধুলোয় আমরা মলিন হতে শুরু করেছি। চুলে চিরুনি ঢুকছে না। কর্ণগহ্বর বুজে এসেছে। রেলগাত্রের আয়নার সামনে নিজেকে দোদুল্যমান রেখে নিজেকেই নিজের আইডেনটিটি দিতে হয়। হিমগিরিতে আমরা এক একটি কেলোগিরি। মা আর মেয়ে দুজনেই কাঁদো কাঁদো গলায় বলছেন- ওরে শোভা আমার এ কি হল রে! যত মুছছি ততই জড়িয়ে ধরছে। কপালের ভাঁজগুলো হাতের রেখার মত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মেয়ে বলছেন—আমার মুখটা একবার দ্যাখো, ঠিক মনে হচ্ছে হাঁড়ি খেয়ে এসেছি।

সুপার-ফাস্ট ট্রেনের কালি তুলতে সুপার ডিটারজেণ্টের প্রয়োজন হবে।

পাটনাতে লাঞ্চ দেবার কথা ছিল না! ১টা বেজে ১৯ মিনিটে পাটনা পেরিয়ে গেলুম। প্যানট্রির সামনে যাত্রীদের অল্পস্বল্প উত্তেজনা ক্রমশই বড় হয়ে উঠছে। খিদে খিদে পাচ্ছে। চলন্ত ট্রেনে হজম যন্ত্রটা ডে-ডেট অটোমেটিক ঘড়ির মত সচল হয়ে ওঠে। ৭৫০ জন যাত্রীর চাপ রন্ধন বিভাগ সামলাতে পারছেন না। সময়ে মনের মত এক কাপ চা পাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। খাবার জলে ভুসো ভেসে বেড়াচ্ছে। তা হোক, ভ্রমণকালে খুঁতখুঁতে হলে চলবে না। কিন্তু খাদ্যের দাবি যে ক্রমশই আন্দোলনের চেহারা নিতে চলেছে। খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ৩১ জন কর্মী যাত্রীসাধারণের জঠরানলে ভস্মীভূত হতে চলেছেন।

জানতাম মধ্যাহ্নভোজন চিরকালই অপরাহ্নভোজন হয়ে ওঠে। তবে চিকেনটি সুস্বাদু ছিলেন।

এ ট্রেন তো সে ট্রেন নয় যে, স্টেশনে স্টেশনে থামবে। বহুক্ষণ থামবে। আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে নেমে বিভিন্ন অঞ্চলের বায়ুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করব, ভাঁড়ে চা-গরম খাবো, বহুবিধ অখাদ্য চেখে চেখে দেখব? ইনি থামেন না, থামলেও খুবই অল্প সময়ের জন্য। সেই সময়ের মধ্যে জানালা দিয়ে কোনও লেনদেনের সাহস যাত্রী কিংবা হকার কেউই রাখেন না।

৬১ জন বেকলকর্মচারী ৭৫০ জন যাত্রী নিয়ে প্রথম দিনের হিমগিরিকে ভূস্বর্গমুখী করেছেন। সন্ধ্যের পর বাইরেটা ঘোর ঘন অন্ধকারে ঢাকা। তখন দু টাকা ভাড়ায় রেল কোম্পানীর কাছ থেকে নেওয়া বেড রোলটি বাঙ্কে বিছিয়ে চোখ বুজিয়ে অনুভব করা—ট্রেনের মারাত্মক দুলুনি, চাকার শব্দে গতি। বেড রোলে থাকবে একটি ডোরাকাটা পাতলা সতরঞ্চি, একটি কম্বল, সাদা চাদর, একটি ফোমের বালিস।

স্বর্গে যাবার খরচ, স্বর্গ বললে ভুল হবে, জম্মু তাওয়াই স্বর্গের দরজা, শ্রীনগর তখনও অনেক দূরে। হাওড়া থেকে জম্মুর ভাড়া—৬৭ টাকা ৩০ পয়সা। বেড রোল ২ টাকা। রেলের খাবারই খেতে হবে কারণ এ ট্রেনে বাইরের খাবার কেনার উপায় নেই। সাদামাটা ভেজিটারিয়ান মিল (ভাত, রুটি, ডাল, তরকারি, ভাজা, টক দই, একটি লাড্ডু)—৩ টাকা। নন-ভেজ (ভাত, রুটি, ডাল, মাটনকারি, ভাজা, টক দই, লাড্ডু) ৩ টাকা ৫০ পয়সা! এক একটা মূল্যের জনতা খানা প্যাকেট আমরা সকালে পেয়েছিলাম, সাহসী মানুষ চেখে দেখতে পারেন। ওয়েস্টার্ন ভেজিটারিয়ান হতে চাইলে—সাতটি টাকা যাবে, ওই নন-ভেজ—৮ টাকা। চিকেন মশালা—৫ টাকা, একটা পরটা ৫০ পয়সা। ভেজ-কাটলেট—২ টাকা, মটন কাটলেট —দেড় টাকা, চিকেন কাটলেট—তিন টাকা। চা—৩০ পয়সা কাপ, ফ্লাস্কে—৭০ পয়সা, কফি—৪০ পয়সা কফি ফ্লাস্কে—৮০ পয়সা। এই সব খাদ্যের কথা রেলের ঘোষণাপত্রে লেখা আছে। প্রকৃতই পাওয়া যাবে কিনা এবং অর্ডার দিলে কতজন পাবেন আমরা জানি না। তবে প্রথম দিন একটু অব্যবস্থাই চোখে পড়েছে।

এইবার তাহলে আসল কথাটা বলি—হিমগিরি চেপে কাশ্মীর যেতে আসলে সময় লাগবে চারদিন। কি হিসেবে—ট্রেন ছাড়ার আগের দিন রাতে এসে স্টেশনেই থাকতে হবে, তা না হলে ভোর ছ'টার ট্রেন ধরা যাবে কিনা সন্দেহ। ট্রেনে পুরো একটা দিন। পরের দিন সকালে জম্মু পেঁছে কানেকটিং শ্রীনগর-গামী বাস মিলবে না। বাধ্য হয়েই জম্মুতে রাত্রি বাস। ফেরার সময়েও সেই একই সমস্যা—রাত এগারোটায় হাওড়ায় নেমে একটু দূরের যাত্রীরা কোথায় যাবেন!

অবশ্যই সুপার-ফাস্ট ট্রেন, তবে দিনের ট্রেন দিনেই ধরতে হলে আরও কয়েকটি জিনিস চাই—(১) একটি বিদেশ-জাত অ্যালার্ম ঘড়ি—একবার বাজবে, আবার বাজবে তারপর বাজতেই থাকবে, (২) নিজের একটি গাড়ি কিংবা গাড়িধারী কোনও বন্ধু। এ ছাড়া সঙ্গে রাখতে হবে নিজেকে ঝাড়ার জন্যে একটি জুতোঝাড়া বুরুশ, গায়ে মাখতে হবে এনামেল পালিশ। গোটা বারো অন্তর্বাস সঙ্গে নিলে ভাল হয়। সর্বশেষ স্ব-অর্জিত একটি টাক না থাকলে মাথাটি কামিয়ে ওঠাই ভাল। কাশ্মীরের বরফ জলে নিজেকে সাফসুতরো করার বাসনা থাকলে প্রকৃত স্বর্গারোহণও অসম্ভব নয়।

হিমগিরি কলকাতার মানুষের জন্যে, পশ্চিম বাংলার ভ্রমণবিলাসীদের জন্যে তেমন উপকারী বাহিকা হতে পারল না।

বিসর্জন

আমরা সেই ধরনের মানুষ চাই যারা সাত চড়েও রা কাড়বে না। তা না হলে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। অসুবিধে মানে খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে হচ্ছে না, রোজগার যা ছিল তার চেয়ে বরং বেড়েইছে, শরীরেও গত্তি লেগেছে। নিজের পরিবার তো বেশ সুখেই আছে। শ্বশুরবাড়ির ইয়েটিয়েকে বেশ ইয়েটিয়ে করে দিয়েছি। ওসব কোন অসুবিধে নয় তবে বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে চারদিকে। বিবেক-টিবেক অনেককাল আগেই বিসর্জন দিয়েছি তবু ওই জুতোয় পেরেক-ওঠা ভাবটা চলার আনন্দকে হাফ করে দিয়েছে। এই যে বাড়া ভাতে ছাই, এই ছাই যারা ছুঁড়ছে তারা আর কতদিন ছুঁড়বে।

আমরা যা খুশি তাই করব? মুখ বুজে তা মেনে নিতে হবে। সাধারণ মানুষের আবার অত বায়নাক্কা কিসের? দুশ' বছর ধরে ইংরেজ যখন বুটের তলায় রেখেছিল তখন তো এতো ট্যাঁ ফোঁ ছিল না। তবে দিশী সাহেবদের এত অসহ্য লাগছে কেন! গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। তার ওপর হিংসে। 'ম্যাসের' আবার চোখ ফুটেছে। গাদা-গাদা মাইনে পায়, গদি-আঁটা চেয়ারে বসে ঠান্ডা ঘরে দোল খায়, স্বজন পোষণ করে, ঘুষ নেয় অপদার্থের দল। কথা বলুক। কথা বলতে তো দোষ নেই। সাধারণ মানুষে আর দেশী কুকুরে উনিশ বিশের তফাত। যব হাতি চলে বাজার তো কুত্তা ভুঁকে হাজার? কিন্তু এটা কি হচ্ছে' এ যে দেখছি র‍্যাবিজের লক্ষণ। ঘেউ ঘেউ কর ক্ষতি নেই। বলে, এ বার্কিং ডগ নেভার বাইটস। এখন কামড়াতে আসছ কেন বাবা।

ধরা যাক আমি রেলের বড়কর্তা। ইংরেজ সাহেবরা লাইনটাইন পেতে গিয়েছিল। আর একটা কোন সায়েব সেই কেটলিতে গরম জল ফুটতে দেখে আর ঢাকনির নাচানাচি দেখে এক স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করে বসল। '৪৭ সালের পর সেই বাঁশ আমাদের ঘাড়ে এল। এল তো এল। হামারা কেয়া। জোড়া জোড়া লোহার লাইনের ওপর দিয়ে ঝিকঝিক করে রেল চলবে। ড্রাইভার আছে, ফায়ারম্যান আছে, গ্যাংম্যান আছে, সিগন্যাল অফিসার, ইঞ্জিনীয়ার, ট্র্যাক ইনস্পেকটার, গার্ড,

টি টি চেকার, বিশাল সংসার, আমি তার হেড। আমার কি করার আছে! সব তো ওরাই করবে। আমি ছাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে শিস দিতে দিতে আসব। আলাদা ঠান্ডা ঘর, অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিল, ঘুরে ফিরে বেড়াবার জন্যে সেলুনকার, সেটি আবার চাঁদের আলোয় আলাদা লাইনে কেটে রাখা হবে। মাঝে মাঝে মিটিং করব। বৰীকে নিয়ে এ সি সেলুনে বোম্বাই যাব, মাদ্রাজ যাব, দিল্লি যাব, কাশ্মীর যাব। নিজেকে দেখাব—দেখো, দেখো দিল্লি দেখো। একটা দুটো ফাইল সইটই করব। রিলিফ ম্যাপে পিন আটকানো ফ্ল্যাগ স্যাট করে গুঁজে দিয়ে হিরোর মত অডিয়েনসের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, পাইপ-চাপা ঠোঁটে চিবিয়ে চিবিয়ে হিন্দোংলিশ ভাষায় বলব—স্পেকটাক্যুলার অ্যাচিভমেণ্ট, বড়া সাফল্য, ব্রডগেজ এক্সটেন্‌ডেড টু অ্যানাদার থ্রি থ্রি নট নট কিলোমিটারস? লোহার বাঁধনে সারা ভারত বেঁধে ফেলেছি। হ্যা, হ্যা।

সায়েববাও তো এইভাবেই অ্যাডমিনসট্রেশান চালাত। নেটুদের জন্যে এর চে বেশি করে কি করার আছে। সকালে খানা, দুপুরে লাঞ্চ, সন্ধ্যেতে ককটেল, বলড্যানস, ডিনার, ড্যামসেল, ডিভান, ড্রিমস স্যালারি চেক। ওরা অবশ্য স্পোর্টস-ম্যান ছিল, হর্সরাইডিং, গলফ, বিলিয়ার্ড, পোলো। আমাদের ওসব নেই। ভুঁড়ি সামলাব না ঘোড়ায় চড়ব। তোমাদের ঘাড়ে চাপব দোস্ত। দোস্ত বলাটা ঠিক হল না। দোস্ত আবার কি! অনেক ছেলে-মেয়ে হলে বিরক্ত মা কি বলে, 'ওরে আমার পেটের শত্তুর' তেমনি রাস্তায় ঘাটে বাজারে হাটে স্টেশানে, স্টপেজে সারাদিন যারা ইলিবিলি, কিলিকিলি করছে ওরা হল আমাদের চক্ষুশূল। আমার সাজানো গোছানো সায়েবী প্যাটার্নের বাড়ির পাশে একটা আটচালা বেঁধে, অ্যান্ডাগ্যান্ডা নিয়ে জেঁকে বসল। বাড়ির শো নষ্ট। তার ওপর মাথায় ঢুকেছে—আমরা স্বাধীন। স্বাধীন আবার কি? বলে, ইকোয়াল রাইটস। ওঃ ইকোয়ারাইটস? মামার বাড়ি। আমার ঝুলবারান্দা থেকে মুখ ঝুলিয়ে সাহেবী কায়দায় ধমকাতে গেলে, উল্টে ধমকে ওঠে। সেদিন আবার মানী লোকের কান কামড়ে দিয়েছে।

না, অনেক আবদার প্রথম প্রথম সহ্য করা হয়েছে। আর সহ্য করা হবে না। সাধারণ মানুষ চিরকাল যেমন, যেভাবে, খেয়ে না খেয়ে হেলে-লেলে করে জন্মাত মরত, মরত জন্মাত সেই ভাবেই চলবে। চাকরি দিলে চাকরি পাবে। খাটালে খাটবে। বেকার রাখলে বেকার থাকবে। খেতে পেলে খাবে, না পেলে মহেশের গফুরের মত কাঠফাটা আকাশের দিকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ তুলে বলবে—আল্লা? মন্দিরে গিয়ে মাথা ঠুকে বলবে—ঈশ্বর? বরাতে বিশ্বাস করবে না? এ কেমন কথা?

আমরা যেভাবে যেমন ভাবে নাচাব সেই ভাবে নাচতে হবে। আমরা হলুম গে অ্যাডমিনিসট্রেটার, তোমরা হলে গিয়ে অ্যাডমিনিসটার্ড। সয়েবরা কথায় কথায় ক্যাঁত ক্যাঁত করে বুটের লাথি মারত। সেটা তো আর পারা যাবে না। স্বাধীন হয়েছেন নপুংসকেরা। জানে না আমরা মনে মনে অনবরত লাথাচ্ছি। ভাতে মারব, পাতে মারব। চিন্তায় চিন্তায় আধ-মরা করে রেখে দোবো। তোমাদের মাথার ওপর ঝুলতে থাকবে ডেমোক্রেসের খড়্গ। জীবিকা, সংসার, ছেলের এডুকেশান, মেয়ের বিয়ে, প্রেম, ব্যভিচার, ছেনতাই চুরি, ডাকাতি, ক্লান্তি, অনাহার, ভ্রাতৃবিরোধ, স্ত্রীর সঙ্গে কলহ, প্রতিবেশীর সঙ্গে লাঠালাঠি, লোভ, লালসা, ঘুষ, নেশা, কোর্ট-কাছারি, ধার, পাওনাদার। আমরা, এই আমরা যারা কর্ণধার, আমরাই তো ঈশ্বর। আপামর জনসাধারণ নাচের পুতুল। অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, ম্যানেজমেণ্ট, খেলা,

স্রেফ খেলা। স্যাডিস্টিক গেম।

পিল পিল করে পঙ্গপালের মত তেড়াবেঁকা মেয়ে পুরুষের দল স্টেশানে এল। দেখছি, ওপর থেকে ঈশ্বরের মত দেখছি। মাইক্রোফোনে ব্যায়লা বাজছে। এইবার একটু মজা করি। জীবনটাই তো রঙ্গ। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে কামরায় কামরায় ঢুকেছে অমৃতস্য পুত্রীরা। কেরানী, কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, দালাল, ফোড়ে। যত 'প্রোলস'। স্কামস। ছাগলের দল। তা না তো কি! এই ভাবে মানুষ যেতে পারে! বনমানুষও পারবে না। আমরা পারি? ভাবতেও পারি না! এইবার একটু খেলিয়ে দি। ও ট্রেন যাবে না। ব্যায়লা থামিয়ে অ্যানাউনস করিয়ে দি, ও ট্রেন যাবে না। পাঁচলম্বরে যান। ওপর থেকে দেখি—দৌড়, দৌড়, মধ্যবিত্ত দৌড়চ্ছে, নিম্নবিত্ত দৌড়চ্ছে। যুবক পড়ছে যুবতীর ঘাড়ে। মুটকী দৌড়োচ্ছে মোটকার হাত ধরে। বাহব্বা, বাহব্বা।

এইবার আর একটু মজা করি, পাঁচ নম্বর শূন্য, কোন গাড়ি নেই। ব্যায়লা থামিয়ে আবার অ্যানাউনসমেন্ট, আট নম্বর থেকে অমুক লোক্যাল সন্ধ্যে এত বেজে এত মিনিটে, ব্যায়লা বাজা, ব্যায়লা বাজা। আবার দৌড়, আবার দৌড়। গ্রেট একসোডাস। হ্যাঁ গাড়ি আছে, মাল কিন্তু নড়বে না, ব্রেক নিচ্ছে না, এই হচ্ছে না, সেই হচ্ছে না। গডস ডিসপোজাল। মানুষ চাইবে, ঈশ্বর দিতেও পারেন, নাও পারেন। উপরওয়ালা জানে।

আমাদের খেলায় তোমরা খেলবে। ঠেসে দিলে ঠাসা থাকবে, দাঁড় করিয়ে রাখলে পেঙ্গুইনের মত দাঁড়িয়ে থাকবে, হরিপদ, শ্যামাপদ, কালীপদ, মালতী, আরতি। ব্যায়লা বাজছে শোনো। পোস্টার পড়, মেয়েরা ছেলেদের দেখ, ছেলেরা মেয়েদের দেখ, পা কাঁপছে বসে পড়, জ্বর হয়েছে শুয়ে পড়। ওমা তা বলে বিদ্রোহ! ঠিক হ্যায়—গেম ইজ এ গেম ইজ এ গেম। একটু গুলি আর টিয়ার হয়ে যাক। কয়েক রাউন্ড। বে বাড়িতে বলে না, ওহে ফ্রায়েড রাইসটা আর এক রাউন্ড ঘুরিয়ে দাও। সেইরকম আর কি! ব্যায়লা চলুক। নীরো ফিডলস হোয়েন রোম বার্নস।

এইবার আদিখ্যেতা দেখ। লোকটা যখন বেঁচে ছিল বউ বলত মুখপোড়া, ছেলে বলত ওল্ড ফুল, পাড়ার লোক বলত ঘুষখোর, শয়তান। ওমা এখন একেবারে দরদ উথলে উঠছে। ওপর থেকে দেখছি। বেশ লাগছে। আমি রঘুপতি। ব্যায়লা থামাও, শোনো আমাদের ডায়ালগ। স্টার্ট ডায়ালগ অ্যাডমিনিসট্রেশানঃ

এত দিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষ-হুহুংকার? অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী।...আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
...আজ কী আনন্দ, তোর চণ্ডীমূর্তি দেখে।

কলকাতায় চিত্রগুপ্ত

চারজন যমদূত আমাকে টানতে টানতে চিত্রগুপ্তের দপ্তরে নিয়ে গেল। আমার মত সামান্য একজন মানুষের জন্যে চার চারজন যমদূত। টু মাচ। যমরাজের 'দূত পাওয়ার' খুব বেশি। আপনাদের মাইনে কত?

মাইনে? যমালয়ে তো টাকা বা ডলারের চল নেই। ওখানকার সিসটেমটাই অন্য। গেলেই বুঝতে পারবে ছোকরা।

তা একেবারে চারজন কেন? একজনই তো যথেষ্ট ছিল।

না হে না। যমরাজের নির্দেশ, মৃত ব্যক্তি যদি চাকুরিজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত হয়, আবার তার যদি ডিসেণ্ট্রি, ডায়েরিয়া কি ডিসপেপসিয়া থাকে, তাহলে চারজন কেন, আটজন দূতও আসতে পারে। সে ব্যক্তি অতি বিপজ্জনক, ভেরি ভেরি ভেরি ডেনজারাস। আমাদের কাজের কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিঠে এক ঘা ডাণ্ডশ।

মারলেন কেন স্যার। আপনারা কি পাঠশালার পণ্ডিত ছিলেন, কিংবা পুলিস।

না, আমরা পশ্চিম বাংলার কলকাতাতেই ছিলুম, ডাক্তার। মরে যমদূত হয়েছি। ও ছিল ই এন টি স্পেস্যালিস্ট। এ ছিল আই স্পেস্যালিস্ট, ও ছিল গাইনি, আমি হার্ট।

আবার এক ঘা ডাণ্ডশ।

শুনে রাখ ছোকরা, যতবার প্রশ্ন ততবার ডাণ্ডশ। আমরা প্রত্যেকেই এক একজন জাঁদরেল ডাক্তার ছিলুম। রুগীদের কোন ফালতু প্রশ্নের জবাব দিতুম না। প্রেসক্রিপসান ঠুকেই পকেটে টাকা পুরতুম। যমদূত বলে হেঁজিপেঁজি ভেবো না।

প্রশ্ন করলেই ডাণ্ডশ তবু প্রশ্ন না করে থাকা যায়? একে বাঙালী, তায় কলকাতার লোক, তার ওপর সরকারী চাকরে ছিলুম। ত্র্যহস্পর্শ যোগ। সারা জীবন বকবক, পরচর্চা, ব্লাফ, এই করেই তো কেটেছে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে গলিয়ে নাকটি তো ভোঁতা মেরে গেছে। ডাণ্ডশেই বা আমাকে কতটা কাবু করতে পারে। কলকাতার বাসে ট্রামে নিত্য পঁচিশ বছর বাড়ি বিবাদিবাগ, বিবাদিবাগ বাড়ি করে করে শরীরের স্পর্শকাতরতা নষ্ট হয়ে গেছে।

স্যার মাস্তান মরে কি হয়?

ছারপোকা।

আচ্ছা মন্ত্রী মরে কি হয়?

শুঁয়াপোকা।

ব্যবসাদার মরে।

ডগ ইনি দ্য ম্যাঞ্জার।

কেরানী মরে?

উইপোকা।

আমাকে তা হলে উইপোকা হতে হবে?

হতে হবে তার আগে নরকের টার্মসটা শেষ করতে হবে।

আর একটা প্রশ্ন স্যার, বউ মরে কি হয়?

পরস্ত্রী।

ও, আপনাদের বেশ সুন্দর নিয়ম তো।

হ্যাঁ সুন্দর নিয়ম। স্বভাব আর প্রবণতা অনুসারে পুনর্জন্ম।

চিত্রগুপ্ত মানুষটি বেশ শান্তশিষ্ট। তাঁর সেক্রেটারিয়েটটিও বেশ বড়। এলাহি ব্যবস্থা। হবেই তো। সারা পৃথিবীর প্রেত নিয়ে কারবার। ক্রিকেটের স্কোর বোর্ডের মতো দেয়ালজোড়া বোর্ড। মৃত্যুর সংখ্যা ভেসে ভেসে উঠছে। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ধরনের মৃত্যু। ভুগে মরা, চাপা পড়ে মৃত্যু। প্রাণদণ্ডে মৃত্যু, পুড়ে মৃত্যু, বাড়ি ধসে মৃত্যু, খুন, আত্মহত্যা, জলে ডুবে মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু, ভুরিভোজে মৃত্যু, রাজনৈতিক মৃত্যু, নরবলি, ধর্মীয় মৃত্যু, অনশনে মৃত্যু। এত মৃত্যুর মধ্যে বসেও কেমন হাসি হাসি মুখ।

আমি দপ্তরে ঢুকতেই টেবিলের ওপর একটা ফাইল তিড়িং বিড়িং করে নেচে উঠল। আমার কেস হিস্ট্রি। চিত্রগুপ্ত একটা স্লিপে খসখস করে লিখলেন, বাহাত্তর বছর নরক বাস।

যাও নিয়ে যাও।

বাহাত্তর লেখা একটা পদক যমদূতের হাতে দিয়ে বললেন,

পেছনে এক লাথি মেরে নরকে ফেলে দাও।

প্রভু, ঠাণ্ডা নরক, না গরম নরক?

ফুটন্ত নরক।

আমার কিছু বলার ছিল স্যার।

বলে ফেল।

আজ্ঞে আমি কলকাতার লোক। ইংরেজের কলকাতা নয়, স্বাধীন ভারতের কলকাতা।

জানি।

তাহলে জেনে শুনে আমাকে আবার নরকে পাঠাবেন কেন? এটা কি ন্যায়-বিচার হচ্ছে? আমার নরকবাস তো হয়েই গেছে। আপনার নরকের মডেল আমার জানা নেই। মিলটন সায়েবের প্যারাডাইস লস্টে পড়েছি আর ফিলিমে দু একবার দেখেছি। কিন্তু কলকাতা! যাবেন নাকি একবার। অমন একটা সুপরিকল্পিত নরক আপনার কল্পনা, আপনার প্ল্যানিংএর কান কেটে দেবে।

চিত্রগুপ্ত কাছে দেখার চশমা খুলে, দূরে দেখার চশমা পরে আমার দিকে তাকালেন।

যাবেন নাকি স্যার? ওই নরকে যদি একবছর থাকতে পারেন আমি সারা প্রেতজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব। আমি ষাটটা বছর ওখানে কাটিয়ে এলুম। আপনি আমাকে নরকের ভয় দেখাচ্ছেন স্যার। আপনারটা তো লোক্যালাইজড, ফিলমি নরক, কলকাতা হল রিয়েল নরক, বিশাল তার বিস্তার, আকৃতিতে বিকৃতিতে সে নরক দিন দিন আদর্শ নরকের চেহারা নিচ্ছে। নরকের ভয় কি দেখাচ্ছ প্রভু।

বেশ, তুমি মিথ্যে বলছ কি সত্য বলছ দেখার জন্যে আমি যাব। এই কে আছিস আমার 'ডিসি টেনে' তেল ভর। ওভাবে গেলে হবে না গুরু। বিমান থেকে সব জায়গাই একরকম দেখতে, কলকাতা আর স্কটল্যান্ডে কোনও তফাত নেই। ছবির মত। ছবিতে সব সুন্দর।



খেলা ভাঙার খেলা

তুমি কি বললে, 'গুরু'?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা ফুটবলের ভাষা।

সেটা আবার কি?

আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন। কলকাতায় একদল নাগরিক তৈরি হয়েছেন, এত খানি খানি ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, লতপতে প্যান্ট, বুকের বোতাম খোলা, কাঁধে পতাকা, যাঁদের আপনি, শুধু ময়দানে খেলা দেখার এবং খেলার শেষে তাঁদের নিজস্ব খেলা দেখানর জন্যে ছেড়ে রেখেছেন। শেষ খেলাটাই বড় খেলা। আপনার যমদূতেরাও এই সব ক্রীড়ারসিকদের কাছে ছেলেমানুষ।

কিভাবে তাহলে যেতে হবে!

আপনি আর আমি সোজা ময়দানে ল্যান্ড করব, তারপর জনারণ্যে মিশে গিয়ে আমি এতকাল যা যা করে এসেছি তার গোটাকতক আপনাকে করে দেখতে বলব। যদি পারেন, আপনাকে আমি বাহাদুর চিত্রগুপ্ত উপাধি দেব, যদি না পারেন বলব, ল্যাদাড়ুস চিত্রগুপ্ত।

তোমার তো তাহলে একটা শরীর চাই।

আবার শরীর। কলকাতায় আমি কোন শরীর নিয়ে ঘুরতে চাই না। অশরীরী হাওয়া হয়ে আপনার পকেটে পকেটে থাকব। তাইতেই আমার মোক্ষলাভ হবে।

মোক্ষলাভ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শরীরটা হার্ট-অ্যাটাকে গেছে, আত্মার বাতাসটা পলিউসানেই শেষ হয়ে যাবে। ডিজেল আর পেটরলের ধোঁয়া, ধুলো ইনডাসট্রিয়াল ফিউমস, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, জমে থাকা জঞ্জালের পচা বিষবাষ্পে ফিনিশ।

চল তা হলে।

হে মহানগরী। আবার ফিরে এলাম। আমি এখন ভূত, এই নিরীহ চেহারার মানুষটি হল প্রেত-লোকের বড়বাবু, চিত্রগুপ্ত।

সময়, বিকেল ছটা। স্থান ধর্মতলার চৌমাথা। বার, অফিসবার। দৃশ্য, আকাশে

-কাল মেঘ, কয়েক পশলা হয়ে গেছে, আবার আসছে।

চিত্রগুপ্ত ঃ বাবা! গিজগিজ করছে লোক। মৃত্যু দেখছি ফেল করেছে। এত মেরেও শেষ করতে পারছি না।

ভূত ঃ আজ্ঞে এঁরা মরণজয়ী কলকাতাবাসী।

চিত্রগুপ্ত ঃ আমি দাঁড়াব কোথায়। অনবরত গোঁত্তা মেরে চিৎপাত করে দিতে চাইছে।

ভূত ঃ এইভাবেই দাঁড়াতে হবে প্রভু। পাতাল-রেলের টিনের বেড়ায় পিঠটা ঠেকিয়ে রাখুন। মনে রাখবেন বেঁচে ফিরতে হবে।

চিত্রগুপ্ত ঃ এখানে দাঁড়াব কেন?

ভূত ঃ যখন মানুষ ছিলাম তখন রোজ এইখান থেকে বাস ধরে উত্তর কলকাতায় যাবার চেষ্টা করতাম।

দৃশ্য॥ বিশাল একটা মিছিল ফেসটুন-মেসটুন নিয়ে মনুমেণ্টের দিকে চলেছে। শ্লোগান—রুখবই রুখব, রুখবই রুখব। উল্টোদিকে মিছিলের মতই ছাড়াছাড়া একটা দল হল্লা করতে করতে চলেছে। ঘূর্ণিঝড় যে পথে যায় সব ভেঙেচুরে রেখে যায়। পতাকার লাঠি দিয়ে বাসের পেছনে, মোটরগাড়ির চালে, কাঁচে ধড়াম ধড়াম করে মারছে। বৃদ্ধ মানুষের চোখ থেকে চশমা খুলে নিচ্ছে। গাড়ির পেছনের আসনে বসে থাকা মহিলার ঝুঁটি নেড়ে দিচ্ছে। হে রে রে! এদের উল্লাসের চিৎকার। মিছিলের রুখবই রুখব। সব দিকের বাস বন্ধ। নিরীহ পথচারী ত্রস্ত। দোতলা বাসের একতলার জানালায় পা রেখে কিছু যুবক দোতলায় উঠে ড্যাং ড্যাং করে ঝুলছে। ট্রামের ওভারহেড ট্রলি ধরে কয়েকজন। সামনে ঝুঁকে পড়ে মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার ছাড়ছে। ফটাফট, চটাপট, শব্দ, শব্দ আর শব্দ।

চিত্রগুপ্ত ঃ আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। এরা কারা। কি হচ্ছে। কি হবে!

ভূত ঃ ধীরে প্রভু, ধীরে। খেলা ভেঙেছে, মিছিল চলেছে।

চিত্রগুপ্ত ঃ খেলা ভাঙা মানেই কি সব ভেঙেচুরে তছনছ করা!

ভূত ঃ আনন্দ, উল্লাস। যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

চিত্রগুপ্ত ঃ মারা পড়বে যে। ট্রামের ট্রলিতে হাই ভোলটেজ চলেছে, শক খেয়ে মরবে যে! দোতলা বাসের জানালা থেকে চিৎপাত হলেই মার কোল খালি!

ভূত ঃ আপনার মৃত্যু এদের কাছে ম্লান। মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান। মরবে এরা, যারা রুখবই রুখব-র মিছিলে নেই, ময়দানের খেলা ভাঙার হুল্লোড়ে নেই।

চিত্রগুপ্ত ঃ নাঃ যমরাজকে বলতেই হবে, মহারাজ আপনার মৃত্যুর দাঁতের ধার কমে গেছে।

দৃশ্য॥ সার সার দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ ঠাসা বিভিন্ন মাপের বাসের ভেতর থেকে আর্তনাদ, গোঙানির শব্দ। অ্যাই কনডাকটার চালাও না বাপ। কি করে চালাব ছেলে সামনে মিছিল, খেলা ভেঙেছে। বাসের ভেতর থেকে বৃদ্ধের আর্তনাদ, আর করব না, ওরে বাপ আর করব না, আমাকে নামিয়ে দাও। ধ্যার মশাই, নামবেন কি করে। মরতে হয়, এখানেই মরুন, টার্মিনাসে গিয়ে মাল খালাস করে নেবে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার এক ভদ্রলোক চিত্রগুপ্তকে এসে বলছেন —কি করে একটা ট্যাকসি পাই। ওই দেখুন আমার স্ত্রী রাস্তার ওপর বসে

পড়েছে। ভীষণ অসুস্থ। অন্ধকার উত্তর দিল, ট্যাক্সি কোথায় পাবেন, নিউ-মার্কেট থেকে একটা ঝাঁকামুটে ভাড়া করে আনুন। ট্যাক্সি পাবেন না, খেলোয়াড়-দের ভয়ে রাত আটটার আগে কোনও বাস এ তল্লাটে আসবে না। রাত নটার আগে এ জ্যামও খুলবে না। আবার বৃষ্টি শুরু হল।

চিত্রগুপ্ত ঃ ওই যারা রুখবই রুখব করছে, কি রুখতে চাইছে।

ভূত ঃ প্রথমে চক্রান্ত রুখবে, তারপর লোডশেডিং রুখবে, আসলে যানবাহন রুখেছে।

চিত্রগুপ্ত ঃ কিসের চক্রান্ত, কার চক্রান্ত! বিদেশী চক্রান্ত নাকি?

ভূত ঃ না স্যার, দেশী চক্রান্ত। যখন যে দল পাওয়ারে আসে তারাই অফিস ছুটির পর রোজ একটা করে মিছিল বের করে। প্রতিটি ক্ষমতাসীন দলেরই ধারণা, বিদায়ী দল, সংবাদপত্র, ব্যবসাদার মিলে, ঘোরতর একটা চক্রান্ত করে ন্যাজে-গোবরে করার তালে আছে।

চিত্রগুপ্ত ঃ ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গাত্রে হল ব্যথা।

দৃশ্য॥ জোর বৃষ্টি। কেরানী ভেজান বৃষ্টি। যে যে দিকে পারছে ছুটছে। একজন ছুটন্ত আর একজনের চটি পেছন দিক থেকে চেপে ধরেছেন, তিনি হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, পাশ দিয়ে যিনি ছুটছিলেন তিনি অভ্যাসবশে বলে গেলেন —সরি। চিত্রগুপ্ত ছুটছেন গাড়িবারান্দার তলায় আশ্রয় নেবার জন্যে। কোথায় আশ্রয়? সেখানেও শক্তির লড়াই চলেছে। সবল দুর্বলকে টপকে, ধাককা মেরে, গাড়িয়ে জায়গা দখল করছে। ঠেলতে ঠেলতে হয় খোলা রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে, নয়তো দেয়ালে পিষে পুঁটকি পেণ্ট করে ছাড়ছে। অহঙ্কারী গাড়ি দুপাশে জল-কাদার ফোয়ারা তুলে হু কেয়ারস হুম ভাবে ছুটছে।

চিত্রগুপ্ত ধপাস। আমার কি? আমি তো মরে ভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি। বাতাসের মত, আকাশের মত।

ভূত ঃ কি হল প্রভু?

চিত্রগুপ্ত ঃ সিলিপ করে পড়ে গেলুম, না পেছন থেকে ল্যাং মারলে বুঝতে পারছি না। কোথায় পড়লুম বল তো?

ভূত ঃ আজ্ঞে ফুটপাথে।

চিত্রগুপ্ত ঃ এর নাম ফুটপাথ?

ভূত ঃ কলকাতার ফুটপাথ প্রভু। সিঙ্গাপুর কি হংকং-এর নয়। এর চেয়ে জঘন্য ফুটপাথ আপনি পাবেন?

চিত্রগুপ্ত ঃ সারায় না কেন?

ভূত ঃ কে সারাবে, কেন সারাবে, কাদের জন্যে সারাবে। সারালেই বেদখল, গোটাকতক প্রদেশের মানুষে মানুষে মারদাঙ্গা। ভাগের মা গঙ্গা পায় না স্যার! নিন উঠে পড়ুন। এই তো সবে শুরু। এই অঞ্চলটা ত নরকের ঠোঁট। আসল গহ্বরে ত এইবার ঢুকতে হবে।

॥ ২ ॥

ভেনিস হবার সব গুণই কলকাতার ছিল। ইংরেজরা ভুল করেছিলেন। জাতের দোষ। ইংরেজরা যেখানে যেখানে কলোনি করতে গেছেন, সেইখানেই একটা করে ইংল্যান্ড বানাবার চেষ্টা। কলকাতার মাঝখানটা ছিল লন্ডন উত্তরটা হারলেম,

দক্ষিণটা জেরুজালেম। অথচ কত সহজেই আজ আমরা এই শহরটাকে ভেনিস করে ফেলতে পারি। নতুন করে লিখতে পারি মহান একটি উপন্যাস—ডেথ ইন ভেনিস।

দেখতে দেখতে জল জমে রাস্তাঘাট বেপাত্তা হয়ে বেশ একটা ভরাট ভরাট উদার উদার চেহারা তৈরি হল। ভূত আমি আর চিত্রগুপ্ত কোনওরকমে ভিকটোরিয়া হাউসের ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম। স্বর্গের বৃদ্ধ মর্তের নরকে এসে এরই মধ্যে বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। আগেই চিনিয়ে রাখলুম, স্যার এই স্থানটি আঁধারে ঘেরা, কারুর কারুর পক্ষে অতিশয় নিরাপদ, আলোর উৎপাত নেই। প্রদীপের নিচেই অন্ধকার, কত সত্য দেখুন। এই গৃহ হইতেই বিদ্যুতের বিলাবিল, না একটা বিল, মেশিন মেড হয়ে দিকে দিকে বিদ্যুৎহীন বাড়িতে প্রবেশ করে। গেরস্থের চক্ষু ছানাবড়া হয়। সেই ছানাবড়া চোখের সামনে নৃত্য করে ওঠে মোলায়েম বিজ্ঞাপন—হে পুরবাসী! শোন বিদ্যুতের সমাচাব। বিলে টাকার অঙ্ক দেখে ঝম্প মেরুনি, আলোর যেমন মূল্য আছে অন্ধকারও কিছু ফেলনা নয়। অন্ধকার আছে বলেই আলোর এত দাম। অন্ধকার আলোর জননী এই জেনে বিলটি দিয়ে যাও, নইলেই কেঁচি।

চিত্রগুপ্ত ঃ এখানে দাঁড়ালে কেন?

ভূত ঃ মজা দেহেন না। সারা দিন এই মানুষগুলো অফিসে, সেরেস্তায় কলে কারখানায়, দালালদের অফিসে খেটে মরেছে। এইবার বাড়ি যাবার আশায় আঁকুপাঁকু করছে। সেখানে বউ আছে, মা আছেন, ছেলে আছে, পিলে আছে, বেকার ভাই আছে। একচিলতে ঘর আছে। নড়বড়ে খাট আছে, ছোবড়া-বেরোনো গদির ওপরে চোদ্দ টাকা দামের সেল থেকে কেনা একসপোর্ট কোয়ালিটি বেডকভার আছে। শুকনো রুটি আছে, সকালের তৈরি গেঁজে ওঠা তরকারি আছে। হিসেবের খাতা আছে। আয়ের ঘরে তিন ফিগার ব্যয়েব ঘরে চার ফিগারের ইনসমনিয়া আছে। তবু সেই সুইট হোমে যেতেই হবে।

চিত্রগুপ্ত ঃ ভূত হলেই কি বেশি বকতে হবে? যেতে হবে যাবে। তার জন্যে তোমার অত ভাবনা কেন?

ভূত ঃ কেমনে যাবে।

চিত্র ঃ হেঁটে হেঁটে যাবে। থপাত থপাত করতে করতে। জলে হাঁটার আনন্দ জান না। ভুলে গেলে নাকি শৈশবেব অভ্যাস। এবা সব শিশুব মত খলবলিয়ে, মাছেব মত খলখলিয়ে ফিরে যাবে আপন ঘরে।

ভূত ঃ এই জলের একটা অ্যানালিটিক্যাল বিপোর্ট আপনাকে দি। এই পদার্থ তরল একটি ডিজিজ কালচার। এতে টাইফয়েড, লেপরসি, কলেরা, একজিমা পোলিও এনকেফেলাইটিস, জনডিস ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণী মিলেমিশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই প্রবাহ—পথ ছেড়ে ঘবে ঢুকেও বসে আছে। এ ত আপনাব মন্দাকিনীব প্রবাহ নয়। জলে পা দেবাব আগে তাই কিঞ্চিৎ ইতস্তত। তা ছাড়া আচ্ছা নিজেই হেঁটে দেখুন। দেখতেই ত এসেছেন।

আকাশের মেঘের আলো নিচের দিকে প্রেতলোকের আলোর মত নেমে এসেছে। চতুর্দিকে কালো জলেব ঢেউ ভাঙার শব্দ। চারপাশে নিবেট, নিথর ভূতুবে বাড়ি। অসংখ্য কালো কালো মাথা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। হে হে করে হেসে উঠলুম।

চিত্রগুপ্ত ঃ হাসছ কেন? জান তোমার দেহ নেই। দেহহীন ভূতের হাসি

শুনে আমিই চমকে উঠেছিলুম।

ভূতঃ দুটো কারণে হাসলুম মহাজন। এক, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। এক সময় আমাকেও এই ভাবে হা বাস, হা ট্রাম, হা বাড়ি করে নিত্য নাচানাচি করতে হত। আজ আর সে দুশ্চিন্তা নেই। আবার যখন এই গোবর ঈশ্বরের গোশালায় পড়ে ঘুঁটে হয়ে পৃথিবীর ফারনেসে নেমে আসবে তখন আর হাসব না, ভেউ ভেউ করে কাঁদব। হাসির দ্বিতীয় কারণ, ডোবায় ব্যাঙ ভাসে আর গ্যাঙোর গ্যাঁঙোর করে ডাকে। প্রভু, এদের কণ্ঠেও এমনি কোন স্বতোৎসারী জীবনের ডাক জুড়ে দাও না।

চিত্রগুপ্ত ঃ তাহলে কি হবে!

ভূত ঃ এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একহাঁটু ময়লা জলে দাঁড়িয়ে থাকার উদ্বেগ আর ক্লেশ কত কমে যেত। সবাই কোরাসে ডাকছে, কোলা ডাকছে, সোনা ডাকছে, কুনো ডাকছে। ডাকছে ত ডাকছেই। নাম সংকীর্তনে কেমন একটা মাতোয়ারা ভাব আসে, দৈহিক ক্লেশ আর কাবু করতে পারে না। তা ছাড়া এইরকম একটা সাইড ডায়ালগ কেমন লাগবে?

রমা ঃ বিপ্লব তুমি কি কলকাতা থেকে আসছ?

বিপ্লব ঃ হ্যাঁ বউদি। আজ খেলা ছিল। যা করে এসেছি। জলে ডুবে গেছে। বাস নেই, ট্রাম নেই। জামাফামা ছিঁড়ে, চশমা-ফশমা ভেঙে, চুল-ফুল ছিঁড়ে। সব সহ্য হয়। সহ্য হয় না এইরকম খেলা! তুই অতবড় একটা পেলেয়ার, গোলের দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে বলটা সোজা গোলকিপারের হাতে তুলে দিলি! এর নাম খেলা!

রমা ঃ না, সে ত ঠিক কথাই। কিন্তু দশটা বেজে গেল, তোমার দাদা ফিরলেন না।

বিপ্লব ঃ দাদা? দাদাকে ত দেখে এলুম ধর্মতলার ডোবায় দাঁড়িয়ে গ্যাঁঙোর গ্যাঁঙোর করছেন। পাশে অধীরদাও রয়েছেন।

চিত্রগুপ্ত ঃ তার মানে তুমি বলছ কলকাতা ভেসে গেলেই বাবুরা সব ভেক হয়ে ডাকতে থাকবেন?

ভূত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই শব্দায়মান মণ্ডূকদের মধ্যে দিয়ে ঢেউ খেলে খেলে চলে যাবেন মন্ত্রীরা, পুরপ্রধানেরা, স্টেট বাসের বড়কর্তারা। যেতে যেতে বলবেন, ওঃ তোফা বৃষ্টি হয়েছে, খুউব ডাকছে আজ, খুউব ডাকছে।

চিত্রগুপ্ত ঃ দেখ ত, দেখ ত পায়ে এটা কি লাগল? গিরগিটির মত?

ভূত ঃ ধ্যাত মশাই। ড্যাঙ্গা খুঁজতে খুঁজতে কোথায় গিয়ে উঠেছেন। এখুনি যে মাড়িয়ে ফেলবেন। ওখানে মানুষের শূককীট কিলবিল করছে। দেখছেন না, ধনুকের মত একসার মানুষ প্ল্যাস্টিকের ঠোঙায় ঢুকে হিলহিল করছে। ওর মধ্যে নারী আছে পুরুষ আছে। সোস্যালিস্টদের খাদ্য ওরা। ওরা আছে তাই ডেমোক্র্যাসি আছে। ওরা আছে তাই সোস্যাল-ওয়েলফেয়ার আছে। বৈদান্তিকের ভগবান আছে। কিছু মানুষের আয়েস আছে।

চিত্রগুপ্ত নিচু হয়ে দেখলেন। হ্যাঁ মানুষেরই বাচ্চা। আকৃতিতে গিরগিটির চেয়ে সামান্য বড়। অন্ধকার না হলে চিত্রগুপ্ত আরও একটু ভাল করে দেখতে পেতেন, সাদা খ্যাসখেসে গায়ের চামড়া, কুঁচকে লেগে আছে হাড়ের গায়ে। ছটাক-খানেক রক্ত শরীরের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত। জর্দার কৌটোর মত এতটুকু একটা হৃদয় সেই রক্ত পাম্প করে করে হয়ত একেও একদিন ওই বসে থাকা

ধনুক তৈরি করে দেবে। একটি ভোট, একজন লিকলিকে মেহনতি মানুষ, অথবা একটি ছিঁচকে চোর কিংবা ইনফরমার বুটলেগার, পিম্প, প্রসটিটিউট।

চিত্রগুপ্ত ঃ এর নাম মানুষ? ওহে ভূত, কে এদের পিতা, কে এদের মাতা। এরা কোন সাহসে জন্ম দেয়?

ভূত ঃ সেই সাহসে, কোনও একদিন, গ্রাম গ্রামেই থাকবে, শহর শহরেই থাকবে। বৃত্তি অনুসারে সুস্থ জীবিকার ব্যবস্থা হবে। জমি হবে জমা হবে। ন্যূনতম জীবনযাত্রায় মানুষ একটু মানুষের মত বেঁচে থাকবে। গ্রাম এদের শহরের দিকে ঠিলে দেবে না ফুটপাথের ভিখিরী করে। স্বামী বিবেকানন্দকে আপনারা এখন কোথায় রেখেছেন প্রভু?

চিত্রগুপ্ত ঃ তিনি এখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক ঋষি। কথামৃতেই আছে, তিনি যেখান থেকে নেমে এসেছিলেন সেইখানেই ফিরে গেছেন। কেন?

ভূত ঃ আজ্ঞে তিনি খুব জোর গলায় বলে গিয়েছিলেন, আই হোলড এভরি ম্যান এ ট্রেটার যারা এইসব অবদলিত মানুষদের ভাঙিয়ে শিক্ষিত হয়, ধনী হয়, রাজনীতি করে, গলাবাজি করে। তারপর বছরে একদিন বিশেষ উপলক্ষে গায়ে আতর মেখে এসে গোটাকতক কমলালেবু ছুঁড়ে মারে, খানকয়েক সুতোর কম্বল বিলোয়।

তা হলে নীতিবাক্যটি এই দাঁড়াল ঃ চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। যে রাস্তায় গেলে আখেরে ভাল হবে সেই রাস্তায় তোমার পূর্বপুরুষ যদি তোমাকে ঠেলে দিতে পারেন এবং তুমি যদি ঠিকমত চলে থাকতে পার তা হলেই তুমি, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, এম পি, এম এল এ, ডক্টর, প্লিডার, লিডার, সেক্রেটারি, ডিরেকটার, কাউনসিলার, কমিশনার, প্ল্যানার। মর্তলোক আর স্বর্গলোকের মাঝখানে একটি খেলাঘর। দর্শনের বই পড়বে কিন্তু দেখো কৌপীনটি যেন খুলে না পড়ে। বিবেকানন্দ পড়বে, বড় বড় কোটেশান ঝাড়বে কিন্তু সাবধান নিজের ঘর সামলে। হ্যাঁ, সোস্যালিজম করবে তবে নিজেকে বাইরে রেখে। ডেমোক্রেসি অবশ্যই ভাল জিনিস, উত্তম দৃষ্টিভঙ্গী তবে নিজের অটোক্রেসি বাঁচিয়ে। তা না হলে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভাল ভাল কথা, জ্ঞানের কথা, ত্যাগের কথা আদর্শের কথা বলা হয়েছে তার তিনের চার ভাগ উঠেছে ভারতের মাটি থেকে এবং আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

চিত্রগুপ্ত ঃ নর্দমা দিয়ে যে ভাবে জল গলে যায় সেই ভাবেই ত গত তেত্রিশটা বছর তোমাদের পরিকল্পনার পয়ঃপ্রণালী দিয়ে টাকা গলে গেল। এদের কিছু হল না কেন?

ভূত ঃ সুবাতাসে পালটি তুলে যারা পেরেছে তারা মালটি ধরে তলার পরে তলা তুলেছে। শকুনের দৃষ্টি চাই, শৃগালের বুদ্ধি চাই, সাধকের উদাসীনতা চাই, চোরা লনঠনের আলোর সংকীর্ণতা চাই তবেই না হাওয়া মহলের বাসিন্দা হওয়া যায়।

চিত্রগুপ্ত ঃ তোমার ওসব সেন্টিমেন্টাল কথার কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। আমি মৃত্যুর দপ্তরের বড় বাবু। অনেক আগে ডারউইন নামক এক পণ্ডিত এসে সব রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। বাঁচতে পার বাঁচ না পার হড়কে যাও। ভগমান আছেন, ভগমান আছেন করলে কাঁচকলা হবে। তবে আমারও সন্দেহ হচ্ছে।

ভূত ঃ কি সন্দেহ প্রভু?

চিত্রগুপ্ত ঃ ডারউইনের থিওরিটা ঠিক নয়। কত বছর বললে? চৌত্রিশ বছর! স্টিল গোয়িং স্ট্রং। এরা বেঁচে আছে। তোমাদের সিস্টেমে বেঁচে থাকবে কারা, পোলিটিসিয়ান, ফিজিসিয়ান, প্লেয়ার, গ্যাম্বলার, ট্রেডার, মার্ডারার, ল-মেকার্স, ল-ব্রেকার্স, রুলার্স, ডিফেকটার্স, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এরা কেন বেঁচে আছে। খুব ভয়ের কথা। যে অবস্থাটাকে আমরা মৃত্যুর পক্ষে আদর্শ বলে মনে করতুম, আহা, গিরগিটি বা ধনুকের মত হলেও মানুষ শুধু বেঁচে নেই বংশবৃদ্ধিও করছে। কি সাংঘাতিক কথা। যমরাজকে বলতে হচ্ছে।

ভূত ঃ মা ভৈঃ! ফারমেনটেসান কাকে বলে জানেন? নিশ্চয় জানেন। ব্যাকটিরিয়া কি ভাবে জন্মায় জানেন? তাও জানেন। গেঁজে ওঠা নরকে, দারিদ্র্যের খমিরে এক ধরনের জীবন বজবজ করে বেড়ে উঠছে। হ্যাঁ তারাও মানুষ। হতে পারে, তাদের হৃদয়বৃত্তি, অনুভূতি, নৈতিকতা, সুখ-দুঃখ বোধ অন্যরকম। তারা ছাদেব চেয়ে খোলা আকাশের তলায় ভাল থাকে। হাইজিনের হা শোনে নি, শোনার প্রয়োজনও নেই। ম্যালনিউট্রিসানটাই তাদের নিউট্রিসান। রাস্তার এই আবর্জনাধোত জলই তাদের পেনিসিলিন। প্যানজার বাহিনীর মত, প্যাটন ট্যাংকের মত সব গ্রাস করতে করতে এরা এগিয়ে আসছে। আর ওদিকে হর্ম্যতলবাসী উচ্চাঙ্গ-মানব প্রোটিন, নিউট্রিসান, স্টেরিলাইজেসানের চাপে টপাটপ রসগোল্লার মত আপনাদের মুখে চলে যাচ্ছে। হৃদয়হীন হৃদয় মুঠোয় করে ধরছে থ্রম্বোসিস। ক্যানসার কুরেকুরে খেয়ে চলেছে। মৃত্যুর দরবার ফাঁকা যেতে পারে না প্রভু!

চিত্রগুপ্ত গুটি গুটি হাঁটছেন। ভেবেছিলেন মন্দাকিনীর পাতা ভর জলে মিহি বালির ওপর দিয়ে বেশ খেলে খেলে হেঁটে যাবেন। আমি জানি, জলের তলায় কি আছে। ভূত হয়ে গেলেও কলকাতার ভূত্বক ত এখনও ভুলি নি।

চিত্রগুপ্ত ঃ বুঝলে ভূত।

ভূত ঃ আজ্ঞে প্রভু।

চিত্রগুপ্ত ঃ লজিক পড়েছ। পড়নি? তা হলেও বুঝতে অসুবিধা হবে না। শিশুরা জলে হাঁটতে ভালবাসে অর্থাৎ জলে হাঁটলে শিশু হয় তার মানে শিশুর মত দেহ না হলেও মন পবিত্র হয়। তোমার হচ্ছে না।

ভূত ঃ আমার মনই ত নেই। পবিত্র আর অপবিত্র।

চিত্রগুপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হল না। তিনি হঠাৎ অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে ঢেঁকিব মত ঘপাস করে নেমে গেলেন। চিত্রগুপ্ত ভ্যানিশ। বুদ্ধের সলিল সমাধি। গভীর গর্তের ওপব আধ ভাঙা একটি কংক্রিট স্ল্যাব কোনও-রকমে ফেলা ছিল। অসংখ্য ডেথ ট্র্যাপের একটি ট্র্যাপ। কলকাতার মানুষ জানেন। 'মবতে চাইলেও মরব না' এই প্রতিজ্ঞায় পাশ কাটিয়ে ভোলে বাবা পার করে গা বলে চলে যান। স্বয়ং যমের দফতরী সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেঁসে গেছেন।

হঠাৎ কলকাতাব সমস্ত টেলিফোন ডেড হয়ে গেল। কেউ প্রেমিকার সঙ্গে বর্ষাব প্রেমালাপ করছিলেন, জনৈক মন্ত্রী সেক্রেটারীকে ধমকাচ্ছিলেন, বালিগঞ্জের মাসী তালতলাব পিসীকে খিচুড়ির ফর্মুলা শেখাচ্ছিলেন কবি সম্পাদককে বিছানা থেকে তুলে কবিতা শোনাচ্ছিলেন, বড়বাজারের ব্যবসায়ী ট্রাংককলে দিল্লীর ভাযবাভাইকে লোহা আর সিমেন্টের পারমিটেব কথা বলছিলেন, ডাক্তার জনৈকা রোগীনীর একসট্রা কেয়াব নিচ্ছিলেন, সমস্ত লাইন একসঙ্গে ডেড। হ্যালো, হ্যালো। লাখ লাখ হ্যালো। সব হ্যালোরই এক উত্তর, 'ইয়েস চিত্রগুপ্ত স্পিকিং। হোয়াট? চিত্রগুপ্ত স্পিকিইং।

সমস্ত টেলিফোন লাইন যেখানে জট পাকিয়েছে সেই জটায় আটকে চিত্রগুপ্ত ভূগর্ভে ঝুলেছেন। এদিকে কলকাতার বুকে কালো জল আরও গভীর ও ঘন হয়ে উঠেছে। আবার বৃষ্টি আসছে ঝেঁপে। প্রতিটি বাড়ির জানালায়, দরজায় উৎকণ্ঠিত মুখ। ছেলে ফেরেনি, মেয়ে ফেরেনি, স্বামী ফেরেনি, স্ত্রী ফেরেনি বন্ধু বান্ধবী কেউ ফেরেনি। সবাই রাস্তায় হাবুডুবু। বেতারে কাব্য চলেছে—আজ এই বর্ষণ-মেদুর রাতে কলকাতা অতি সুজলা। এখানে বারো, ওখানে আঠারো, যেখানে কয়েক কোটি খরচ করা হয়েছিল জল জমা বন্ধ করার জন্যে সেখানে ডুব জল। পৌর কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন এবার কলকাতায় আর তেমন জল জমতে দেওয়া হবে না। জল নিয়ে ছেলেখেলা আর চলবে না। সর্দি হলে, নিউমোনিয়া হলে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে কে দেখবে? ও রে! দুষ্টু ছেলে। মাফ করবেন স্টুডিওর দরজা লিক করে পাশের স্টুডিওর কিছু কথা ঢুকে পড়েছে। হ্যাঁ বর্ষা এসেছে। বর্ষা বর্ষা সুন্দরী বর্ষা।

জনৈক দারুবিলাসী জলের ওপর গোটাকতক খালি বোতল ভাসিয়ে গান গাইছে 'তোরা কে কে খাবি আয়। ওরে নদেবাসী বলে দে রে আসি, দেখেছিস তারে এই নদীয়ায়।'

আমহার্স্ট স্ট্রিটের জলে দুটি মৃতদেহ ভেসে চলেছে। কলকাতায় এ দৃশ্য প্রথম। 'কেয়ারি বন্ধ করো নেহি তো ঘুস যায়ে গা।' সারি সারি বন্ধ দরজায় কখনও হাতের কখনও পায়ের কখনও গলিত মাথার ধাক্কা মারতে মারতে দুটি মৃত মানুষ ভেসে চলেছে।

বন্ধ ঘরে ফিসফিস আলোচনা—এ কি দৃশ্য! ডুবে মরেছে। ও নো নো মার্ডার। ম্যানহোল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ডেথ ইন ভেনিস।

॥ ৩ ॥

চিত্রগুপ্ত কলকাতার তলায় তলিয়ে বসে রইলেন। বাহাত্তর ইঞ্চি জলের পাইপ, টেলিফোন লাইন, আন্ডার-গ্রাউন্ড ইলেকট্রিক কেবলস নর্দমার জল, তার মধ্যে হাবুডুবু চিত্রগুপ্ত। ভূতেদের উদ্ধার করার ক্ষমতা নেই। ভাল করারও ক্ষমতা নেই। ভূত কেবল ভয় দেখাতে জানে। জীবিত অবস্থায় আমি ভূত দেখিনি। তবে ভূতের অনেক কীর্তিকাহিনী পড়েছি, লোকমুখে শুনেছি। আমাদের পাড়ার এক মহিলাকে ভূতে ধরতে দেখেছি। ভূত ছাড়ানোর দাওয়াইও দেখেছি। ভূত দেখার চেয়েও রোমহর্ষক প্রেত ছাড়াবার চিকিৎসা—ঝ্যাঁটা, জুতো, লাথি, কিল, চড়, ঘুষি, চুলের মুঠি ধরে আকর্ষণ, অকথ্য খিস্তি। শাস্ত্রবিরোধী কাজ আমি কেমন করে করব! ইচ্ছে করলে আমার হাতটাকে ফায়ার ব্রিগেডের টার্নটেবল ল্যাডারের চেয়েও বড় করে পাতাল প্রবেশ করাতে পারি চিত্রগুপ্তের টিকি ধরে তুলে আনতে পারি। পারলেও করব না। ভূত-কালচারের বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি জানা নেই! একে ভূত, তায় কলকাতার ভূত!

জীবিত অবস্থায় কলকাতার নাগরিক হিসেবে যে সব আচরণে অভ্যস্থ ছিলুম সেই অভ্যাসের ওপর দাঁড়িয়েই আমার আচরণবিধি তৈরি করতে হবে। যেমন :

১। জীবনে কখনও কারোর ভাল করার চেষ্টা করিনি, সাহায্যে লাগার চেষ্টাও করিনি। চেষ্টা তো দূরের কথা, চিন্তাতে পর্যন্ত আনিনি। যদিও পড়েছি লিভ ফর আদার্স ইভন ডাই ফর আদার্স। বহু দূর থেকে শংকর আমার কানে কানে

বলেছিলেন, জেনে রাখ তিনটি দুর্লভ জিনিস জীবের কাম্য, মনুষ্যত্বং, তুমি সেটি পেয়েছ, এইবার আর দুটির জন্যে চেষ্টা কর, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষ সংশ্রয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, হ্যাভ ফেথ ইন ইওরসেল্ভস, গ্রেট কনভিকসানস আর দি মাদারস অব গ্রেট ডিডস। অনওয়ার্ড ফর এভার। সিমপ্যাথি ফর দি পুওর, দি ডাউনট্রডন, ইভন আনটু ডেথ। এ সব পড়েছি, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম চোখে এক কাপ গরম দুধ খেয়েছি—নাইটক্যাপ। খেতে খেতে ভেবেছি, হে ঈশ্বর! সকালে দাস্তটি যেন বেশ সাফা হয়। মুড়ি আর ভুঁড়ি, ভুঁড়ি আর মুড়ি। মনের ব্ল্যাকবোর্ডে শুধু লেখাই ছিল,

Learn to live with the thought that it is more important to be like God than to believe in God.

এখন মরে ভূত।

২। অন্যের আচরণেও আমি তাই দেখেছি। গল্পের সেই চরিত্রটির মত প্রতিবেশীর কাছে মই চেয়ে দেখেছি, বলেছেন সিন্দুকে আছে। জাল চেয়ে দেখেছি, বলেছেন, জালে সরষে বাঁধা আছে। বিপন্ন আত্মীয়কে মধ্য রাতে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি চেয়ে দেখেছি, বলেছেন, ড্রাইভারের কাছে চাবি, ওঃ অফুলি সরি, গামছা দিয়ে বেঁধে রাখুন, পরানটাকে যদি বেঁধে রাখা যায়, জীবনটাকেও এক রাত বেঁধে রাখা যাবে।

৩। আমি ছিলুম সেই প্রবাদোক্ত পুরুষ। 'আমি খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না। আমি বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না। আমি পড়েছিলুম, এ জীবন ধরিত্রীর দান। তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে। তোমার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি অন্যের দান। গাভী তোমাকে দুগ্ধ দানে পুষ্ট করেছে (বয়ে গেছে)। মাতা তোমাকে স্নেহে লালনপালন করেছেন (বেশ করেছেন। বউ আগে না মা আগে। দাও বুড়িকে কাশীবাসী করে! যতেব বুড়িমা এক গলা গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ছেলের মুখে আগুন। বউ এলেই মা—মাগী? আমার স্ব-কর্ণে শোনা)। কৃষক তোমাকে চাষ করে অন্ন দিয়েছেন (তার বদলে পয়সা নিয়েছেন। যদ্দিন বেঁচে ছিলুম রেশানে একদিনও মনুষ্যখাদ্য চাল পাইনি। ব্ল্যাকে মজুতদারের চাল কিনেছি।) তন্তুবায় তোমাকে পরিধেয় বস্ত্র দিয়েছেন (প্রতি বাজেটে আমাকে ন্যাংটা করবার চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। শরীরের প্রতি ইঞ্চি ত্বকের দাম বাড়েনি, বছরে বছরে লাফাতে লাফাতে বেড়েছে কাপড়ের দাম)। সূর্য তোমাকে উত্তাপ দিয়েছেন, দীপ্তি দিয়েছেন (অবশ্যই দিয়েছেন, আলোবাতাসহীন ঘরে সপার্ষদ ঘেমে নেয়ে, বিষফোঁড়া, ঘামাচি নিয়ে, লিভার-পিলে বেড়ে, ফুলে, সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধাংশ ডাক্তার-বদ্যিকে দিয়ে, দীপ্তিমান সূর্যমুখী নেতিয়ে ন্যাতা হয়ে গেছি।) মেঘ বারিধারায় নদীকে জলপুষ্ট করে, সেচের জল, তৃষ্ণার জল দিয়েছেন (তা দিয়েছেন, সেই জল এসেছে শ্যাওলাধরা পাইপ বেয়ে, ব্যাকটিরিয়া মিশ্রিত হয়ে, শৈশবের ক্ষীণ মূত্রধারার চেহারা নিয়ে। সেচ যত না হয়েছে, বেশী হয়েছে বন্যা। বন্যায় ঘর ভেসেছে বানের জলে রাজ(নীতি) লক্ষ্মী ঝুমুর ঝুমুর হেঁটে কিছু মানুষকে ইয়ে করেছে। বন্যা আও কম্বল নাও, ভোট দাও)। বাস্তুকার তোমাকে বাসস্থান দিয়েছেন (হ্যাঁ দিয়েছেন, সেলামী, জিভ বের করা ভাড়া, আজ জল বন্ধ কাল বাথরুম বন্ধ, পরশু দেওয়ালে পেরেক ঠোকা নিয়ে ভাডাটে ভাড়াটেতে চুলোচুলি)।

অতএব তুমি সেই সব ঋণ তোমার জীবন দিয়ে শোধ করে যাও। দাতা যিনি তিনি দাতাই, গ্রহীতা যে সে গ্রহীতাই। আধুনিক ব্যবস্থায়, রেটপেয়ারস, ট্যাকসপেয়ারসদের কাছ থেকে ঘাড় ধরে আদায় করে নেওয়া হয় তার দেয়। সেই টাকাতেই ত জীবনের ঋণ শোধ! সেই ঋণ শোধের জন্যে নতুন করে ঋণ। ট্যাকস ইভেডারসদের জন্যে দণ্ড। মরে বেঁচেছি। শুল্কই যখন শূলে চাপিয়েছে তখন আবার সম্পর্ক কিসের, কিসের দানখয়রাত! যার যা পাওনা দফতর থেকে বুঝে নাও গে।

৪। তিনি লিখেছিলেন, কুকুরের সমাজ আছে, নেকড়ের সমাজ আছে, দে আর প্যাক অ্যানিম্যালস। মানুষের সমাজের আর তেমন বাঁধন নেই। ছাড়া ছাড়া, বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। এমন কে করেছে! মানুষই মানুষকে এমন কদাকার করে তুলেছে। এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, চারপাশে দিগন্তপ্রসারী নোনা জল। আমার আমিটিতে হয়ে যাব হারা। আমার সুখ আমারই সুখ, আমার দুঃখ আমারই দুঃখ। (একদিন ১৯৩৩ সাল, বেলা তিনটে। তখন আমি বেঁচে। রবিবার। শ্রীসেনগুপ্তর অসুখ। বড় অফিসার। আমার স্ত্রী বলেছিলেন, দেখা করে এস, এক বাক্স ভাল সন্দেশ নিয়ে যাও। উন্নতি হবে। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলুম দক্ষিণ কলকাতায়। বিশাল বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি। প্লট মিলিয়ে নম্বর মিলিয়ে, সেকেন্ড ফ্লোরে উঠলুম। মহা সমস্যা! মুখোমুখি দুটি ফ্ল্যাট, দুটি কলিং বেলের বোতাম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কোনটা টিপব! ডান দিকেরটা? বাঁ দিকেরটা? কোনও নেম প্লেট নেই। অলওয়েজ টার্ন লেফ্ট। বাঁয়ের বোতামে আঙুল। উগ্র চেহারার একজন মানুষ, স্লিপিংস্যুট পরে, রাগ রাগ মুখ করে দরজা খুললেন। প্রশ্নের বান ডেকে গেল, কি চাই, কাকে চাই, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট। ভদ্রলোকের গলার পাশ দিয়ে ভেতর থেকে আর একটি সুরেলা গলা ভেসে এল, কে এ গো, মিহির টিকিট পেয়েছে! ভদ্রলোক অদৃশ্য স্ত্রীকে ধমকে উঠলেন—কোথায় মিহির। হি ইজ অ্যা স্কাউন্ড্রেল। ওকে আমি জলপাইগুড়ি ট্রানসফার করে দেব। কি চাই আপনার?

মিঃ সেনগুপ্ত কি এখানে থাকেন?

হু ইজ ইওর সেনগুপ্ত?

আজ্ঞে লালবিলডিং-এর অমুক ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক

নো ও।

দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বেশ এবার তা হলে ডানটা টিপি। একজন ভৃত্য দরজা খুললেন। সেনগুপ্ত সাহেব আছেন? ভেতর থেকে মিঃ সেনগুপ্তর গলা ভেসে এল।

কে-এ?

আজ্ঞে আমি।

ব্যালকনিতে বসে অসুস্থ সেনগুপ্ত আর সুস্থ শ্রীমতী সেনগুপ্তা চা খাচ্ছেন? আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন, রেগেও গেছেন মনে হল।

কি চাই?

দেখতে এলাম স্যার, কেমন আছেন?

হ্যাঁ, ভাল।

কথা দুটো কেটে কেটে বললেন। বসতেও বললেন না, স্ত্রীর সঙ্গে মৃদু মৃদু সোহাগের গলায় কথা বলতে লাগলেন।

আমি আসি স্যার?

হ্যাঁ, আসুন, ইয়েস, আসুন।

আবার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

সন্দেশের বাক্সটা হাতে নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে এলুম। জীবনে সেই একবারই দশ টাকার সন্দেশ একা খেয়েছিলুম।

শিক্ষা। উচ্চ (অর্থ) বর্ণের মানুষ মুখোমুখি বসবাস করলেও পরস্পর পরস্পরকে না চেনার ভাণ করে গর্ব অনুভব করেন। ড্যাম, ম্যাড, ফ্যাট, ম্যাট, ভ্যাট, কথা বলার ধরনটাই এই রকম। অবশ্যই কষ্টার্জিত। এই সব পদস্থ মানুষকে নিম্ন পদস্থ মানুষরা দেখতে এলে অপদস্থ তো হবেনই, এমন কি ট্রানসফার অথবা সাসপেনসানও হয়ে যেতে পারে। অন্যের মান হরণ করলে মানী ব্যক্তির মান আরও বেড়ে যায়।

জীবনে যা শিখেছি, মরেও তা ভুলতে পারি না। স্পিরিটে আটকে গেছে বেঁচে থাকার ধরন। যেমন বীজ তেমনি ধান। যেমন জীবন, তেমন স্পিরিট। আমি তা হলে কেমন ভূত?

স্পর্শকাতর, ক্ষতিকারক, নীচ, কপট, ধূর্ত, খল, হিংসুটে, সংকীর্ণ।

সুতরাং, আমার প্রথম কাজ, জলমগ্ন শহরের সব আলো নিবিয়ে দি, তারপর ট্রাম কোম্পানির কর্মীরা যে সব ম্যানহোল খুলে জল বের করবার চেষ্টা করছিলেন ও একটি করে হুঁসিয়ারী নিশানা উঁচিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো সরিয়ে নি। যে ক'টা বাস, ট্যাক্সি চলব চলব করছিল তাদের বিগড়ে দি। বিলিতি কায়দায় যাঁরা ম্যারুনড মানুষকে লিফ্ট দিতে চাইছিলেন, তাঁদের মনে ঢুকে স্বার্থপর করে তুলি।

সারা কলকাতাটাকে বানিয়ে দি ভূতের কলকাতা।

তারপর জীবনে যাকে কোনভাবেই ভয় দেখাতে পারিনি, আমার সেই সদ্য বিধবাটিকে একবার ভয় দেখিয়ে আসি। শোবার ঘরের জানালায় আমার ভৌতিক মুখ,—

শ্যাঁমাঁ, শ্যাঁমা, ও শ্যাঁমা।

কে? কে?

আঁমিঁ, আঁমিঁ, অঁশোঁক। হি হি। বড় কষ্ট।

শ্যামা উঠল তারপর দাঁত ছিরকুটে ঘরের কোণে আছাড় খেয়ে পড়ল।

নেপাল রাইস

আমার বাবার একটা ধানগাছ ছিল, সেই গাছের এক-একটা ধান থেকে যা এক-একটা চাল হত সেই একটা চাল বইবার জন্যে পর পর দুটো গরুরগাড়ি লাগতো। একটা চালে গোটা গ্রামের লোকের পেট ভরে যেতো। সেই ধানগাছের কাঠে তৈরি হোতো ফার্নিচার। মিথ্যেবাদীর গল্পে এইরকম শোনা গেছে। এবার

সত্যবাদীর গল্প। আমাদের পাড়ায় একটা রেশনের দোকান আছে যেমন সব পাড়ায় আছে। সেই দোকানে কার্ড দেখালেই নেপাল চাল পাওয়া যায় যেমন পাওয়া যায় অন্য সব রেশনের দোকানে। এই নেপাল চাল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে হলধারী হলকর্ষণ করে পেটরোগা কলকাতাবাসীদের জন্যে তৈরি করেছেন। এক একটি, গীতোক্ত আত্মপুরুষের গুণসম্পন্ন—ইহাকে জলে সিদ্ধ করা দুরূহ। আধুনিক প্রেসার কুকার সিটি মারিয়া মারিয়া অস্থির, এক সিলিন্ডার গ্যাস ফক্কা ফাঁক—যতবারই টিপিয়া দেখি চাল হইতে ভাতের সম্ভাবনা অধিকাংশ বাঙালীর প্রতিভার মত প্রস্ফুটিত মাত্র, পূর্ণ বিকশিত নয়। এ চালের ভাত চাল মেরে খাবার নয়। হয় গিলে খাও না হয় শিলে বেটে খাও। এই চাল গৃহীর সন্ন্যাস। এই চাল নারীর অভিমানের মত। খাবার পাতে সব সময় বেঁকে বসে আছেন। কারুর সঙ্গেই হাতমেলাতে রাজি নন। ডাল ঢালুন, ঝোল ঢালুন ভাত মাখে কার পিতার সাধ্য। এর কাছে সব কিছু তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, হাম সাচ্চা হ্যায়। এই বস্তু কাউকে সঙ্গে নিয়ে মিলেমিশে পেটে যাবার মাল নয়। ডাল ভেসে যায়, ঝোল ভেসে যায়, মধ্যপাতে ঘরজামাইয়ের মত গ্যাট। পৃথিবীর সমস্ত সুস্বাদু ব্যঞ্জনের স্বাদ এই জিনিস চ্যালেঞ্জ করে মেরে দিতে পারে। এর ওপর খাসবাবুর্চির রান্না মুরগীর কোর্মা ঢাললে ক্ষেন্ত পিসির কাঁচকলার ঝোলের মত মনে হবে। যে গৃহস্থ ভোগ ভোগ করে, সংসার কটাহে আত্মবিস্মৃত হয়ে দুর্ভোগ ভুগছেন এই নেপাল চালের ভোগে, কয়েকদিন তাঁর সেবা করলেই, আপসে তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবে—হরি ওঁম তৎ সৎ। সপ্তাহান্তে তিনি গৃহিণীকে মাতৃ সম্বোধন করবেন। দোতলার জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে, সামনের বাড়ির পরস্ত্রীতে লোলুপ দৃষ্টি দেবেন না। আমার আমার বলে, অস্থির হবেন না। খুড়োর ছেলের বিষয় ধরে টানাটানি করবেন না, কর্মস্থলে কারুর পেছনে লাগবেন না। তাঁর পরিপাক শক্তি পৃথিবীর বার্ষিক গতির পথে চলবে। ৭৮ সালের বসন্তের আহার ৭৯ সালের বসন্তে হজম হবে। অনেকটা জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার মত। বৎসরান্তিক পাঁচন সেবন।

ইদানীং সমরবাবু নেপাল চালের রাজনীতির শিকার হয়েছেন। রোজ সকালে তাঁর ধাঁড়িবাজ স্ত্রী ভাতের বদলে, এই ভেতো বাঙালীটিকে চারখানা হাতে গড়া রুটি, চারাপোনার রেপসীড ঝাল দিয়ে পরিবেশন করছেন। সমরবাবুর ধারণা, বিবাহিত জীবনের কুড়ি বছরে, স্ত্রীর প্রতি যত দুর্ব্যবহার করেছেন, ভদ্রমহিলা নেপাল চালকে শিখণ্ডী খাড়া করে এখন তার শোধ নিচ্ছেন। স্ত্রীর পক্ষের বক্তব্য, সকাল নটার মধ্যে সমরবাবুকে নেপাল চালের ভাত পরিবেশন, দ্রৌপদীরও অসাধ্য। খোলা বাজারে, বেঙ্গল ফাইন অচেল, সমরবাবু আদর্শ পাকড়ে বসে আছেন, ব্ল্যাকে চাল কিনবো না, ভালবেসে যা দেবেন, তাই মেনে নিতে হবে। পরিপাক যন্ত্রকে সেইভাবে তৈরী করতে হবে। শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। খাও, রুটি খাও। ভালই তো, চল্লিশের পর ভাত আলু চিনি যত কম খাওয়া যায়। বেঁচে থাক সেই দেশহিতৈষীরা যাঁরা চাল, চিনি, আলু মশলা তেলের মত স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক জিনিসের দাম, একটু নাক তোলা মত করে রেখেছেন। এমনিই তো কর্তার প্যান্ট তলপেটের ওপর উঠতে চায় না। একটু থপথপে মত হয়ে গেছেন। বসলেই নাক ডাকে।

তবে কি জানেন? খুব খুশী হরেনবাবু। বউয়ের ভাই মাসের মধ্যে

পনের দিন গেড়ে বসত। থাকে আসানসোলে। বলে, ব্যবসা করি। ব্যবসা না ছাই! ভগিনীপতি-মারা শ্যালক। কলকাতায় কেনাকাটার ছুতো করে বোনের বাড়ি এসে ওঠে। এই চেহারা! আসানসোলের জল-বায়ু। খাওয়া! এই ভাত! বেড়াল ডিঙোতে পারে না। এখন! ইদানীং! বৌকে বলেছি নো চালাকি। চালাও নেপাল। দুদিনের বেশী আর থাকতে চায় না। রাতে লুচির বদলে পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ি আহার। শ্যালক খেদানো চাল মশাই। পুলিশরা পর্যন্ত বেঁকে বসেছে!

কিন্তু, নিমাইবাবুকে যে তাঁর পোষা কুকুর সেদিন ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিয়েছে। কদিন ধরেই কি রকম, কি রকম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। নেপাল চালের সঙ্গে মাংসর ছাঁট। কুকুরেও মশাই ঢেঁকুর তোলে, এই প্রথম শুনলুম। সেদিন রাতেও, যথারীতি, নিমাইবাবু পেয়ারের কুকুরকে এস্রাজ বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে ঘাড়ে কামড়ে দিয়েছে। এখন রোজ দুপুরে, ভাত দেখলেই, থালার পাশে গোল হয়ে ঘোরে, আর গোঁ গোঁ করে। কিরকম ডিসটেম-পারড মত হয়ে গেছে।

সে তো হোলো, কুকুরের কাজ কুকুর করেছে। খাস বিলাইতিই হোক আর দোআঁশ হোক, কুকুর তো আর বাঙালী নয় কে! প্রথম ভাগ পড়েছে কি? পড়েনি। পড়লে, প্রথম পাঠেই শিক্ষা পেতো, গোপাল অতি সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা খায়। আমার কি হয়েছে দেখো! সামনের দাঁত মিসিং। তোলালেন বুঝি? ধুস, তোলাবো কেন? মকর সংক্রান্তির দিন, গো, ওয়েণ্ট, গন। কোথায়, সাগরে! আরে না হে নিজের বাড়ির বৈঠকখানায়। বুলেট প্রুফ কাঁচ শুনেছো, দাঁত প্রুফ



সরি মাস্টার বিয়েলি টাফ

পিঠে পাগলাবার সুযোগ হয়েছে। ভাবছি ! কি ভাবছেন ! এত রকম প্রতিযোগিতা হয়, দাঁত দিয়ে পিঠে ছেঁদা করার একটা কর্মাপিটিসান করলে কেমন হয়। যে দন্তবীর দাঁত দিয়ে ওই পিঠে ছেদন করে, তার বক্ষস্থলে, খোয়া ক্ষীর নারকেল খেজুরে গুড়ের মাথা পুর পর্যন্ত পেঁছোতে পারবে, তাকে আমি দাঁতেন্দ্র উপাধি দোবো !

বস্ত বকেন মশাই। ঘটনাটা কি বলবেন তো ! ঘটনা, চল্লিশ টাকা প্লাস একটি দাঁত চোট। পিঠে হবে। দু কিলো নেপাল চাল, গম কল থেকে গুঁড়ো হয়ে এল। দু টাকা দরের গোটা পাঁচেক নারকেল এল, খোয়া এল, একনাগারি গুড় এল, সাড়ে তিন টাকা কেজির দুধ এল। এইবার ! প্রথমে বছর সাতেক বয়সের নাতি। মুখে পিঠে। মা বলছে, চিবো চিবো। যতবার সেই ইলিপটিক্যাল বস্তুটিকে মুখে ঠেলে দিচ্ছে, ততবারই পচ করে বেরিয়ে আসছে। ছেলের তো ভেউ ভেউ কান্না, পারছি না মা, পারছি না। গোটা কতক চড়চাপড় হোলো। শয়তান ছেলে, ক্ষীর চুষে খেয়ে বাকিটা আর খেতে চাইছিস না, ওরে আমার গাধা, দাঁত দিয়ে ভেঙে দেখ, ভেতরে কি মাল আছে ! হোলো না। দেখি তো রে, বলে রেগে মেগে ছেলের মা মুখে পুরলেন। পিঠে সামনের দিকে স্লিপ না করে টাগরার দিকে চলে গেলো। প্রাণ যায় রে পাঁচু ! বড় ছেলে এসে ঠ্যাং ধরে, মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে, কোমরে চ্যালা কাঠ পেটা করে গলা থেকে সেই টর্পেডো বের করে বেয়াইয়ের মেয়েটাকে প্রাণে বাঁচালে। রোক চেপে গেল আমার। দেখি তো রে ব্যাপারটা কি ! নিজের ওপর একটা কনফিডেনস ছিল—সামনে দুটো গজদন্ত, এখনো হাড় চিবিয়ে খাই, ছাত্রজীবনে পেনসিল আর ইরেজার দুটোই বহুত চিবিয়েছি। কর্মজীবনে বহু সতীর্থের কেরিয়ার চিবিয়ে খেয়েছি। মিনুর মা কি এমন পিঠে করেছে ! সত্যি বলছি ভাই দ্যাটস এ ক্রিয়েশান ! দুর্গের চেয়ে দুর্ভেদ্য। আমি চিঠি লিখবো। কোথায় ? ডিফেনস ডিপার্টমেন্ট, আর টায়ার কোম্পানিতে। নেপাল চাল গুঁড়ো করে টর্পেডো তৈরি কর, হেলমেট, বর্ম তৈরি কর আর উড়োজাহাজের টায়ার তৈরি কর। কোথায় লাগে নাইলন ফিলামেন্ট। ঘর্ষণে ক্ষইবে না, দংশনে ফুটো হবে না। কোথায় জন্মায় ভাই, এই মহা বিস্ময় !

ব্যাটা বাঙালী ! কে ভাই তুমি ! তোমার নির্যাতি। এ চাল জন্মায় তোর ভাগ্যে রে ! নেপাল রাইসের ভাতে, ঘিয়ের সেন্ট দেওয়া ভাগাড়ের চর্বি ঢেলে, ধাপার ফুলকপি মেরে, মাঝে একটা এনজাইম পাম্প করে দু হাত তুলে বল্, বেটাচ্ছেলে—বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দ্যাশ। ভুলে যা তোর কবিগুরুর সেই ছেলেবেলার ছড়া।

দুধেতে কদলী দলি, তাহাতে আমসত্ত্ব ফেলি, ভুলে যা, শিব গেলেন শ্বশুর বাড়ি বসতে দিলেন পিঁড়ে, তারপর শালিধানের চিঁড়ে। হে হে, নেপাল ধানের চিঁড়ে। খা কত খাবি খা, ভোজনবিলাসী ওজনদার বাঙালী !

উৎসবে ব্যসনে চৈব

স্ফুরদ্দশনদংস্ট্রাভা ভীমরূপা ভয়ংকরী

সশব্দে ভয়ংকরীর পুজো। শিবকাশী থেকে ক্যানিং স্ট্রীটে এসেছে দোদমা, চকোলেট বোমা, লংকা পটকা। সন্ধ্যার দীপমালা, লাউড স্পিকারে রমপম পম পম, সারা শহরের আকাশে বাতাসে দুমদাম, বুমবাম, চটপট। মিনিটে হাজার টাকা পুড়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মহাকালীর আবির্ভাব, ওড়াতে আর পোড়াতে। শব্দে বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে, হার্টের রুগী ভাবছেন এ যাত্রা রক্ষে পেলে হয়। দু আউনস তুলো কানে গুঁজে সমীরবাবু বালিশে হেলান দিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে রক্ষাকালীকে স্মরণ করছেন। দু দুবার হার্ট থমকে গিয়েছিল, তিনে নির্ঘাত মৃত্যু। প্রবাদেই তো বলেছে, একে পক্ষ, দুয়ে নেত্র, তিনে বাণ। শব্দ বাণেই না ঘায়েল হয়ে যান।

শিবেনবাবুর প্রবলেম হার্ট নয় কুকুর। কুকুর নিয়ে মহা সমস্যা। ভেটিনারি ডাক্তার বলেছেন, কুকুরের কান মশাই ভীষণ সেনসিটিভ। মানুষের চেয়ে একশ গুণ বেশী শুনতে পায়, স্ত্রীলোকের কানকেও হার মানায়। যত শোনে তত ঘেউ ঘেউ করে। স্ত্রী আবার ঘেউ ঘেউ সহ্য করতে পারেন না, ভিটামিন ডেফিসিয়েনশি। কালী পুজোর এক মাস আগে থেকেই কড়া ডোজে ভিটামিন চিকিৎসা শুরু করেন। মহাপুজোর দিন ডবল ঘুমের বড়ি। এ বছর তিনি কুকুর বগলে বৈষ্ণবের দেশে চলেছেন। স্ত্রী এবং কুকুর দু জনকেই শান্তিতে রেখে নিজে শান্ত থাকতে চান।

গত বছর হরেনবাবুর বড় ছেলের ডান হাতের চেটোটা মাইনাস হয়ে গেছে, পলতে বেয়ে আগুন আসার সময়ের হিসেব ঠিক রাখতে পারেনি, চকোলেট হাতেই ফেটেছে। অবশ্য বাঁ হাতটা এখনও আছে। মায়ের জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পারি, দুটো হাত তো জীবনের সামান্য ভগ্নাংশ। কাপালিকের পুজোয় এক সময় নরবলি হত, তবে। হাসপাতালের এমার্জেনসিতে আধুনিক কাপালিকরা এই রাতে রেডি হয়েই আছেন। ভয় কি! চালিয়ে যাও শাক্তের বাচ্চারা। কনুইয়ের কাছ থেকে হাত বাদ দিয়ে দেব নিমেষে, ঠ্যাং ছেঁটে দেব, ভুঁড়ির মালমশলা বেরিয়ে পড়েছে? আবার প্যাক করে দেব। মুখ পুড়ে ঝলসে গেছে! নেভার মাইন্ড। হনুমানকে স্মরণ কর। মহাবীর যদি সারা জীবন পোড়ামুখে ঘুরতে পারেন, তুমিও পারবে। চোখ গেছে! ভালই তো। অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে। মহাপুরুষ বলে গেছেন—বল জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত।

রামবাবু বললেন, মিথ্যে বলব না, মহামায়ার পুজোর দিন আমি বোতল দুয়েক মেরে টং হয়ে রকে বসে থাকি। আহা মা তুই এলি! হৃদিপদ্ম উঠল ফুটে মনের আঁধার গেল টুটে। মা তোর কী রূপ! এলোকেশী, বিবসনা, লকলকে জিভ, এক হাতে খড়্গ, আর এক হাতে কাটা মুণ্ডু, অন্য হাতে বরাভয়, পায়ের তলায় শিব সারেন্ডার করে পড়ে আছেন। কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা রে আলোর নাচন। রকে বসে ভাব এসে যায়। মা আমি মহাদেব হব। তুমি আমার বুকে উঠে নাচবে। গুন গুন করে গাই—ধ্যার ব্যাটা, সুরাপান করি



না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

পাড়ার কুকুর ভুলো সন্ধ্যে থেকেই বড় ভয়ে ভয়ে আছে। এখুনি তার ন্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে আগুন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। ভয়ে দৌড়তে থাকবে ভুলো। সমঝদারেরা তারিফ করে তালি বাজাবেন--বহোত আচ্ছা। পুলিস কর্তৃপক্ষ যথারীতি বাজির নিষিদ্ধ তালিকা প্রকাশ করবেন। প্রতি বছরই তো করেন। তাতে কার কি এসে যায়! দিশী-'গাইফক্স ডে'। বড় রাস্তার মাঝখানে বোমার পলতেয় আগুন, নিবু নিবু হয়ে আছে। ফাটবে কি ফাটবে না, মহা সাসপেনস! পথচারীরা থমকে আছেন দু পাশে। সুন্দরী রমণী কানে আঙুল দিয়ে শব্দের অপেক্ষায়। সঙ্গী বলছেন তখনই বলেছিলুম আজ আর বেরিও না, তায় আবার সিনথেটিক শাড়ি পরে বসে আছে! কবে যে কান্ডজ্ঞান হবে! পলতে ফেল করেছে। সাহসী দু-চারজন এরই মধ্যে এদিক ওদিক করে নিলেন। থমকে থাকা জনস্রোত যা থাকে বরাতে বলে সচল হল। বোমবাজ নিজেই ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে একটি লাথি কষিয়ে বললে, দেড় টাকা লস। স্যাঙাত সান্ত্বনা দিয়ে

বললে, গুরু লস বলছ কেন, কি সব জিনিস আটকে গিয়েছিল। বল একবার।

পুজো কমিটির মাতব্বররা শিল্পীকে ফরমাশ করলেন, প্রতিমায় সব থাকবে, থাকবে না দুটো চোখ আর জিভ। চোখের জায়গায় শুধু দুটো গর্ত। সে কি স্যার, মাকে অন্ধ করে রাখব? অন্ধ করে রাখবে কেন, চোখ ফোটাবেন আলোক-শিল্পী, বিদ্যুৎবরণ পাল। দুটো চোখে লাল দুটো টুনি ফিট করা হবে, জিভ হবে ইলেকট্রিকের। দাঁতের ফাঁকে, একই সঙ্গে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝিলিক বেরোবে, জিভ দিয়ে টসটস করে গড়াবে রক্তের ফোঁটা, দুটো চোখ জবাফুলের মত লাল। মাঝে মাঝে জ্বলছে আর নিবছে।

এ পুজোয় কেরদানি দেখাবার অনেক স্কোপ। মায়ের সাঙ্গোপাঙ্গ অনেক। ডাকিনী যোগিনী শ্মশানচারী প্রেত আর পিশাচের দল। উটমুখো শৃগাল। মহাদেবের মাথার কাছে ফণা তোলা সাপ। চিতার আগুন। মৃন্ময়ী আসবেন কুমোরপাড়া থেকে। এসে উঠবেন সাজান মঞ্চে। যেন থিয়েটারের স্টেজ। পেছনে চটে আঁকা রাতের ঘন নীল-কালো আকাশ, ঝাঁকড়া বটগাছ, শীর্ণ একটা নদী একপাশ দিয়ে বয়ে যেতে পারে, বৈদ্যুতিক চিতায় আগুন জ্বলছে লকলক করে। স্টিরিযো টেপ রেকর্ডারে ঝড়ের শব্দ, মেঘের ডাক, প্রেতের হাসি, শেয়ালের হুক্কাহুয়া। মঞ্চসজ্জায় একই সঙ্গে তারাপীঠ, কেওড়াতলা, আদি যুগ, আণবিক যুগ সবই মিকস আপ করা হয়েছে। চোঙায় বোমবাই গান ঝরছে, হো মুকন্দর, হো সিকন্দর। মাঝে মাঝে বাঙলা শাক্ত সংগীত, নইলে মান থাকে না, মা আমায় ঘুরাবি কত, এমন চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত।

উদ্বোধনের দিন মন্ত্রী আসতে পারেন, সপার্ষদ হাইকোর্টের মহামান্য বিচারক, কোনও সাহিত্যিক, অথবা শাস্ত্রজ্ঞ জেট-এজ-পণ্ডিত। চিত্রতারকা হলে তো মার দিয়া কেল্লা মা গো। উদ্বোধন অনুষ্ঠান তিন দিন আগেই হবে। এত কেরামতি আর ঘোর ঘনঘটায় মাকে সহজে কি নিরঞ্জন দেওয়া যায়! স্টেজে দাঁড়িয়ে মা এক মাস ধরে অ্যাকটিং করবেন। মাঝরাতে ভোঁ-ভাঁ প্যাণ্ডেলে মহাদেবের পায়ের কাছে নেড়ী কুকুর শুতে আসবে গুটিশুটি মেরে। মহাদেব হয়তো একলাথি মেরে বলবেন—বেল্লিক, যুধিষ্ঠিরের পেছন পেছন স্বর্গে গিয়ে সাহস খুব বেড়ে গেছে, তাই না। জানিস আমি কে!

কুকুর বলবে, তুমি কে মালেক। আমি তো ভেবেছিলুম কোন হিপিটিপি হবে। রোজই তো আমি ফুটপাথে কারুর না কারুর কোলের কাছে এই ভাবেই শুয়ে আসছি মহারাজ লাস্ট সেভেন ইয়ার্স। কই তারা তো কিছু বলে না।

বৎস তারা মা কালী মেরে মরে পড়ে থাকে, তাই বলে না, আর আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ বুকের ওপর মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন লাস্ট ওয়ান মানথ। না পারছি উঠতে, না পারছি বসতে, না পারছি পাশ ফিরতে। তার ওপর তুই ব্যাটা এসেছিস আমার ঠ্যাঙের ফাঁকে শুতে! সেক্রেটারিকো বোলাও!

কোথায় পাবেন তাঁকে। বারোয়ারির হাল জানেন না! তিনি এখন শক্তি সাধনা করছেন।

মা বললেন, মহেশ্বর! কেন খেপে যাচ্ছ! তুমি না নীলকণ্ঠ! সমুদ্র মন্থনের সমস্ত হলাহল তোমার কণ্ঠে, আর একটুও না হয় ধারণ করলে। ঘুমু কর, আমিও তো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, এক পা সামনে হাঁটুর কাছে ভাঙা, আর এক পা পেছনে ভরত নাট্যমের কায়দায়।

বিষে বিষে আমি স্যাচুরেটেড। আর বিষ আমি পান করতে পারব না, পারব না। আমার ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চলবে না, চলবে না। মশা কামড়ে



গেলাসের বন্ধু

ছিঁড়ে দিলে, জ্বালিয়ে দিলে। আবর্জনার গন্ধে সারা শরীর ঘুলোচ্ছে ঘুলোচ্ছে।

মরেছে! তোমার গায়েও কলকাতার হাওয়া লাগল! ওহে এটা এসপ্ল্যানেড ইস্ট নয়। তখন থেকে স্লোগান ঝাড়ছ! চুপ করে শোও। আমার এক ভক্ত কি লিখেছিলেন মনে আছে ঃ

Who dares misery love and hug the form of death/ dance in destruction's dance, to him the Mother comes.

এই শহরের মত দুঃখ আর কোন শহরে আছে? হ্যাঁ গো! পাতাল রেলের আকু পাঞ্চার, অমাবস্যার অন্ধকার, বুজে যাওয়া পয়ঃপ্রণালী, এক ডজন পলুউশান, পয়সাঅলাদের সাকশান, গরীবের স্টারভেশান, পরিকল্পনার অ্যাবর-

শান, সংস্কৃতির ইনডাইজেশান, জনসংখ্যার সাফোকেশান, নেতাদের সাজেশান, লক্ষপ্রকার ইনফেকশান, তান্ডবে পান্ডবরা নাচছে, মৃত্যুকে জননী বলে জাপটে ধরছে, তাই তো আমি আসি, ভক্তদের আমি বলে যাই, কপালের লেখন কে খণ্ডাবে! কপালে লিখিতং ধাতা, কোন শালা কিং করিস্যতি।

কিন্তু জননী, উন্মোচনের দিনে কত ভাল ভাল বক্তৃতা হল, নিশ্চয় শুনেছ ঃ মা হলেন আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি। বলদায়িনী। শক্তির জন্য সাধনা চাই। যার হাতে পেটো তাকে পেটো নিয়েই সাধতে হবে। প্লেটো নয় পেটো। যার গেঁজেতে চাকু, তাকে চাকুর পথেই এগোতে হবে। জগৎটা কারুর একার মামার বাড়ি নয়। গদি যার জগৎ তার। সোর্ড ইজ মাইটিয়ার দ্যান পেন। কাজের চেয়ে প্রতিশ্রুতি বড়। সবসে বড়া রাজনীতি। নীতি মানে নিয়ম বা নিষ্ঠা নয়, ক্ষমতা অধিকারের শক্তি। সেই শক্তি হল বক্তৃতা। বক্তৃতা হল শব্দের সমষ্টি। শব্দই ব্রহ্ম। আমি বলে যাই তোমরা শুনে যাও। আমি মেরে যাই তোমরা দেখ আর বাহবা দিয়ে যাও। বিশ্বাস রাখ—মা যা করেন ভালর জন্যেই করেন। শক্তি সকলের মধ্যে নামে না। যার মধ্যে নামে সেই হয় নেতা। নেতারাই দেবতা। সেই দেবতাকে নৈবেদ্য দাও। কিসের নৈবেদ্য! কলা নয়, মুলো নয়। ভোট, ভোট দাও। ভোট দাও। এম এল এ দাও। এম পি দাও। ওই দেখুন ছেলেরা মাটির রামপ্রসাদ বসিয়েছে মায়ের সামনে। তিনি বলেছিলেন মনকে কৃষিকাজ শেখাতে। তার মানে মনকে কর্ষণ কর। কর্ষণ মানে ধর্ষণ। মনকে কোপাও। কলকাতাকে যেভাবে কুপিয়ে কোফ্‌তা বানান হচ্ছে সেই ভাবে মনকেও কাবাব করে ফেল। তা হলে কোনও আক্ষেপ থাকবে না। চিরকালই দেশের জন্যে প্রয়োজন রাশি রাশি উদাসীন দার্শনিক। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন নর্দমার জল আর গঙ্গার জলকে এক মন করতে হবে। মনটনের কোনও ব্যাপার নেই। আমরা এক করে দিয়েছি। হোলসেল নর্দমা। তিনি বলেছিলেন, টাকা মাটি। ইয়েস টাকাকে আমরা মাটি বানিয়ে দিয়েছি। নো ভ্যালু খোলামকুঁচি সদৃশ। তাকিয়ে দেখুন মা আমাদের উলঙ্গ। বিবসনা, লজ্জাহীনা। তার মানে কি, বিভবের কোন প্রয়োজন নেই। কাঞ্চন লোষ্ট্রবৎ। লেংটি পরে ঘুরে বেড়াও শ্মশানে মশানে। চিতার কাছাকাছি থাক বার্থ ডে স্যুটে। সকলেরই এক গতি। মরণকালে ধুনি ছাড়া রবে না তোর কিছুই পাশে। মা আর কি বলছেন, নির্লজ্জ হও। শক্তিমানের চক্ষুলজ্জা থাকবে না। নেইও। দেশনেতারাই তার প্রমাণ। একবার এ দল, একবার ও দল। দলবাজ, বোমবাজ, দাঙ্গাবাজ, ধাপ্পা-বাজ, ধান্দাবাজ, চালবাজ ; বাজেরাই বেঁচে থাকবে, তারাই শক্তিশালী। পক্ষীকুলে বাজই দুর্দান্ত পাখি। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

তুমি দেখি মুখস্থ করে শুয়ে আছ!

তবে! তুমি ভাব গাঁজা খাই বলে আমার মেমারি কম! বয়েস কত হল হিসেব করেছ!

সে হিসেব আমার পরমভক্ত পার্থ জানে।

সে আবার কে গো!

ওই দেখ শেষ রাতে জুয়া খেলে টলতে টলতে ফিরছে। পাহারাঅলা পাকড়েছে কে যায়!

আমি পার্থ। দিলুম শালা অলক্ষ্মী বিদেয় করে। উৎপাতের ধান চিৎপাতে দিয়ে এলুম। হে আইনের প্রভু, জেনে রাখ, অর্থই অনর্থের মূল। চায় কিংবা বাদাম তেলের টিনে রাতারাতি কুড়ি টাকা বেশী প্রফিট! নদীতে জল বাড়ছে,

শহরে লোক বাড়ছে, মন্দিরে ধর্ম বাড়ছে, তোমার ভুঁড়ি বাড়ছে, গিন্নির বয়েস বাড়ছে, দাদুদের নাতি-নাতনী বাড়ছে, আমাদের কালো টাকা বাড়ছে, কালোই জগৎ আলো। শুনবে নাকি এক লাইন রামপ্রসাদী, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো, কালো রূপে দিগম্বরী ..।

আমার সেই ভক্ত পার্থ, পাড়ার পার্থদা, পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। ছেলেরা বলে মায়ের চেলা পার্থ, চাকু শো ক'রে চাঁদা আদায় করতে হয় না, হাত ঝাড়লেই হাজার। জান তো, চাকু আর চাঁদা, যেমন তুমি আর আমি। সেই পার্থই সেদিন মালের ঘোরে আসল সত্য ফাঁস করে দিয়েছে : মা, জানি তুমি নেই তবু তোমাকে ডাকি, সেইটাই আমার মাহাত্ম্য।

শিশু ভোলানাথ এদিকে ধেই ধেই করে নাচছে, 'জয় মা কালী পাঁঠাবলি'; ভোলানাথ বাবা ম্যাদামেরে বসে আছেন, ক্যানিং স্ট্রীটে বাজি কিনতে গিয়ে পকেট মার। দু দিন পরেই ভাইফোঁটা। বউয়ের চার ভাই। চার শ্যালকেই এবার গর্দান নামিয়ে দেবে। বউ ঘাড়ে খুব করে তেল মালিশ করছে। তা হলে একটা গান গাই, শ্মশানে জাগিছে জননী সন্তানে দিতে কোল।

—